এক বহুমুখী প্রতিভা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
১৭ জুলাই ১৯৯৮

পরিবেশক
পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণ্যব্রত পত্রী

আলোকচিত্র সম্পাদনা
নির্মলেন্দু সামুই

প্রকাশক
আলেয়া প্রকাশনীর পক্ষে সন্দীপ মজুমদার
কানাইপুর, বাঁটুল, হাওড়া-৭১১৩১২

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স, ৩২ বিডন রো, কলিকাত.-৬

সূচী

স্মৃতিমূলক পূর্ণেন্দু :

কবি পূর্ণেন্দু :

পূর্ণেন্দু চিত্রকর :

চলচ্চিত্রের পূর্ণেন্দু :

সাহিত্যের পূর্ণেন্দু :

অনুসন্ধান :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা জানাই সকল লেখকবৃন্দকে যাঁরা অনেক ব্যক্তিগত প্রতিকূলতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত লেখা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের যাঁরা এ গ্রন্থ সম্পাদনার স্তরে স্তরে নিয়ত সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে আজকাল পত্রিকার গ্রন্থাগারিক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যকে যাঁদের তথ্য ও পরামর্শ প্রভৃত সাহায্য করেছে। অতঃপর সেই চিরস্মরণীয় নিকুঞ্জবিহারী পত্রী, যিনি এই রকম বার্ধক্যেও নাকোলের গ্রামে বসে অন্তরের আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছেন, পূর্ণেন্দুর জন্যে এই 'কিছু একটা করা'তে। পুণ্যব্রতও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দাদু পুলিনবিহারীর লেখা গুছিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ পর্যন্ত এঁকে দিয়ে আমাদের চিরতরে প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছে। 'সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র' বই থেকে ছবি ছাপার সুযোগ করে দিয়েছেন বিকাশ বাগচী মহাশয়, তাঁকেও জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা। এছাড়া নিত্যই নানাভাবে কাজ করে চলেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে 'উৎসমুখ' সম্পাদক অনুপকুমার বিশ্বাস, 'অন্বেষণ' সম্পাদক হিমাংশু দাস, 'বনানী' সম্পাদক অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল, কবি শম্ভু রক্ষিত, কবি শ্যামল মান্না, অশোক উপাধ্যায়, সুলেখক অশোককুমার কুণ্ডু, মুদ্রক নারায়ণচন্দ্র ঘোষ এবং পুস্তক বিপণির অনুপকুমার মাহিন্দার এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করব।

আর যে দু'জনের সাহায্য ছাড়া আমাদের এক পা-ও চলার উপায় নেই সেই সর্বক্ষণের কর্মী নীলিমা কর ও সোমদেব কর-ও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এছাড়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করি শিল্পী নির্মলেন্দু সামুই, শ্যামাপ্রসাদ মিশ্র, অম্লান সাঁতরা, সুস্মিতা পাল, অমল পাল, বিপ্লব চক্রবর্তী, যুধিষ্ঠির প্রামাণিক, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ সেনের নাম।

‘কিছু লাভ আছে মনে রেখে ?’

পূর্ণেন্দু পত্রী : এক সংগ্রামী কবি ও শিল্পী

তারাপদ সাঁতরা

অকালেই চলে গেল পূর্ণেন্দু। অথচ সে বেঁচে থাকতেই 'আলে'ায় পত্রিকার পক্ষে শিল্পী তপন কর 'পূর্ণেন্দু-পত্রী বিশেষ সংখ্যা' বের করার পরিকল্পনা করেছিল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব ও গুণবত্তা নিয়ে একটা লেখা যখন তৈরী করবো বলে উদ্যোগী হয়েছি, সেই সময় আকাশবানীতে তার মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। তার মত এমন একজন প্রিয়জনের বিয়োগে আমি শুধু ব্যথাতুর হইনি, ভীষণভাবে মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দুঃখে শোকে উদ্বেল হৃদয়ে কি যে লিখবো তার ঠিক নেই।

পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সালে, তার একটি কবিতা প্রকাশ উপলক্ষে। সে আমাকে আমাদের গ্রাম থেকে প্রকাশিত 'পথের আলো' পত্রিকায় যে কবিতাটি পাঠিয়েছিল সেটা ছাপার পর দিতে গিয়েছিলাম কানাইপুর গ্রামের সবুজ সংঘ কার্যালয়ে।

এর মধ্যে আরও এক ঘটনা ঘটে গেল। 'পথের আলো' পত্রিকা যথাসময়ে মনে হয় অন্য কারুর হাত দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে পত্রিকা তার হাতে পৌঁছায়নি। সেজন্য সে বাধ্য হয়েছে ঐ সংখ্যাটি নগদ দাম তখনকার পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে কিনে নিতে। ১৮।২।৪৯ তারিখে লেখা এক চিঠিতে তার এই মনোবেদনার কথা জানা যায়। সে চিঠির পুরোটাই তুলে ধরছি, যাতে তার সহজ সরল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে চিঠিটি হল :

মা ১৮।২।৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

'পথের আলো' সম্পাদক মহাশয়, আপনাদের সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হইবার সংবাদ পেয়েছি। সাক্ষাৎ করে সব কথা বোলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হোল না।

'জাগো' নামে একটি কবিতা পাঠালাম। আশা করি এটা পথের আলোয় প্রকাশিত হবে।

পত্রিকা সম্পর্কে যদি কিছু জানাবার থাকে জানাবেন।

বন্ধু হিসাবে একটা কথা জানাব। কথাটিকে বন্ধু বচনের পর্যায়ে ফেলবেন। প্রত্যেক কাগজই লেখকের রচনা প্রকাশের জন্য একটা করে কপি পাঠায়। প্রত্যেক কাগজই এইরকম করে। কিন্তু আমি পথের আলোর প্রথম সংখ্যাটি ✓. আনা পয়সা দিয়ে কিনেছিলুম। আশা করি এবারে এ ত্রুটি ঘটবে না।

যদি কিছু অপরাধ হোয়ে থাকে—ক্ষমা করবেন।
আজকের মত এখানেই বিদায়।

ইতি—
বন্ধুবর
শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর পত্রী
মোরগেহ, নাকোল, হাওড়া।

সে তখন বুঝি যুগকল্যাণ স্কুলের ছাত্র। রোগা কৃষ্ণকায় কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সে চেহারা। তখনই শুনেছিলাম সে শীগগিরই কলকাতায় চলে যাচ্ছে বউবাজারের ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে। থাকবে সে শোভাবাজারে নন্দরাম সেন স্ট্রিটে কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর সম্পাদিত 'চিত্রিতা' পত্রিকার অফিসে।

পূর্ণেন্দুর লেখা গোড়ার দিকে কবিতাগুলি ছিল একান্তই ছন্দোবদ্ধ। ১৯৪৮ সাল নাগাদ লেখা তার ছুটি কবিতার নমুনা প্রসঙ্গত তুলে ধরলে তার লেখার প্রকাশ ভঙ্গি ও ছাঁদ সম্পর্কে একটা অনুমান করা যেতে পারে। পূর্ণেন্দু একসময়ে নিজেই স্বীকার করেছিল যে, ছন্দই কবিতার একমাত্র বাহন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার মধ্যে যে গদ্য কবিতার রস ভিতরে জারিয়ে যেতে থেকেছে সে কথাও স্বীকার করেছে তার এক লেখায়। 'পথের আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমার এ গান রচা যে তাদের তরে' কবিতায় সে লিখেছিল :

"যাদের জীবনধূলি পথের লুণ্ঠিত
বিড়ম্বনায় যাদের জীবন ভরে,
ভিক্ষা যাদের সারা জনমের ব্রত
আমার এ গান রচা যে তাদের তরে।"

পরবর্তী ১৯৪৯ সালে তার লেখা 'আজ-কাল-পরশুর কবিতা'য় সে লিখেছিল :

'যে দেশের পাষাণপুরী দস্যুর শাসনে ঘিরে রাখে
মানুষের সব আশা আকাঙ্ক্ষার আনন্দের প্রাণ,
যে দেশের রাজকন্যে দমবন্ধ অন্ধকারে কাঁদে
হারান সম্পদ খুঁজে আর তার রাজকীয় মান।
সে দেশেও গান আছে পাহাড়ে সাগরে সুগম্ভীর
সে দেশেও মানুষের কণ্ঠস্বরে তীব্র প্রতিবাদ।'

মোটামুটি এই ছিল তার কৈশোরের কবিতা রচনার প্রয়াস। তার প্রথম কবিতার বই 'এক মুঠো রোদ' যার প্রচ্ছদশিল্পী সে নিজেই। এরপর সে লিখেছে অসংখ্য কবিতা যা নামী-অনামী বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা বেশ কিছু কবিতার বই।

আমি ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছি। শালখেতে এক ভাড়া বাড়িতে থাকি। সে কারণে আহিরীটোলা ঘাট পেরিয়ে

বিডন স্ট্রীট ধরে কলেজে যাই। ফেরার পথে প্রায়ই চলে আসি শোভাবাজারের নন্দরাম সেন স্ট্রিটের 'চিত্রিতা' পত্রিকার অফিসে। সে রাস্তার উত্তর গায়ে উঁচু রোয়াক যুক্ত বাড়িটির সামনের এক কামরায় রাখা ছিল খুপরী করা ডালায় ছাপার অক্ষরের টাইপসহ কম্পোজ টেবিল। 'চিত্রিতা' পত্রিকার লেখা কম্পোজ হলে তা অন্যত্র ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নেওয়া হত। সেখানে বসে বহুদিন পূর্ণেন্দুর সঙ্গে গল্পগাছা করেছি। কখনও আমরা বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়তাম আহিরীটোলা ঘাটের দিকে। পূর্ণেন্দু তার তুলি-কলম বের করে নদীর ধারে বসে নানাবিধ স্কেচ করতো। সন্ধ্যে গড়িয়ে এলে আমরা দুজনে ঘরমুখো হতাম। একদিন আমায় সে দেখালো তার কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে একত্রে এক ফটো তুলেছে, যে ফটোটি পরে 'চিত্রিতা' পত্রিকার কোন এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পূর্ণেন্দুর চিত্র সাধনা তখন পুরোদমে চলছে। কবি সুকান্তকে নিয়ে সংকলিত এক কবিতা পুস্তক 'সুকান্তনামা'র সে প্রচ্ছদ চিত্র করেছে। মনে হয় মলাট আঁকায় এটি তার হাতে খড়ি। কলকাতার কফি হাউসে তখন বহু উঠতি কবিদের ভীড়। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আর আলাপের সূত্রে পূর্ণেন্দুর কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশির্ত হচ্ছে। সে সময়ে 'পরিচয়', 'ডাক', 'ইস্পাত' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণেন্দুর কবিতায় দেখা গেল, শোষণবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ জেহাদ ঘোষণা। পূর্ণেন্দু তখন প্রগতিশীল এক প্রতিষ্ঠিত কবি। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ছোট বড় পত্রিকায় সে লিখে চলেছে শিক্ষা জগতের প্রগতি-শীল চিন্তাভাবনার কথা, নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কথা। আমাদের 'পথের আলো' পত্রিকায় সে 'ইনস্টিটিউট অফ্ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার' কর্তৃক আয়োজিত এক প্রদর্শনী সম্পর্কে সংগ্রামী শিল্পীদের শিল্পপ্রয়াস নিয়ে বেশ জোরালো একটি লেখা লেখে। সে সময়ে তেভাগার লড়াইয়েতে যেসব স্থানে কৃষক আন্দোলন চলছে সেখানে সরজমিন উপস্থিত থেকে পূর্ণেন্দু তার কবিতার রসদ সংগ্রহ করে চলেছে। বিশেষ করে বড়া কমলাপুরের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কবিতাটি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেটির কথা পূর্ণেন্দু পরবর্তী সময়েও বিস্মৃত হয়নি। সেজন্যই সে বড়া কমলাপুরের সে সময়ের কৃষক সংগ্রামের ঘটনাগুলিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটিকে ফিল্মে রূপদান করার কাজে ব্রতী হয়েছিল তার কথাও জানতে পারি।

পূর্ণেন্দুর চরিত্রের এই একটা মহৎ গুণ যে সে কাগজে কলমে মানব দরদী সাজতে চায়নি। তুলি কলম নিয়ে সাধনার মধ্যেই সে পথে নেমেছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রথম যখন আন্দোলনের ডাকে পথে নেমেছে সত্যাগ্রহী হয়ে, আজকের সেই সিধু কানু ডহরে অবস্থানরত শিক্ষক সত্যাগ্রহীদের মধ্যে পূর্ণেন্দুকে দেখা যায় তুলি কলম হাতে। অজস্র স্কেচ সে এই সময় করেছিল, তার সেসব সাদা কালো ছবির স্কেচ ও জলরঙ ছবি আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু সেগুলি

কোন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কি তা জানা নেই।

পূর্ণেন্দু খবর রেখেছিল, আমি গ্রামের দিকে সে সময়ে খাদ্য ও তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে গেছি। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যারা লড়াইয়ে শামিল হয়েছে তাদের কথা জানবার ও জানাবার জন্যে সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। দুদিন ধরে নবাসন গ্রামে অবস্থান করে সেখানকার মানুষের সংগ্রামরত চিত্রটি সে প্রকাশ করে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় 'অন্যগ্রাম অন্যপ্রাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে। বুদ্ধিজীবীরা কেউ জানুক বা না জানুক নিপীড়িত মানুষের প্রতি তার এই দরদী লেখনী কালের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সে সময়ে বিভিন্ন স্থানে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার বিবরণ 'অন্য গ্রাম অন্যপ্রাণ' এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও সেগুলি কেন যে পূর্ণেন্দু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন না তা জানিনা। যদিও দেখেছি, সিনেট হল ভাঙ্গার সময় সে প্রতিদিন ক্যামেরা হাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যেসব ফটোগ্রাফ তুলেছিল সেগুলি সে সময় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও, দীর্ঘদিন পরে কয়েকবৎসর আগে সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৩ সালে পূর্ণেন্দুকে দেখলাম বাগনানে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে। এই সম্মেলনের তোরণসজ্জার দায়িত্ব দিয়েছিল প্রয়াত কৃষক নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী এবং তারই আহ্বানে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের আদলে একটি তোরণ নির্মাণ করে। শেষে গেটের দু'পাশে দুটি সোনার চাঁদ মালা নিবদ্ধ করে দেওয়ার কারণে অতি বামপন্থী কমরেডরা অবশ্য এই চাঁদমালা টাঙ্গানোকে বুর্জোয়া ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির নমুনা বলে সমালোচনা করতে ছাড়েননি।

কিন্তু তাতে কি আসে যায়! সেবারে খাদ্য আন্দোলনকারীদের মিছিল দেউলটি স্টেশনে পুলিশ আটকে দিয়ে গুলিচালনার ফলে একজন মারা যায়। অতঃপর স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা দাবী করেন মৃত ব্যক্তি তাদের দলের, কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমিতির পক্ষে কৃষকসমিতির সভ্য চাঁদার রসিদ দেখিয়ে বলা হয়, নিহত ব্যক্তি তাদের দলের। এই যে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের টানাপোড়েন চলে তা নিয়ে একবার কথায় কথায় পূর্ণেন্দুকে সে কথা বিবৃত করি। পূর্ণেন্দু তার লেখা 'দাঁড়ের ময়না।' উপন্যাসে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে নিজ নিজ দলের লোক এরই দাবীতে দুটি দলের এই দড়ি টানা-টানি-র চিত্রটি তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গেই বলা যায়, পূর্ণেন্দুর উপন্যাসের মধ্যে স্থানীয় উপভাষা ও উচ্চারণ যেভাবে মুনশিয়ানার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে, তা এক আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বের দলিল বলে গণ্য হতে পারে।

নন্দরাম সেন স্ট্রিটের বাসা বদলের পর পূর্ণেন্দু চলে আসে শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায় এবং সেখানেই তার থাকার জায়গা। ইতিমধ্যেই সে বইয়ের মলাট-

আঁকায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত বিনয় ঘোষের লেখা 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের বর্ণলিপি ও রেখাচিত্র বেশ প্রশংসিত হয়েছে। অথচ শিল্পীর তেমন ঠাটবাট নেই। মেঝের উপর রাখা একটা সস্তা ধরনের ডেস্কে বসে তার রঙ তুলির কাজ। দুপুরে কাছের একটি হোটেলে সে খেয়ে নেয়, তারপর আবার কাজ শুরু করে। তার জীবনের ছন্দটা এমনই ছিল, যেখানে সে এক মিনিট বসে থাকতে চাইতো না—শুধু কাজের পর কাজ। ছবি আঁকা না হলে কবিতা লেখা বা অন্যান্য অর্ধসমাপ্ত প্রবন্ধ বা গল্পের সমাপ্তি ঘটানো। পূর্ণেন্দুর এই অধ্যবসায় যে তাকে পরবর্তীকালে সফলতার চূড়ায় পৌঁছে দেয়, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। শ্রীমানী মার্কেটে থাকাকালীন অনেক সময় পূর্ণেন্দুকে বেশ বিরক্তও করেছি। আমাদের এলাকার বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় রতন সেন রাশিয়া যাচ্ছে। সে উপলক্ষে আমাদের গ্রামের তরফ থেকে তাকে মানপত্র দিতে চাই, এটা ভাল করে এঁকে দিতে হবে। এমনি আরও কত কি বায়না। একসময় তার কাছ থেকে আমার সম্পাদিত 'সন্দেশ' সাপ্তাহিকের হেডপিস ও অন্যান্য অলংকরণ করিয়ে নিই। এরই মধ্যে একদিন পূর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হতে জানালো, তুই যুব উৎসব-এর ভ্রমণ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিস, বিনয়দা-আমাকে জানিয়েছেন। আসলে ১৯৫১ সালে যুব উৎসব কর্তৃক আয়োজিত ভ্রমণকাহিনী রচনার প্রতিযোগিতায় পরীক্ষক ছিলেন বিনয় ঘোষ, যাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে পূর্ণেন্দুই পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে এক পুরাবস্তু প্রদর্শনীতে তাঁকে আনতে সক্ষম হই।

পূর্ণেন্দু এরপর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে। তার স্বগ্রাম 'নাকোল' গ্রামে যে বৌভাতের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে নিমন্ত্রিত হলেও বিশেষ এক কাজে জড়িয়ে পড়ায় আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর টালা পার্কের বাসায় সে উঠে গেছে। 'হাওড়া জেলার লোক-উৎসব' গ্রন্থটি আমার লেখা প্রথম বই। মলাট ও যাবতীয় অলংকরণের জন্যে টালার বাড়িতে যেতে হয়। পূর্ণেন্দু সে বইটির মলাট ও অন্যান্য রেখাচিত্রগুলি অতীব নৈপুণ্যের সঙ্গে এঁকে দেয়। বাগনানের শিল্পী নিতাই দাস তখন পূর্ণেন্দুর সহকারী হিসেবে সেখানে থাকায় সেও ঐ গ্রন্থটির এক মানচিত্র অংকন করে দেয়। ইতিমধ্যে তখন যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছি। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছি। হঠাৎ তার কাছ থেকে এক জরুরি চিঠি পেলাম। সেইমত তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় থেকে বেলগাছিয়ার দিকে হেঁটে চলেছি। বেলগাছিয়ায় খালপুলের ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি উল্টো দিক থেকে যে ট্রামটা আসছিল সেটি ট্রাফিক জ্যামের কারণে ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আমার নামের ডাক শুনে দেখি ট্রামের জানালায় পূর্ণেন্দু আমাকে ডাকছে। আমি তৎক্ষণাৎ রাস্তা পার হয়ে ট্রামে

উঠে পড়ি। এইভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি স্বস্তি অনুভব করি। পূর্ণেন্দু জানায় একটি সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় আমাকে একটি ধারাবাহিক ফীচার লিখতে হবে, যার বিষয় হ'ল ইতিহাসাশ্রিত কিংবদন্তী। 'আনন্দনিকেতন' এর প্রতিষ্ঠালগ্নে আমি এমন সব জরুরী কাজের দায়িত্বে ছিলাম, যার ফলে পূর্ণেন্দুর কথামত লেখায় হাত দিতে পারিনি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হ'ল, পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার প্রীতির বন্ধন এমন অচ্ছেদ্য ছিল যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকেই সে এই লেখার বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেনি।

১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে আনন্দনিকেতন এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন পর্বে পূর্ণেন্দু এক চিত্র প্রদর্শনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে নবাসনে চলে আসেন। সে চিত্র প্রদর্শনীর নামকরণ করে 'আধুনিক বাংলার উৎস সন্ধানে'। কালো প্যাস্টেল পেপারের উপর বিষয়বস্তু মাফিক রঙ্গীন মার্বেল পেপার হাত দিয়ে কেটে কেটে সাঁটা হয়, যার মধ্যে প্রতিভাত হয় গ্রাম বাংলার নানান দৃশ্যের চিত্ররূপ। রাত জেগে কাজ চলে এবং শেষ হয় চোদ্দটা প্যানেলে, যা একান্তই দর্শনযোগ্য হয়ে ওঠে। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ছিল শিল্পী নিতাই দাস। আনন্দনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্নে পূর্ণেন্দুর এই আন্তরিক অবদান চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

পূর্ণেন্দু এই যে কাগজ কেটে কেটে তা কালো কাগজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সাঁটাই করে ছবি রচনার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে আনন্দনিকেতন বিদ্যামন্দিরের গোড়াপত্তনে আমরা যখন স্বেচ্ছাশ্রমী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলাম, তখন বিদ্যালয়ের ক্লাসে হস্তশিল্প হিসাবে এই পদ্ধতিতে চিত্র রচনার কাজ শুরু করেছিলাম। তবে অত ভাল রঙীন কাগজ ব্যবহার করা যায়নি বটে, কিন্তু বলতে গেলে পূর্ণেন্দুর সৃষ্ট এই চিত্রকলাই ছিল অনুপ্রেরণার উৎস।

এছাড়া আনন্দনিকেতন এর সবুজ পতাকার নকশা ও প্রতিষ্ঠানের স্মারক চিহ্নটিও তার করা। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বিকেলে বিশিষ্ট অতিথি খ্যাতিমান নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও 'যুগান্তর' পত্রিকা সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এ প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন। বিশেষ করে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পূর্ণেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপ করেন এবং তার চিত্রসাধনার ভূয়সী প্রশংসাও করেন।

আনন্দনিকেতন-এর প্রতি যে সহমর্মিতাভাব গড়ে উঠেছিল, তারই টানে, ঐ প্রতিষ্ঠানের সংগঠক যখন ১৯৬৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রার্থী অমল গাঙ্গুলী সম্পর্কে পূর্ণেন্দু দীর্ঘ ২২ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা রচনা করে। তাতে পূর্ণেন্দু পরিশেষে লিখেছেন, "আপাতঃ সুবিধার কিংবা লোকপ্রিয় হবার মোহে নিজের সত্যকে তিনি কোনদিন বিসর্জন দিতে শেখেননি। এই হচ্ছে অমল গাঙ্গুলী। শীর্ণকায় এই মানুষটিকে আমরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি।

কখনো শান্ত, কখনো অস্থির, কখনো নীরব সাধক। কখনো প্রচণ্ড সংগ্রামী, সব সময় মনে থাকে না ইনি কোন্ দলের বা কোন্ মতের লোক। এমন কি সেই মত বা সেই দলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকলেও, আমরা অমল গাঙ্গুলীকে ভাল বেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। সমালোচনা করেছি, বিরূপ হয়েছি; কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার বাধ্য হয়েছি তাঁকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে। এর কারণ একটাই।

দেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর সমগ্র জীবন।" এটি সামান্য এক জীবনেতিহাস হলেও, পূর্ণেন্দু এই পুস্তিকায় মধ্যে সে সময়ের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সংগ্রামী আন্দোলন সম্পর্কে তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে যে চিত্রটি তুলে ধরেছিল তা সমসাময়িক ইতিহাসের এক দলিল হয়ে থাকবে।

পূর্ণেন্দু বইয়ের মলাট আঁকায় যে এক স্বতন্ত্র ধারা ও অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে বিজ্ঞাপন জগতের অঙ্গসজ্জায় তার ডাক পড়ে। যদিও গোড়ার দিকে বেশ কিছু সিনেমার প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে সে কাজ করে চলেছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞাপনের 'ইলাস্ট্রেশনের' কাজের অনেক দায়িত্ব পায় এবং বিভিন্ন নামীদামী কোম্পানির বিজ্ঞাপন সজ্জায় তার নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাতেই সে একজন নামকরা কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসাবে পরিচিত লাভ করে।

পূর্ণেন্দুর শিল্পক্ষেত্রে তার অবদান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেকে অনেক কথা বলেছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন শিল্পে তার মত এমন একজন শিল্পী তার অঙ্কনের ক্ষেত্রে যে হৃদয়গ্রাহী স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিল সে কথা তেমনভাবে হয়ত উল্লিখিত হয়নি। বিজ্ঞাপন জগতের অঙ্কন সজ্জায় সেও যে একজন শ্রেষ্ঠ করিতকর্মা শিল্পী হিসাবে উন্নীত হয়েছিল তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ণেন্দু চলে এসেছে টালা পার্ক থেকে বাঙ্গুর কলোনীতে। মাঝে মাঝে সেখানে যেতে হয় নিজের কার্যসিদ্ধিতে। অর্থাৎ কিনা আমার লেখা 'শরৎচন্দ্র ও সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দেবার বায়না জানাতে। শুধু আমার একার কেন, বাগনানে মন্টু মণ্ডল, অমল মাজী ও রণ্টু মিত্রদের দুর্গোৎসবের 'স্মরণিকা'র প্রচ্ছদ বা খায়রুল বাসারের উপন্যাসের প্রচ্ছদ বা আনন্দ-নিকেতনের 'আনন্দম্' পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রভৃতি এঁকে দেবার কাজে সে কোন কার্পণ্য করেনি।

পূর্ণেন্দু যখন 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় চাকরিরত, তখন আবার তার কাছে ধর্ণা দিলাম, 'কৌশিকী' পত্রিকার প্রচ্ছদ অঙ্কনের অনুরোধ জানিয়ে। আমার সম্পাদনায় 'কৌশিকী'র যে ক'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রচ্ছদ সজ্জা পূর্ণেন্দুর কৃত। এছাড়া পত্রিকার সৌষ্ঠব বিধানে সে বহু 'টেলপিস'ও করে দিয়েছে। সেদিক থেকে সাধারণ পাঠকের কাছে 'কৌশিকী'র বিভিন্ন সংখ্যায় মলাটও এক বড় আকর্ষণ এবং কৌশিকী পত্রিকার যদি কোন সুনাম হয়ে থাকে সিংহভাগ যে পূর্ণেন্দুর আঁকাজোকার জন্যে তা স্বীকার করতে হয়। এছাড়া পূর্ণেন্দু আমার লেখা

'বাংলার দারু ভাস্কর্য' বইটির মলাট করে দিয়েছে যা নিয়ে আমার গৌরব করার অন্ত নেই।

পূর্ণেন্দু ফিল্ম লাইনে চলে আসে, তার মনের কোণে অনুরণিত যে কাব্যময় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তাই নিয়েই সে 'স্বপ্ন নিয়ে' কাহিনীচিত্র তৈরীতে হাত দেয়। লোকেশান খুঁজতে সে ছুটে বেড়ায় নানান স্থানের জমিদার বাড়ি। এরই সন্ধানে বাঁকুড়া জেলায় যখন সে চষে বেড়ায়, তখন তার সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় বিষ্ণুপুরে। নিখুঁত ভাবে সব কিছু সাজিয়ে তোলার জন্যে তার নানা স্থানে পথ পরিক্রমার মধ্যে তাকে বুঝতে পারি যে, তার প্রথম ফিল্ম চিত্রায়ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বাস্তব করে তোলার মধ্যে তার প্রয়াসের অন্ত নেই। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে সিনেমার এই বই তুলতে যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখিয়েছে, তা তার জেদী মনোভাবেরই পরিচায়ক। 'স্বপ্ন নিয়ে' হয়ত বাজার ধরায় সার্থক হতে পারেনি, তবে আমাদের গর্ব যে, গ্রামীণ এক পথের দৃশ্যে বিস্মৃতপ্রায় গ্রাম্য লোকশিল্পের উপাদান এক বৃষকাষ্ঠের নমুনা তাতে তুলে ধরা হয়েছে। কুলগাছি থেকে মহিষরেখার পথের মধ্যে একসময়ে যে দু সারি খিরিশ গাছ রাস্তার শোভা বর্ধন করেছিল, সে দৃশ্যও ঐ চিত্রের মধ্যে ক্যামেরাবন্দী করা হয়, যদিও পথ উন্নয়নের তাগিদে সেসব গাছপালার দৃশ্য আজ চিরতরে অন্তর্হিত। সবশেষে বলতে হয় 'স্বপ্ন নিয়ে' বইটি বাংলার গ্রামজীবনের কাব্যময় এক অনুশীলন যাতে তার কবিমানসের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

পরবর্তী সময়ে পূর্ণেন্দু পরিচালক হিসেবে আরও অনেকগুলি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করলেও তার তথ্যচিত্র সম্পর্কে দু'এক কথা বলা যায়। অবনীন্দ্রনাথের উপর তথ্যচিত্র শেষ করার পর ১৯৭৭ সালে পূর্ণেন্দু হাত দেয় পটুয়া চিত্রকরদের জীবন জীবিকা নিয়ে 'পটচিত্র' নামের এক তথ্যচিত্র নির্মাণে। স্বাভাবিকভাবেই এ কাজে সহযোগিতার জন্য আমার ডাক পড়ে। আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার যখন কিউরেটর ছিলাম, তখন সেখানে বহু পট সংগৃহীত হয় এবং যথাযথ সংরক্ষণও করা হয়। পূর্ণেন্দু নির্দিষ্ট দিনে তার ফিল্ম ইউনিট নিয়ে আনন্দ নিকেতনে চলে আসে এবং আমার সুপারিশমত সেখানের সংগৃহীত পটচিত্রগুলির ছবি তোলা হয়। ক্যামেরার দায়িত্বে ছিলেন পান্ত নাগ। পরদিন পটুয়াদের গ্রাম নয়া-তে যাওয়া হয় এবং সেখানেও পটুয়াদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে যাবতীয় দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। পরদিন পূর্ণেন্দু দলবল নিয়ে আদিবাসী পটুয়াদের গ্রাম ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার এলাকাধীন বাঁড়পুরে চলে যায়। আমি অবশ্য এক জরুরী কাজের জন্যে ওদের সঙ্গে যেতে পারিনি। বাংলার পট ও পটুয়া নিয়ে এখন অনেকেই আসরে নেমে তাদের স্বভাবসিদ্ধ গবেষণার বোমা ফাটিয়ে আসর বাজিমাৎ করে চলেছেন। কিন্তু পূর্ণেন্দুর কৃত পটের ওপর এই রঙীন তথ্যচিত্রটি দেশবিদেশের শিল্পবোদ্ধাদের কাছে বাংলার প্রথাগত ক্ষীয়মান লোকচিত্রের স্বরূপটিকে তুলে ধরার পক্ষে সহায়ক

হয়। পূর্ণেন্দু এছাড়াও ১৯৮১ সালে কালীঘাটের পটের উপর আর একটি তথ্যচিত্র তৈরী করে। সুতরাং বাংলার লোকচিত্রের পরম্পরা এই ধারাটিকে ক্যামেরাবন্দীর দ্বারা ডক্যুমেণ্টেশান করে রাখার এই প্রয়াস একান্তই অভিনন্দনযোগ্য।

পূর্ণেন্দুর আর এক কৃতিত্ব হল কলকাতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা। ইতিমধ্যেই সে কলকাতা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পুস্তক লিখে ফেলেছে, যার ফলে সে হয়ে উঠেছে কলকাতা বিষয়ে এক বিশেষজ্ঞ গবেষক। ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় যোগ দিয়েছে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য ভাষা (বিধান) কমিশনে চাকরি করি। মাঝে মাঝে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার অফিসে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেইসময় কলকাতা কর্পোরেশন ১৯৮৭ সালে বাংলায় মিউনিসিপ্যাল গেজেট পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করে। তারই ফলশ্রুতিতে 'কলকাতা পুরশ্রী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আমি ঐ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদকের অনুরোধে কলকাতা সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করি। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ পত্রিকার সম্পাদক সমরেশ চট্টোপাধ্যায়কে এই পত্রিকার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করি। আমার পূর্বে জমা দেওয়া কলকাতা সংক্রান্ত একটি লেখার আর কোন খোঁজ পাইনা, এমনকি প্রকাশিত তিনটি লেখার সামান্য পারিশ্রমিকও কলকাতা কর্পোরেশনের পুরশ্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। সে যাই হোক, আমার কলকাতা সংক্রান্ত লেখাগুলি পুরশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সুবাদে পূর্ণেন্দুও আমার লেখা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়। শেষ অবধি কলকাতা কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত থনকপ্পন নায়ারের লেখা 'A History of Calcutta's Streets বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তার ভুলত্রুটিগুলি নিয়ে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আলোচনা হয়। পূর্ণেন্দুর অনুরোধে ঐ বইটির এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখি যা প্রতিক্ষণ-এর ২-১৬ নভেম্বর' ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'প্রতিক্ষণে' পূর্ণেন্দুর থাকাকালে বহুবার সে অফিসে ছুটির পর গিয়েছি। নিজের স্বার্থও অবশ্য ছিল। 'মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও মানব সমাজ' গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র তৈরীর জন্য ধর্ণা দিয়েছি। কখনও বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার ফাঁকে সে আমাকে প্রস্তাব দেয় বাংলার পট ও পুতুল নিয়ে কোন পুস্তক রচনার, যা প্রকাশের সব দায়িত্ব তার। নানান শারীরিক প্রতিকূলতায় পূর্ণেন্দুর সে প্রস্তাব আমি কার্যে পরিণত করতে পারিনি, যে জন্য পূর্ণেন্দু এই বিষয়ে আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কাছে মৃদু অভিযোগ করতেও ছাড়েনি। পরে একদিন একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত প্রাচীন দুর্গামূর্তির স্লাইড দেখাই। পূর্ণেন্দু আমার তোলা সে ফটোগ্রাফটি 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে। অন্য দিকে 'কৌশিকী' পত্রিকার অঙ্গসজ্জা ছাড়া 'কৌশিকী'র প্রকাশকালে যে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ছিল সেটি মোচনে সে কয়েকটি বিজ্ঞাপনও যোগাড় করে দেয়।

পূর্ণেন্দু এরপর 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা ছেড়ে দেয়। তাছাড়া আমিও চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করায় কলকাতায় দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ কমে যায়। তাহলেও তার আঁকা নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড অবশ্য পাই। শুনি সে নাকি 'আজকাল' পত্রিকায় যোগ দিয়েছে, আবার কখনো শুনি সে নাকি আজকাল ছেড়ে 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় নানাবিধ প্রতিবেদনী কায়দায় রম্য রচনা লিখে চলেছে। পরে আবার শুনি সে পুনরায় 'আজকাল' পত্রিকায় যোগ দিয়েছে এবং প্রতি সপ্তাহে মানুষজন ও শিল্পশিল্পী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছে।

পূর্ণেন্দু সল্টলেকে বাড়ি করে উঠে গেছে। নানান কাজের বরাতে লেগে থাকায় সল্টলেকের বাড়িতে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনা। হঠাৎ তার লেখা ১২।২।৯৪ তারিখের এক চিঠিতে তার মাতৃবিয়োগ ঘটেছে এবং তার দরুণ নির্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। দুর্ভাগ্য সে চিঠি অনেক পরে পাওয়ায সেদিনের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে না পারলেও, চিঠি পাবার পর খুঁজে খুঁজে গেলাম সল্টলেকেব বাড়িতে। বলতে গেলে সল্টলেক সিটিতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। তখনই পূর্ণেন্দুকে দেখেছিলাম সে বেশ অসুস্থ কিন্তু চোখে মুখে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। জানা গেল, হঠাৎই সে সব ছেড়ে এবার বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছে। সুখের কথা এ বইটা অবশ্য সে শেষ করে যেতে পেরেছিল।

পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আবার একদিন দেখা হয়ে গেল, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের আশুতোষ শতবার্ষিকী ভবনে। সেখানে পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে 'দায়' নামের একটি সংগঠন সেসময়ের বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে এক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। আমরা সেদিন বাইরে এক চাতালে বসে দুজনে বহুক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম।

১৯৯৪-এর জুন মাস নাগাদ, সে আমার বাড়িতে এল। বললো, 'আজকাল' পত্রিকার লেখার জন্য দেউলগ্রামের চিরুণী শিল্পটা 'কাভ্যারেজ' করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে তোকে একটা বই দিয়ে যাব আমার লেখা। কলকাতা নিয়ে লেখা বইটা তোকেই উৎসর্গ করেছি, নিজে এসে না দিয়ে গেলে তো তুই অন্যরকম ভাবতিস।

পূর্ণেন্দুর এই বন্ধুকৃত্যতে আমি যে ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। তারপর সে বললো, বর্ধমানের কোন এক গ্রামে পাথরের বহু মূর্তি ইত্যাদি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। ভাবছি সামনের সপ্তাহে সেখানে যাব, কিন্তু তোকেও সঙ্গে নিতে চাই। প্রাচীন সে সব মূর্তিগুলি সম্পর্কে তোর পরামর্শ তো ভীষণভাবে প্রয়োজন। আমি রাজী হয়ে গেলাম। বললাম, ঐদিন আমি বালীর বিবেকানন্দ সেতুর কাছে শহীদ 'ক্ষুদিরাম' এর মূর্তির কাছে অপেক্ষা করবো।

তারিখটা ছিল ৯৪ সালের ৩০শে মে। নির্ধারিত সময়ে পূর্ণেন্দু এল বটে, কিন্তু জানালো স্থানটি বর্ধমান না হয়ে বীরভূম জেলায়। সুতরাং একদিনে তো ফিরে

আসা যাবেনা। এখন আমার ফটোগ্রাফার শ্রীরামপুর থাকে, তাকে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। ফটোগ্রাফার সোমনাথ পাকড়াশী জানালো তাহলে চলুন বলাগড়ে নৌকো তৈরীর গ্রামে যাই। সেইভাবে আমরা যখন বলাগড়ে বাঁশবাগানের ভেতর কোন এক নৌকো তৈরীর কেন্দ্রে উপস্থিত হলাম তখন পূর্ণেন্দু বললো, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। কাছেই একটা অফিস ঘরের দাওয়ায় যে তক্তাপোষটা পাতা ছিল সেখানেই সে শুয়ে পড়লো। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। দু'একবার নাড়া দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কেমন সে বোধ করছে। উত্তরে সে শুধু বলে, শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়, না জানি কপালে কি আছে! বেলা দুটো থেকে চারটে অবধি সে সেই অবস্থায় সাড়াশব্দ না দিয়ে শুয়েই রইল। তারপর একসময়ে সে শুয়ে শুয়েই জল চাইলো। আমি কাছাকাছি স্থানীয় একজনকে বললাম, যদি আপনাদের বাড়িতে লেবু থাকে তাহলে একটু লেবুর জল আনতে পারেন! লোকটি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল এবং ফিরলো এক গ্লাস লেবুর জল হাতে করে। জল খেয়ে পূর্ণেন্দু সোজা হয়ে বসলো। তারপর চললো নৌকো তৈরী ও তার সমস্যা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ। প্রয়োজনে দু'একজন ওয়াকিবহাল লোককেও ডেকে আনা হল। ফেরার সময় পূর্ণেন্দুকে বলেছিলাম, এমন অসুস্থ শরীর নিয়ে আর কোথাও যাস্‌নে। উত্তরে সে শুধু মুচকি হেসে বলেছিল, তারাপদ, আমি লিখে খাই তো!

পূর্ণেন্দুকে সেদিন যে অবস্থায় দেখেছিলাম তা তার শরীরের কোথাও না কোথাও এক দুষ্টক্ষত দানা বাঁধছিলো মনে হয়। তার শরীরের এই অবস্থা থেকে বেশ আশঙ্কান্বিত হয়ে উঠেছিলাম।

এরপর আবার তার সঙ্গে দেখা হল ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে উলুবেড়ের 'রঙ ও 'রেখা' নামে একটি ছবি আঁকা স্কুলের বার্ষিক সভায়। সেখানকার সংগঠক শিল্পী রঞ্জিতকুমার রাউতের বাড়ি পূর্ণেন্দুর নাকোল গ্রামে, তাই অসুস্থ শরীর হলেও তার অনুরোধ সে এড়াতে পারেনি। তারপর আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল, ১৯৯৬ এর মার্চ মাসে সল্টলেকে তার ছেলের বিয়েতে। তাঁর আঁকা বিরাট এক চিত্র-বিচিত্রিত নিমন্ত্রণপত্র সে পাঠিয়েছিল। তার সঙ্গে সেটাই আমার শেষ দেখা। তখনই লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে মুখে ভীষণ এক ক্লান্তির ছাপ। কিছুদিন আগে তার মেয়ের বিয়েতেও বেশ ধকল গেছে। শরীরের দুর্বলতার কথা প্রকাশ না করলেও তাকে দেখে বোঝা যায় সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হয়ত আর একবার তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটতো, যদি তার আমন্ত্রণপত্রটি যথাসময়ে পেতাম। বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে সে আপনজন কয়েকটি বন্ধুবান্ধবদের সল্টলেকের বাড়িতে মিলিত হবার প্রার্থনা জানিয়েছিল। চিঠি দেরীতে পাওয়ার জন্য যেতে পারিনি, তবে টেলিফোনে জানিয়েছিলাম তাকে

আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির কথা এবং সেই সঙ্গে পুরস্কার প্রাপ্তিতে হার্দ্য অভিনন্দন। এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার ওখানে আমার যাবার কথা ছিল, কিন্তু রেডিওতে শুনলাম ও খবরের কাগজে দেখলাম পূর্ণেন্দু নেই, আর তার দেখা কোনদিনই পাব না। এমনভাবে যে তাকে হারাতে হবে তাও কোনদিন ভাবিনি। এমন এক পরোপকারী, মানবতাবাদী ও সাহিত্য-চিত্র শিল্পী বন্ধুকে হারাবার শোক ভোলার নয়।

পূর্ণেন্দু চলে গেছে, কিন্তু সে রেখে গেছে তার অমূল্য সৃষ্টিসম্ভার, তার অসংখ্য কবিতা প্রবন্ধ ও আঁকা ছবি, উপন্যাস এবং বেশ কয়েকটি ফিল্‌ম চিত্র। অখ্যাত এক গ্রামের ছেলে কিভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে নিজেকে সে কৃতবিদ্য করে তুললো, তা ভাবতে গেলে বেশ আশ্চর্য লাগে বৈকি ; তার বহুবিধ এই কর্মতৎপরতা ও সৃষ্টির মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। তাই একদা বাল্যকালের বন্ধু হিসেবে স্মৃতিবশে হয়ত ব্যক্তিগত অনেক কথা বলে ফেলেছি, যা ক্ষমাযোগ্য।

সেদিক থেকে পূর্ণেন্দু কিন্তু অমর হয়ে রইলো তার জীবনব্যাপী সৃষ্টির মধ্যে।

পূর্ণেন্দু পত্রীকে যতটা জানি

রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পূর্ণেন্দু পত্রী প্রয়াত। এখন কলকাতা শহরে তার অন্তরঙ্গ বা অনুরাগী অনেকেই মানুষটির পরিচয় বিশ্লেষণে ব্যস্ত। কারণ কলকাতাই তার কর্মক্ষেত্র। সেখানেই সে বড়ো মাপের প্রচ্ছদশিল্পী, গল্পকার, ঔপন্যাসিক আবার ফিল্মের জগতেও নূতন পথের পথিক।

পূর্ণেন্দু মূলতঃ কবি। তার কবিতার স্ফুরণ ঘটেছিল বাল্যকালেই পিতৃব্য নিকুঞ্জ পত্রীর প্রেরণায়। আর এই সাহিত্যের কল্পলোকই তাকে আকর্ষণ করেছে শিল্প-জগতের নব নব ক্ষেত্রে। অনায়াসে তুচ্ছ করেছে প্রথাগত শিক্ষা ও চাকুরে জীবনের গতানুগতিকতা।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত নাকোল গ্রামে তার জন্ম। সেই জন্ম-ক্ষণের তিথিপঞ্জী বলতে পারবেন তার পিতৃদেব পুলিনবাবু (শুনেছি তিনি জীবিত আছেন) অথবা সেই তথ্য মিলতে পারে মুগকল্যাণ হাইস্কুলের Admission Register-এ। মুগকল্যাণ হাইস্কুল—প্রতিষ্ঠা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যালয়ের ১২৫ তম পূর্তি উৎসবে প্রকাশিত স্মরণিকা গ্রন্থে লেখা আছে—পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। চল্লিশের দশক বিদ্যালয়ের পক্ষে সুবর্ণযুগ। প্রধান শিক্ষক ঋষি-প্রতিম জ্যোতিষ চন্দ্র বাগ (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী) তাঁর সহকারী শিক্ষকমণ্ডলী যেন নবরত্নসভা। তাঁরা কেবল পাঠ দিতেন না, ক্লাসের মধ্যে ছাত্রদের নানা ভাবনায় উদ্দীপ্ত করতেন।

শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য ছাড়া পূর্ণেন্দু এখানে সন্ধান পেয়েছিল এক রত্নখনির, যার নাম মুগকল্যাণ গ্রন্থাগার। শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা আয়োজনের পাশাপাশি তখন চলেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত। তবে চল্লিশের দশক জাতীয় জীবনেও পতন-অভ্যুদয়ের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান, ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন। নাকোল গ্রামের পশ্চিমে প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদের ওপারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্র। নানা রোমাঞ্চকর খবর ভেসে আসছে এপারে। ৪২-এর ঘূর্ণিঝড়ে সেই আন্দোলন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এল ১৯৪৩-এর মন্বন্তর। ক্ষুধিত মানুষের অভিযান কলকাতার দিকে, ১৯৪৫-এর নভেম্বর এবং ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীতে আজাদহিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে গণবিক্ষোভ, নৌবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি—এই বিপুল ঘটনাপ্রবাহ এক অনুভূতিপ্রবণ বালকের শিল্পী-প্রাণকে কিভাবে আন্দোলিত করেছিল তার হিসাব কিভাবে করা যাবে। কারণ তখনও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়নি।

তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি খুব মনে পড়ে। ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি। কানাইপুর সবুজ সংঘের প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রধান অতিথি কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। জমাট অনুষ্ঠানের শেষে ক্লাবের বারান্দায় ১২/১৩ বছরের এক হাফপ্যান্ট পরা ছেলে হেঁকে বলল—এই যে শুনছেন, আপনারা যে 'নতুনলেখা' নামে হাতেলেখা পত্রিকার কথা বললেন, তাতে আমি লেখা দেব। কাগজটা আমার পকেটেই আছে। সভাস্থলে উক্ত বিষয়ে ঘোষণা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিতা হাতেনাতে পাওয়া যাবে এটা আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল। বললাম—আগামী রবিবারে আমাদের ক্লাবে এসো।

মুগকল্যাণ থেকে কানাইপুরের দূরত্ব এক কিলোমিটার। কিন্তু তখন সবুজ সংঘের সান্নিধ্য এলাকার ভাল ছাত্রদের কাছে এক নতুন দিগন্ত। স্বর্গতঃ কানাই-লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই সংঘের প্রাণপুরুষ। প্রতি সপ্তাহে কলকাতা থেকে বিভিন্ন ধরণের পত্রপত্রিকা আনতেন। ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন পড়াশুনায় কারণ নিজেও ছিলেন মেধাবী ছাত্র। পাঠচক্রের ক্লাশ নিতেন। দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে গুণী অধ্যাপকদের ধরে আনতেন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য। এরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল গণনাট্যের দল।

১৯৪৮-এ সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে দেবব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে কলকাতার প্রায় ১৫/২০ জন শিল্পী উপস্থিত। তখন বাগনান এলাকায় কোনও মাইকের দোকান ছিল না। কলকাতার কড়েয়া রোড থেকে রসুল আমিনকে তার দোকানের মাইক ব্যাটারি সমেত হাজির করা হ'ল। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে প্রথম শুনলাম 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি'। শম্ভু ভট্টাচার্যের 'রানার নৃত্য' মুগ্ধ করেছিল সকলকে। অন্যান্য শিল্পীরাও নাচে গানে অংশ নিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য) গাইলেন—'বৃন্দাবন পথযাত্রী চলার পথে থেমে যাও'। সেই ভাবাকুল সুরলহরী এখনও মনে আছে।

এই ঘটনা বিস্তৃত লেখার কারণ পূর্ণেন্দু এসে পড়েছিল এক নূতন উন্মাদনার মধ্যে। আগুনের পরশমণি তাকে ছুঁয়েছিল সন্দেহ নেই। অবশেষে ১৯৪৯-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে কানাইবাবু তাকে একে একে চিনিয়ে দিলেন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের ঠিকানা (ভারত সোভিয়েত মৈত্রী সংঘের অফিস) পরিচয়, 'নতুন-সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। এসে গেল উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের নিত্যনূতন সুযোগ। পূর্ণেন্দু হয়ে গেল কলকাতার।

তবে গ্রামকে সে কি একেবারে ভুলে গেল? অবশ্যই না। পঞ্চাশের দশক (১৯৫২) সবে মাত্র মুগকল্যাণ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছি। পূর্ণেন্দু এক সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। সে রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়েছে। অভিনয় হ'ল ওদেরই বাড়ীর আঙিনায়। নাটকের করুণ রসে

শ্রোতারা আপ্লুত হয়েছিল। গল্প উপন্যাস থেকে Dialogue-এর 'স্কেচ' তৈরীর হাতেখড়ি ঐ নাট্যরূপ।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ওদের বাড়ীতে দ্বিতীয় বার গিয়েছি। এবং প্রসঙ্গ ভিন্নতর। নির্বাচনী লড়াই। আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষবাবুকে জেলা বোর্ডের নির্বাচনে প্রার্থী করেছিলাম। মাষ্টারমশায় রাজনীতির লোক নন। কিন্তু ছাত্রদের এই অযথা আবদার উপেক্ষা করেন নি। এই উপলক্ষে নাউল হাটে জনসভা। প্রধান বক্তা কমরেড বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সভার সব দায়িত্ব ছিল পূর্ণেন্দুর। এখনকার মতো তখন মোটর গাড়ীর ছড়াছড়ি ছিল না। রাতের বেলায় রিক্সাও নেই। ফলে বিশ্বনাথদার সেই রাত্তিরে পূর্ণেন্দুর বাড়ীতেই আশ্রয়।

পূর্ণেন্দুব জীবনে রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন কতটা কিভাবে হয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরে আমার অভিমত নিঃসন্দেহে বিতর্কিত হবে। তবে যেটা মনে আছে সেটা গোপন করার কি দরকার? আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ কর্মীদের ওপর অনেক সময়েই হয়ে যায় 'তাসের দেশে' বাজার 'চলো নিয়ম মতে'। ডাইনে বাঁয়ে তাকিও না। মহৎ শিল্পী তাই ঠুলি-পরা চোখ নিয়ে রাজনীতি করেন না। পূর্ণেন্দুর ক্ষেত্রে দুটো দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ১৯৫৯ সালে বাগনানে অমল গাঙ্গুলীকে নানা অপবাদ দিয়ে বহিষ্কার সে আদৌ সমর্থন করেনি। এই সেদিন কানোরিয়া জুট মিলে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আন্দোলনকে কেউ বলছে 'নকশাল' কেউ বলছে ওরা সাম্রাজ্যবাদের চর শ্রমিক আন্দোলন ভাঙতে এসেছে—তখনও পূর্ণেন্দু সেই ক্ষুধিত শ্রমিকদের ভিক্ষের চালের কান্নার পাশে সেই কমিউনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকাল পত্রিকায় তার লেখা পড়ে মনে হয়েছে, গরীব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন সে কোনোদিন হারায় নি। নাইবা রইল কোন পার্টির তকমা। হায়! পূর্ণেন্দু আজ নেই। যদি সে জানত তার কানোরিয়ার শ্রমিক বন্ধুরা এখন কতকটা জিতেছে, কাজ করছে দ্বিগুণ উৎসাহে। তাদের নিজের নিজের বাড়ীতেই ভাতের গন্ধ উঠছে।

শেষ দেখা তার সঙ্গে ১৯৮৭-তে সবুজ সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে। কর্ম-জীবনে তখন সে বিপুল খ্যাতির শীর্ষে। প্রিয় কানাইদাকে খুঁজেছিল, পায়নি। আগের মতই বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেমন আছেন?

এক এক জন মানুষ জন্মায় ভালবাসা নিয়ে। তারা ভালবাসা কুড়োয়, ভালবাসা ছড়ায়। পূর্ণেন্দুর সব ভালবাসা এখন থেকে গেল তার জোয়ালো কলমে, রঙের তুলিতে, কতক আবার ক্যামেরায় সচল ছবিতে।

বিশেষ বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী

নিতাই দাস

মানুষের জীবনটাই কর্মময় জীবন। জন্মের দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মানুষ অবিরাম কর্ম করে যায়। কেউ ভাল কর্ম, কেউ মন্দ কর্ম করে। কর্মের অনেক বিশ্লেষণ আছে। অনেক ভাগ আছে। কর্মের বেশীর ভাগটা আসে বংশগত, পরিবেশগত, শিক্ষাগত এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও বাড়তি সুবিধা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং ধর্মীয় আচার-আচরণে মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না। বিকাশের মূলতঃ দু'টি দিক। একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক। অপরটি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভিত্তিক। আবার 'সম্পূর্ণ বিকাশ' কোন একজন মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। পৃথিবী খ্যাত ব্যক্তিত্ব, দেশগত ব্যক্তিত্ব এবং অঞ্চলগত ব্যক্তিত্ব—এই তিন জায়গায় ব্যক্তিত্বদের অবস্থান।

পূর্ণেন্দু পত্রী আমার বিশেষ বন্ধু। মনের আদান-প্রদানের বন্ধুত্ব। বহু বছর একসঙ্গে থেকেছি-একসঙ্গে চিত্রশিল্পের কাজকর্ম করেছি। পূর্ণেন্দু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিল্প, সাহিত্য ও কবিতায় বিশেষ প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছে। ওর সঙ্গে থাকায় বিশেষভাবে অনুধাবন করেছি যে, পূর্ণেন্দু বরাবরই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার জগতে থাকতো নিজস্ব পরিবেশ তৈরী করেই। ওর বাড়ীতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি গেলেই বুঝতে পারতেন—কি অসাধারণ শিল্প সাহিত্য পবিবেষ্টনের মধ্যে ও থাকতো —কাজ করতো। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, বহু দুষ্প্রাপ্য শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ এবং সেই-ভাবেই সাজানো। দেখে মনে হয় বাগানের মালী বাগানের ফুল ফুটিয়ে বাগানেই বসে আছে।

ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশে একটি সূত্র থাকে। পূর্ণেন্দুর ক্ষেত্রে এই সূত্রটি ওর কাকা বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় শ্রী নিকুঞ্জ পত্রী। ভাইপো মুগকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর নিকুঞ্জ বাবু ভাইপোকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ১৯৪৯ সালে নিজের কর্মক্ষেত্র কো'লকাতায় নিয়ে যান। পত্রীদের আসল বাড়ী হাওড়া জেলার নাকোল গ্রামে। বাবা, মা বরাবর নাকোলেই থাকতেন। নিকুঞ্জ পত্রী কো'লকাতার শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায় ১নং একটি ছোট ঘরে থাকতেন। নিজের কাছে এনে আর্ট কলেজের এক প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে পূর্ণেন্দুকে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভর্ত্তি করে দেন। যুবক পূর্ণেন্দু, জেদী পূর্ণেন্দু ও ছাত্র আন্দোলনের নেতা পূর্ণেন্দু আর্ট কলেজে ছাত্র আন্দোলন করে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে দুবছরের মাথায় আর্ট কলেজে পাঠ শেষ করে। ঐ সময় আমিও আর্ট কলেজে ভর্ত্তি হই। ঐ সময় পূর্ণেন্দুকে দেখি—পরিচিতি

ছিলনা। পরিচয় সূত্র ১৯৫৪ সালে বাগনানে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে। সে এক বিরাট ব্যাপার। ঐ কর্মযজ্ঞে পূর্ণেন্দু শিল্প সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে। একদিকে বিশেষ বিশেষ নামের তোরণ, কৃষক আন্দোলনের উপর এগ্‌জিবিশান্‌ এবং বিরাট দোতলা সমান মঞ্চের অলংকরণ। আমার দুই ছাত্রকে নিয়ে আমরা ওর পরামর্শমত কাজ করেছি।

কমিউনিস্ট পার্টির বাগনান ইউনিটের নেতা নিমাই সুর, হারাধন চ্যাটার্জী, তারাপদ সাঁতরা, সত্যেন ব্যানার্জী, বাসার আলি এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমরা ছিলাম পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। বাগনানে পূর্ণেন্দু এলেই নিমাই সুরের বাড়ীতে থাকতো। নিমাই সুরের বাড়ীটি ছিল প্রায় পার্টি কমিউনের মতো। অবশ্য সেই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অমল গাঙ্গুলী ধারাবাহিকভাবে আমাব বাড়ীতে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে বাগনানে প্রথম কমিউনিস্ট এম. এল. এ. নির্বাচিত হলেন অমল গাঙ্গুলী। ঐ নির্বাচনে পূর্ণেন্দুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে পার্টির সঙ্গে মতবিরোধে অমল গাঙ্গুলী পার্টি ছেড়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের এলাকা বরুন্দা-নবাসনে 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন আদর্শে' উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আনন্দ নিকেতন' নামে একটি সমাজসেবা সংগঠন তৈরী করেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দনিকেতনে প্রথম 'শতাব্দী ভবন' তৈরী করে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'আনন্দনিকেতনের' উদ্বোধন হয। ঐ সময় পূর্ণেন্দুর শিল্প সংক্রান্ত কাজ-কর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামের মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা পারিশ্রমিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'শতাব্দী ভবন' তৈরী করে। জান্‌লা-কপাট নেই। অর্থ নেই। প্রচণ্ড শীত। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ। জানলা-কপাটে ছই ঘিরে কোন রকমে থাকা। অন্নের যোগান নেই। মুড়ি-তেলেভাজা-চা খেয়েই পূর্ণেন্দু ও আমরা 'রবীন্দ্রনাথের কোটেশান্‌' থেকে নানান ধরণের লেখা ও ছবি এঁকে চলেছি। হ্যাঁ, ঐ সময়েই পূর্ণেন্দুকে বিশেষভাবে চিন্‌তে পারি। ঐ সময় থেকেই উভয়ের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। আমি অমলদার সঙ্গে আনন্দনিকেতনে থেকে যাই। পূর্ণেন্দু শ্রীমানী মার্কেটের আস্তানায় কর্মসূত্রে চলে যায়। কমার্শিয়াল আর্টের কাজ করে। বিশেষ করে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকায় নাম করেছে। ইলাসট্রেশনের কাজ করে, কবিতা লেখে, গল্প লেখে। এক সময়ে ৬০ এর দশকে আমাকে পত্র লেখে "নিতাই তুই আমার কাছে চলে আয়। চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন 'বাইশে শ্রাবণ' প্রথম ফিল্‌ম করছেন। ওঁর শিল্প কর্মের দায়িত্ব নিয়েছি। তুই পত্রপাঠ চলে আস্‌বি।" ওর কথামত চলে গেলাম। শ্রীমানী মার্কেটের ঘরে কাজকর্ম, আর ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে ভাড়া বাড়ীতে থাকতাম। ডানদিকে টালা ট্যাঙ্কের পাশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী, বাঁদিকে সজনীকান্ত দাসের বাড়ী। অপরদিকে থাকেন কাজী নজরুল ইসলাম।

পূর্ণেন্দু এর মধ্যে বিয়ে করেছে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মত ঐ সংসারের যাত্রী।

প্রতি রবিবার নিকুঞ্জ পত্রীর আসা চাই। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে থেকে একটা বিশেষ জগত পেয়েছিলুম। পরিচয় সূত্রে কখনও তারাশঙ্করের বাড়ী কখনও কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ী। ঐ সময় ওর স্ত্রী উমা পত্রী সন্তান-সম্ভবা। কাজেই বাড়ীতে থেকেই আমাকে শিল্প কর্ম করতে হ'ত। পূর্ণেন্দুর তখন ভালো নাম-ডাক হয়েছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আসা-যাওয়া আলাপ আলোচনা। একটা কথা জানিয়ে রাখি পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার যা কিছু কাজকর্ম শুধু চিত্রশিল্প সংক্রান্ত। তাই সাহিত্য বা কবিতা নিয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা হ'ত না।

সেই সময়ে আর এক মহান চিত্র শিল্পী সত্যজিৎ রায় ডি. কে. গুপ্তর সিগনেট প্রেসে কমার্শিয়াল আর্টের দায়িত্বে। পুস্তক জগতে নতুন নতুন সৃষ্টি। পুস্তকের প্রচ্ছদপট থেকে শুরু করে ভিতরের ইলাস্ট্রেশন্ এমন কি টাইপ সব ক্ষেত্রেই নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি। ক্যালিগ্রাফিক লেটারিং করে কিভাবে নতুন আঙ্গিক তৈরী করা যায় তা ওঁর পুস্তকে এবং সমস্ত ছায়াছবিতে প্রকাশিত হ'লো। ঐসব শিল্প কর্মের প্রকাশে পূর্ণেন্দু নতুন আঙ্গিকের প্রেরণা পেল। পরে সত্যজিৎ-এর খুবই কাছের মানুষ হয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার মিলন ঘটলো। সত্যজিৎবাবু 'পথের পাঁচালি' দিয়ে শুরু করে চিত্র পরিচালনায় চলে গেলেন। সিগ্‌নেটের কিছু কাজের দায়িত্ব পূর্ণেন্দুর উপর ছেড়ে দিলেন। গ্রাম-বাঙলার সমাজ জীবনের উপর এমন আর্ট ফিল্ম দেখে পূর্ণেন্দু অভিভূত হ'ল। আমার ধারণায়, সে তখন থেকেই ঐ জাতীয় আর্ট ফিল্ম তৈরী করার বাসনা পোষণ করেছে। ঐ সময় ঐতিহাসিক সেনেট হল ভাঙ্গার কাজ চলেছে। পূর্ণেন্দু মানসিক কষ্ট পেয়ে একটা পুরানো ক্যামেরা জোগাড় করে প্রায় প্রতিদিনই বেরিয়ে পড়তো ফটো তুলতে এবং সেনেটের ঐতিহাসিক বিষয় লিপিবদ্ধ করতে। রবিবারের আনন্দ-বাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ফটো ও লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সময় ওর আঁকা জোকার সমস্ত দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতো। পরবর্তী সময়ে ও "স্ত্রীরপত্র" নামে চিত্রপরিচালনায় চলে গেল। এখানেও ওর সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়েছে। "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" ফিল্ম করবে। ছবির টাইটেল লেখা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। কৃষক আন্দোলনের সময় তখন আমরা 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কাগজে হলুদ মাখিয়ে খেজুর ডাঁটার তুলি তৈরী করে আলতা দিয়ে পোস্টার লিখতাম। সেই চরিত্রের পোস্টার তৈরী করে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'-র পরিচালকের নাম, ক্যামেরা ম্যানের নাম, অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম ইত্যাদি লিখে বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো দেওয়ালে সাঁটা থাকবে। পূর্ণেন্দু নিজে কিছুতেই ঐ কৃষক আন্দোলনের পোস্টারের লেখার চরিত্র আনতে পারছে না—কেননা, হাতটা তো পাকা হয়ে গেছে। বাগনানে আমার কাছে এলো এবং বিষয়টি করে দিতে হবে জানিয়ে বলল, "ছোট বকুলপুরের যাত্রীতে তোকে শ্রমিক মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে যেতে হবে। পোস্টার তৈরী করে ওর বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। দেখে

অভিভূত। ভাখ, 'আমি কিছুতেই পারছিলুম না—তুই করে দিলি।' শ্রমিক মিছিলে যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি।

পূর্ণেন্দুর প্রথমের দিকে পোশাক ছিল পাজামা-পাঞ্জাবী, পরে ফুলপ্যাণ্ট-ফুলহাতা জামা। মাঝে মধ্যে একটু ব্যতিক্রমী পোষাক পরতো। চন্দনকে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তির জন্য গেছি। ঐদিন চন্দনের ইণ্টারভিউ। পূর্ণেন্দু ঐ ইণ্টারভিউ বোর্ডের সদস্য। পূর্ণেন্দু এলো পরনে হাল্কা খাঁকি রং এর ঢলা জামা। বুকের কাছে বড় বড় পিতলের চাক্তি বোতাম, চারটে বড় বড় জামার পকেট আর ঐ রং এর ঢলা প্যাণ্ট। মুখে বাঁকানো পাইপ। দেখে মনে হচ্ছিল ফরাসী নাগরিক। কখনো কখনো সিল্কের পাঞ্জাবী ও ধুতিও পরতো।

বাঙলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ও বাঙলাদেশে গেল। ফেরার পর ওর বাড়ীতে আমার এবং চন্দনের ডাক পড়লো। শিল্পী পুত্র চন্দনকে নিয়ে ওর বাড়ীতে গেলাম। বাঙলাদেশে থাকাকালীন যতো ফটো এনেছে তার ৩/৪ টি এ্যালবাম দেখালো। সঙ্গে এনেছে ও দেশের নতুন কিছু শিল্প-সামগ্রী। একটা তামার পাতের উপর ঠোকাই কাজ এনেছে—বিষয়টি চন্দন ঠিক বুঝতে পারছে না। পূর্ণেন্দু বলল, "তোমার বাবাকে বলো আমার চেয়েও উনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। ঐ সময়ে ওকে বিশেষভাবে বলেছিলাম, "পূর্ণেন্দু তুই তো সারাজীবন পরের কাজ করে গেলি, এবার নিজে ফাইন আর্টের কিছু কাজকর্ম কর।" "ঠিক বলেছিস্, এবার বাঙলা দেশে গিয়ে আমিও ভাবছি কিছু কাজ করবো। ওখান থেকে নতুন একটা টেক্‌নিক্ শিখে এসেছি। বালি আর ফেবিকল্ জলে গুলে ক্যানভাসে জমি তৈরী করে অয়েল পেন্টিংস করবো। তাই করেছে। ক্যাক্‌টাস ও নারী সিরিজ, বাঙলা দেশের গ্রাম বাঙলার নদ ও নদীর পটভূমিকায় জল রংয়ের ছবি এবং আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছবি। সল্টলেকের প্রদর্শন কক্ষে "বাঙলা দেশ সিরিজ" প্রদর্শিত হয়। মুম্বাইতেও ছবি প্রদর্শিত হয়। বাড়ী করার সময় মেঝেতে এক ধরণের টাইলস্ বসিয়েছে। এক সময় পূর্ণেন্দু ঐ টাইলসের ভিতর দেখতে পেলো 'নর ও নারী' বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রয়েছে এটা ওর ধারণা। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে টাইলসের সাইজে কার্ড বোর্ড এনে 'নর ও নারী' সিরিজ করে ফেলল। ওর বাড়ীতে গেছি। বাচ্ছা ছেলের মতো বলে উঠ্‌লো "নিতাই দারুণ একটা কাজ করেছি।" টাইলসের মেজের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখছিস্ টাইলসে কতো নর-নারীর ছবি।' বিদেশে যখন গেল-ঐ ছবির সিরিজটি নিয়ে গিয়েছিল। ফেরার পর বলল, ফ্রান্সে ঐ ছবির সিরিজটি একজন ফরাসী শিল্প রসিক কিনে নিয়েছেন।

"তিনশো বছরের কলকাতা" পূর্তিতে টাটা স্টিল অথরিটির sports club-এর পক্ষ থেকে তিনশো বছরের কলকাতার উপর তথ্য সম্বলিত ২৪টি ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ঐ ছবিগুলো (ওয়াটার কালার) তৈরীর দায়িত্ব চন্দনকে দেয়। ২৪টি তথ্য সম্বলিত বিষয় জানার জন্য ওর কাছে গেলাম। ও কলকাতার

উপর বই লিখেছে এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ। চিন্তা-ভাবনা করে—সিরাজদৌল্লার পতন, সতীদাহ প্রথা, জব চার্নক, সুতানটি-গোবিন্দপুরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, মন্বন্তর থেকে শুরু করে মোহনবাগান ইংরেজদের ফুটবলে হারিয়ে দেওয়া এবং সবশেষ স্বাধীনতা পর্যন্ত ২৪টি ছবির প্লট তৈরী করে দেয়। চন্দন, অজয়, অশোক বৈরাগী তিন জনে মিলে ফুল সাইজ আর্ট-পেপারে ছবি এঁকে দেয়। পূর্ণেন্দু ছবি গুলো দেখে আনন্দ প্রকাশ করে। বর্তমানে ছবিগুলি জার্মানীতে আছে।

বছর তুয়েক আগে সকাল আটটায় পূর্ণেন্দু আমার বাড়ীতে হাজির। তখন বাজারে গেছি। বাড়ীর কাছাকাছি আসতে দেখি গাড়ী নিয়ে সে আমার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার? মুচকি হেসে বলল, তুইতো জানিস আমি 'আজকালে' লুপ্ত গ্রামীণ সংবাদ কলাম লিখছি। তুই কোন একটা গ্রামে নিয়ে চল্। সঙ্গে ক্যামেরা-ম্যান নিয়ে এসেছে। নিয়ে গেলাম দেউলগ্রামে। শিং এর তৈরী চিরুণী, ছাতার হাতল, চিংড়ী মাছ, বক আরও নানান শিল্প কর্মের আস্তানায়। বৃদ্ধ শিল্পীদের কাছ থেকে ইতিহাস জান্‌লো—ফটো তুললো। পত্রিকায় বিষয়ের হেড লাইনে লিখলো, 'দেউলগ্রামের শিং এর তৈরী শিল্প দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।' আবার কিছুদিন পরে ঐ রকম সকালে এসে হাজির। আবার কাছাকাছি তুলেপাড়া গ্রামে নিয়ে গেলাম। চারা পোনা মাছ তৈরী ও বিহার প্রদেশে বিক্রীর বিষয়ের এক করুণ কাহিনী শুনে পূর্ণেন্দু ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পত্রিকার হেড লাইনে লিখেছিল 'ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।' ঐ কলামের শেষের দিকে আমার সহযোগিতার উল্লেখ করেছিল। সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে যাবার সময় দেখতে পায় বাড়ীতে অনেক বড় বড় কুমড়ো রয়েছে। "কি ব্যাপার-তুই কুমড়োর ব্যবসা করছিস?" না চন্দন বছরে একবার দামোদরের চড়া ভাড়া করে আলু-কুমড়োর চাষ করে। সেইসব কুমড়ো। "এক সময় আমরা তে-ভাগা আন্দোলন করেছি—ঐ কুমড়োয় আমারও ভাগ আছে" বলে তুটো বড় কুমড়ো নিয়ে গেল।

আমি যখন ওর কাছ থেকে চলে আসি—তখন পূর্ণেন্দুকে বলেছিলাম, "তুই একা এতো কাজ সামাল দিতে পারবি না। তোর সহকর্মী দরকার। আমার এক গরীব ছাত্রকে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। হঠাৎ ওর বাবা মারা যাওয়ায় ওকে আর্ট কলেজ ছাড়তে হয়েছে। দিগেন মুখার্জী নাম। খুবই ট্যালেন্-টেড। তোর কাছে থেকে চার বছর আর্ট কলেজে পড়বে। "নিয়ে আয়।" বর্তমানে দিগেন কলকাতায় জায়গা কিনে বাড়ী করেছে। এখন একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার আর্ট ডাইরেক্টর।

আমার ফুলশয্যার রাত। তুটো বাজে। বাড়ীর বাইরে পূর্ণেন্দু ডাকছে—"নিতাই ওঠ—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আমরা তুজনে (নিমাই সুর) রাস্তায় বেড়াচ্ছি—তুই ঘরে শুয়ে আছিস্—চলে আয়।" তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম।

নাকোল গ্রামে (হাওড়া জেলা) পূর্ণেন্দুর (ডাকনাম দুলাল) বসতবাটি ছিল মাটির তিনতলা। দারুণ বাড়ী ছিল। ওদের গোয়াল ঘরের দেওয়ালে পূর্ণেন্দুর মাটি দিয়ে তৈরী "গাই গরু ও বাছুর দুধ খাচ্ছে" একটা রিলিফের কাজ ছিল। ওর মা ছিলেন নানান হাতের কাজে দক্ষ শিল্পী। সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজ, নক্‌শী কাঁথা, নানান অলঙ্করণ করা হাত-পাখা, আরও কতো কাজ। ওঁর বেশ কিছু কাজ এবং পূর্ণেন্দুর বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় (বাগনান, হাওড়া) রাখা আছে।

ফুলগাছের সখ—বিশেষ করে ক্যাক্‌টাস্ জাতীয় গাছ। বাগনানে এলে মাঝে মধ্যে ঐসব টবের গাছ নিয়ে যেতো, বলে যেতো, তুই বাগানের মালীকে সঙ্গে নিয়ে ভালো ভালো ক্যাক্‌টাস্ নিয়ে আমার বাড়ীতে আসবি। মালীর কাছ থেকে গাছ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় জেনে নেবো।" তাই করেছি। 'ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল' পূর্ণেন্দু গ্রামের পরিচিতদের কখনও ভোলেনি। গ্রামে এলে দেখা হলেই ও পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলতো। কয়েক বছর আগে প্রতিবাদী পূর্ণেন্দু হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরে কানোরিয়া জুট মিলে মালিকদের অত্যাচারে জর্জরিত শ্রমিক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং মালিকদের বিরুদ্ধে দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবাদ জানায়।

'চিত্র শিল্পে' সে নিজের তৈরী জগতের বিশ্বকর্মা, 'সাহিত্যে' ভাষা বিন্যাসে সে মণিমুক্তা সেটিং-এর সুদক্ষ কারিগর, আর 'কবিতায়' সে নীল আকাশে উড়ে যাওয়া একখণ্ড পেঁজা তুলোর প্রতিভা।

১৯৫৪ সালে বাগনানে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে তাজা যুবক পূর্ণেন্দু থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বিলীন পূর্ণেন্দুকে শেষ বিদায় জানিয়ে এসেছি। শারীরিক অবহেলায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে কিভাবে ও সৃষ্টির জগতে সৃষ্টি করে গেল—ভাবতে অবাক লাগে। এমন কি শেষ ক'টা দিনের মধ্যে এস. এস্. কে. এম হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে এসে নাতি-নাতনীকে কোলে নিয়ে চন্দন সাজে সজ্জিত করে আদর করে শেষ বিদায় নিয়ে পুনরায় হাসপাতালে গেল। ব্যাস্ত পূর্ণেন্দু ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ এ ভূমিষ্ঠ হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শুকনো পলতের প্রদীপ জ্বালিয়ে চার লাইনের কবিতা লিখে, বেশ কিছু ছবি এঁকে, কবিতা পাঠ করে ১৯ শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেল।

আমার স্বপ্নের পূর্ণেন্দু দা

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আসলে আমার ছড়া ছবির হাতেখড়িই হল 'ইকড়ি মিকড়ি' দিয়ে অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া আর পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি। তা সেটা সম্ভবতঃ সত্তর দশক। আসতে আসতে মুখে সদ্য গোঁফের ছোপ নিয়ে পড়তে গেলুম 'স্কটিশচার্চ কলেজ'-এ। ইতিমধ্যে অমিতাভ চৌধুরীকে ছড়া ছাড়া সাংবাদিক হিসেবে পেলুম আর পূর্ণেন্দু পত্রীকে একজন বহুমুখী স্রজক হিসেবে। স্কটিশে পড়াকালীন আলাপ সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের ছেলে। আমি পড়তুম ইংরেজি নিয়ে। সুব্রত দর্শন। কথায় কথায় জানলুম পূর্ণেন্দু পত্রী ওর পিসেমশাই। ব্যাস আর পায় কে। আমার ছেলে-বয়েসের স্বপ্নের আর্টপুলে ঝুলে থাকা কবিতাগুলো এক একটা রঙ বেরঙের ফুল হয়ে ফুটতে শুরু করল। দেখা করা যায় কীভাবে এ চিন্তাই যখন মাথায় জিলিপির মতো পাক খাচ্ছে, হঠাৎই সুযোগ মিলে গেল সুব্রতর পৈতেতে। আমি, হীরু গাঙ্গুলীর কাছে তবলা শেখা আমার বন্ধু অসীম চ্যাটার্জী পৌঁছে গেলুম সীতাভোগ মিহিদানার বর্ধমান। সেই প্রথম দেখলাম, দিব্যকান্তি আমার প্রিয় মানুষকে। সযত্নে লালিত কোঁচকানো কেশদাম, শালপ্রাংশু চেহারা গেরুয়ার সঙ্গে তুলি ছোঁওয়া 'অফ্-হোয়াইট' পাইল করা গায়ের রঙ, সমরেশ বসুর মতো প্রশান্ত ধ্যানমগ্ন যোগীমুখ। প্রাথমিক আলাপচারিতার পর আমরা সব একত্রে রাত্রিবাস করলাম বর্ধমানে। সেটা আশি'র দোরগোড়ায়। সেদিন সুব্রতর পিসতুতো মধ্যমা বোনটিকে দেখে মনে হয়েছিল প্রায় পূর্ণেন্দু পত্রীর মুখের জেরক্স। তারপর আবার দীর্ঘদিন-দেখা সাক্ষাত নেই। পড়াশুনো আর স্কটিশচার্চ-এর ক্রিকেট এসবেই ব্যস্ত ছিলুম। 'আশি'র শুরুতে যখন লেখালেখি ডাকাডাকি শুরু করে একবারে নাড়া বাঁধিয়েই নিলো, তখন আরম্ভ করলুম আকাশবাণী, যুগান্তর, দূরদর্শন টালিগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে। অবশ্য ইতিমধ্যে আমরা যখন 'থার্ড' ইয়ার-এ তখন ওঁর ছেলে পুণ্যব্রত ভর্তি হল ইংরেজি নিয়েই স্কটিশে। আবার পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন, নতুন আলোচনার নবীনবরণ। তো এই কাগজের অফিসে ঘুরতে ঘুরতেই এ কাগজে সে কাগজে লেখালিখি করতে করতেই 'দেশ' এ চারটে বই 'রিভিউ' এর ভার দিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তার মধ্যে আমার বান্ধবী ঈশিতা কাপড়ীর একখানা বই ছিল 'শব্দে রক্তে আঙ্গুলে' পূর্ণেন্দু পত্রীর 'মলাট' আঁকা। ওমনি আমার মাথায় ঢুকল পূর্ণেন্দুদাকে দিয়ে ঈশিতা ছবি আঁকিয়ে থাকে, আমার 'যুবকের সিগন্যাল'-এর মলাটই বা কেন পূর্ণেন্দু পত্রীর হস্ত-অলংকৃত হবে না। তখন পূর্ণেন্দু পত্রী 'প্রতিক্ষণ'-এ। প্রায় এক ছুটে লেনিন

সরণী। ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু পত্রীর ভীষণ বাড়াবাড়ি অসুখ হয়ে গিয়েছিল 'হাঁপানি' গোছের খুবই বিধ্বস্ত লাগছিল অফিসে। আবদার পাড়লুম। পূর্ণেন্দু পত্রী তদ্দিনে শুধু পূর্ণেন্দুদা। বললেন খুব ধীরে ধীরে এখন 'মলাট' আঁকা ছেড়ে দিয়েছি, একবারে আঁকতে পারছিনা। বস্তুতঃ আমি খবরাখবরও পাচ্ছিলুম আঁকা ভীষণ-রকম কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। বললুম, আমাকে আমার লেখা জমানোর (আমার বিভিন্ন প্রকাশিত লেখার 'কালেকশান') এ্যলবাম এর জন্যে কিছু লিখে দিতে হবে চট করে চিন্তা করেই লিখে দিলেন, সৌমিত্র গড়ছে এ্যলবাম চিত্র-বিচিত্র।

দীর্ঘদিন আর দেখা সাক্ষাত নেই। আমি 'যুগান্তর' কাগজের 'এ্যসাইনমেণ্টটা' মন দিয়ে করছি। তখন অমিতাভ চৌধুরী হয়ে গেছেন অমিতদা (তখন 'যুগান্তর' এর সর্বময় কর্তা)। একদিন ঘুরতে ঘুরতে 'আজকাল'-এ গেছি পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে দেখা, আবার কলকল আলাপচারিতা। গেছি শান্তিনিকেতন, সেখানেও দেখি পোস্ট অফিসের সামনেটায় ছাতিমতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে অন্যমনস্ক উনি হাঁটছেন। আবার আন্তরিক আলিঙ্গন। ইতিমধ্যে 'কফি-হাউস'-এ ওঁর কনিষ্ঠ তনয় এর সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। এসবের পর হঠাৎই পূর্ণেন্দুদাকে চিঠি দেবার পর পর একেবারে আকস্মিক দু-দুখানা চিঠি পেলাম আর কি আকুল আবহে অনুস্মরণ, ওঁর চিত্র প্রদর্শনী দেখার নেমন্তন্ন সব। একটা ব্যাপার যেটা আমার খুব স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে, সেটা হল পূর্ণেন্দুদার কাজে কম্মে কলমে-তুলিতে হাবে-ভাবে যতই 'স্যফিসটিকেশন' এসে থাকুক না কেন, কথাবার্তায় কিন্তু দাদা ছিলেন একেবারে খাঁটি আগমার্কা হাওড়া জেলার বাগনান তথা নাকোল মার্কা। সেই এ্যক্‌সেন্ট, সেই প্যস্‌, সেই ম্যানারিজম্‌। তিনি কতো-বড়ো পরিধির ছিলেন, সেটা মাপতে গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই তবে আমার কেবল সেই ইকড়ি-মিকড়ির কথাটাই মনে পড়ে। এক কিশোরের স্বপ্নের পুরুষ তেলে রঙে, ক্যানভাসে, প্যালেটে নয়, রক্তে মাংসে, ঘামে, শ্রমে, শীলনে। পূর্ণেন্দু পত্রী, পূর্ণেন্দু পত্রী আকাশ আর পাতালের যে মধ্যবর্তী, যজ্ঞের ঋত্বিক ও অগ্নিহোত্রী।
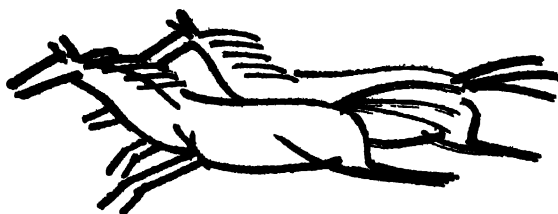
উত্তরবঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী

নীরদ রায়

আগ্রহ জেদ বা একটা ইচ্ছা প্রথম থেকেই ছিলো। সময়টা ঠিক মতো সায় দিচ্ছিলনা বলে কখনো কখনো দশ পা এগিয়েও পনেরো পা পিছিয়ে আসতে হয়েছিলো। অনেক কিছু জানবার এবং খোলামেলা ভাবে মিশবার আগ্রহটা কিন্তু তৈরী হয়েছিলো আরো অনেক আগে থেকেই। পূর্ণেন্দু পত্রী তখন আনন্দবাজার পত্রিকার আর্ট ডাইরেকটার। নিজের সামান্য লেখালেখি নিয়ে বছরে একবার দুবার আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে বরাবরই গিয়েছি। এখনো যাই সেখানে অনেকের সংগেই সৌজন্য মূলক দেখা করি, গল্প গুজব আড্ডাও হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার সময় হঠাৎ দু একবার পূর্ণেন্দু পত্রীর সংগে দেখাও হয়েছে। এখনো তার সংগে কথা বলার মতো একটা সাধারণ পরিচয়ও স্থাপিত হয়নি। সিঁড়িতে ওঁকে উঠতে বা নামতে দেখলেই থমকে দাঁড়াতাম, কিভাবে হাঁটেন, কিভাবে চারপাশে তাকান প্রিয় মানুষটি—শুধু এই টুকু একটু ভালো করে দেখার জন্যে। এখনো পূর্ণেন্দু পত্রী আমাদের কাছে পূর্ণেন্দুদা হয়ে যাননি। ওঁর কি একটা কবিতা আমরা এখন গোগ্রাসে গিলছি আর ভাবছি কবিতা এভাবেও লেখা যায়। কবিতার পাশাপাশি পড়ছি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও আলোচনা, দেখছি এক একটা বইয়ের মলাট যেন কথা বলছে, ছবি নিয়েও নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। সবটাকেই মনে হতো নিখুঁত ও সাবলীল। এরপর তো সিনেমার ব্যাপারটা আছেই। এখানেও আর এক স্বতন্ত্র পূর্ণেন্দু পত্রী। ক্যামেরা দৃশ্যপট ও ছবির মধ্যে ব্যবহৃত কথা এসব যেন এক একটা কবিতা। তাঁর কাজ কর্মের এইসব অভিনবত্ব যত প্রকাশ হয়ে পড়ছে আমি বা আমরা ততই তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েছি। চিন্তা ভাবনার অনেকটা জায়গা জুড়েই তখন তাঁর অবস্থান। যাঁকে নিয়ে ভেতরে আমার এই অবস্থা তাঁর সংগে কিন্তু এখনো আলাপ হয়নি। হয়তো হয়ে যেতে পারতো কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। তখনকার ভাবনাটা ছিলো এই বলে, কারণ ছাড়া অত বড় মাপের এক বহুমুখী প্রতিভাবান মানুষের সংগে কি কথা বলবো, আমার কি সেই যোগ্যতা আছে। এক আধখানা কবিতা ছাড়া নিজের সম্পর্কে বলার তো কিছুই নেই, এই নিয়ে কি ঐ রকম একজন বিখ্যাত লোকের সংগে কথা বলা যায়।

তাই অনেক সময় আনন্দবাজারে তাঁর ঘরের সামনে গিয়েও তাঁকে একা বসে থাকতে দেখেও, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফিরে এসেছি। দিন মাস বছরের হিসেবে সময় এগোয়—পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রতি আগ্রহও আমাদের বাড়তে থাকে। এই সময়

হঠাৎ একদিন শুনলাম পূর্ণেন্দু পত্রী আনন্দবাজার ছেড়ে "প্রতিক্ষণে" চলে এসেছেন। কলকাতাব কোলাহল থেকে অনেক দূরে থাকি, সব সময় চোখে দেখার চেনাচেনির পর্যায়ে যোগাযোগ আমাদের পক্ষে বাধা সম্ভব হযে ওঠে না। যেটুকু হয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে। প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রতিক্ষণ নিতে আবম্ভ করি। প্রতিক্ষণেও পূর্ণেন্দুপত্রী শিল্প নির্দেশক। দু একটা সংখ্যার পব কবিতা পাঠাই সম্পাদকের নামে ছাপাও হয়। এভাবে কয়েকটা কবিতা প্রতিক্ষণে প্রকাশিত হওয়ার পর একবাব প্রতিক্ষণ পত্রিকার অফিসে যাই, একটাই কাবণ যদি কোনভাবে পূর্ণেন্দু পত্রীব সংগে একটু আলাপ করার সুযোগ ঘটে। অপেক্ষা যে সব সময় মানুষকে নিরাশ কবে এমন কোন কথা নেই, অন্তত আমাব ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। প্রতিক্ষণ পত্রিকাব অফিসে একজনকে পূর্ণেন্দু পত্রী কোথায় বসেন, কখন আসেন জিজ্ঞেস কবতেই উনি দেখিয়ে দেন—ঐতো পূর্ণেন্দুদা বসে আছেন, যান। মনের মধ্যে লুকিযে থাকা আগ্রহটাকে একটু নাডাচাডা করে পূর্ণেন্দু পত্রীর ঘবে ঢুকেই পডলাম। পূর্ণেন্দু পত্রী মুখ তুলে তাকালেন, তাকানোব মধ্যে লুকিয়ে ছিলো কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। আমি কোন কিছু না ভেবে বলে ফেললাম আমার নাম এবং কোথা থেকে এসেছি। যা আমার আশাতীত ছিল, হ'ল তাই—যেন কতদিনের পরিচয় এই ভাবে তিনি আমাকে বসতে বললেন, লেবু চা খাওয়ালেন। ঐ বকম একটা বিরাট মাপের মানুষের সঙ্গে কতক্ষণ আব কথা বলা যায়, কথা তো দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকে। তিনি কিন্তু আমাকে ছাড়েন না। উত্তরবঙ্গের নানান প্রান্তের খোঁজ খবর নিতে থাকেন। এই সব কথার মাঝখানে আমি একবার আমাদেব প্রতীক্ষার ঢাকনাটা খুলেই ফেললাম। বললাম "রায়গঞ্জে নিয়ে যেতে চাই আপনাকে" উনিও সংগে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। তবে সময়টা মার্চের আগে নয়। আরো অনেকক্ষণ কথা হ'ল বিভিন্ন বিষয়ে, আমার কবিতাও চেয়ে নিলেন। ঘর থেকে বেরনোর সময় হঠাৎ বলেই ফেললাম—পূর্ণেন্দুদা আসি। উনিও বললেন এসো, চিঠি দিয়ো। সেই থেকে পূর্ণেন্দু পত্রী আমার কাছে পূর্ণেন্দুদা হয়ে গেলেন।

পূর্ণেন্দুদাকে প্রথমবার রায়গঞ্জে নিয়ে আসি মার্চ ১৯৮৮-তে। রায়গঞ্জের 'চয়ন' পত্রিকার দশম বছর পূর্তি একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে আমি এবং আরও কয়েকজন যারা পূর্ণেন্দুদার অনুভক্ত, চেয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন খোলা-মেলাভাবে মিশবার সুযোগ। লেখালেখি নিয়েই আমাদের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন ও দ্বিধা। চাইছিলাম এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্ণেন্দুদা কিভাবে দেন। কলকাতার কোন বড পত্রিকার অফিসে পাঁচ দশ মিনিটের আলাপ নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই শেষ হয়ে যায়। যাঁর সম্পর্কে নিজের মনের মধ্যে একটা আলাদা ধারণা বাস্তবের মানুষটাকে প্রায় ছাপিয়ে যাওয়ার উপক্রম, তাঁর সঙ্গে পাঁচ দশ মিনিটের গল্প-গুজব তো প্রায় চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। তাই এক সঙ্গে থাকার ক'টা দিনের সুযোগ যখন এল আমরা তখন উত্তেজনায় টগবগ করে

ফুটছি। রায়গঞ্জে যারা লেখালেখি করে বা পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন কিভাবে পূর্ণেন্দুদার সান্নিধ্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ করেছে। তপনদা মানে সম্পাদক গল্পকার তপনকিরণ রায় তো চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে ছায়ার মত আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন আলোচনা ও সাক্ষাৎকারে ছিলেন কবি ব্রততী ঘোষরায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুশান্ত আচার্য, এণাক্ষী আচার্য, লালিমা দাস, আশিস সরকার, অরুণ চক্রবর্তী, সৌরেন চৌধুরী, প্রভাত লাহা, প্রতীক ব্যানার্জী, ইন্দ্রাণী ব্যানার্জী, মায়া সিনহা, তুহিনকুমার চন্দ, ডা. বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী, হরি চৌধুরী, ছায়া রায়, অজিত ভূষণ রায়,সাংবাদিক চিত্রশিল্পী অলক কুণ্ডু সুদিন চন্দ সুব্রত সরকার, তপন চৌধুরী আলিপুরদুয়ার থেকে আগত প্রবীণ কবি বেণু দত্ত রায়, মধুপর্ণী সম্পাদক (বালুরঘাট) অজিতেশ ভট্টাচার্য, নিমাই রুদ্র, অমল ঘোষ প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, উঃ বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রমুখ। চয়ন পত্রিকার অনুষ্ঠান ছাড়াও আরো তিন চারটে সাহিত্যের অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দুদা ছিলেন হয় সভাপতি নয় প্রধান অতিথি। সবকটি সভাতেই তাঁকে দেখার জন্যে কিংবা অটগ্র্যাফ নেয়ার জন্যে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের ভীড় ছিল লক্ষ্য করার মত। তিনি প্রতিটি সভাতেই সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক মূল্যবান সব বক্তব্য রাখেন। তবে মূল আলোচনা বা আড্ডার আসরগুলি বসতো একটু বেশি রাতে। রায়গঞ্জ শহরের মাঝখানে ইরিগেশন বাংলোয় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। সারাদিন গাড়ি দিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি, সন্ধ্যায় কোন না কোন সাহিত্য আসর, রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাংলোয় ফিরে আসা। রাতের আসরগুলো বসতো সাধারণত রাত নটা থেকে, চলতো রাত দুটো আড়াইটা পর্যন্ত। এমন কোন বিষয় ছিল না যা ঐ অবস্থায় আলোচিত হ'ত না। সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি যখন যেটা প্রাধান্য পেয়েছে সেটাই এসেছে আলোচনায়। শুধু একটু টোকা মারার অপেক্ষা। পূর্ণেন্দুদা খুলে দিতেন সব সবিস্তারে। আমরাও আমাদের অপূর্ণতাকে পূরণ করে নিতাম সাধ্যমতো। তবে প্রতিটি রাতের আড্ডার শেষ দিকে থাকতো গান। তাঁর সঙ্গে আমরাও গলা মেলাতাম। কাউকে কটাক্ষ করে হয়তো সেখানেই রচিত হ'ত দুটো লাইন (রসিকতার পর্যায়) এবং তাৎক্ষণিক সুর দিয়ে গাওয়াও হ'ত সেই গান। গানের আসরে অতবড় মাপের একজন মানুষ প্রায় শিশু হয়ে কিভাবে যে মিশে যেত আমাদের সঙ্গে ভাবা যায় না। আজ সেসব দৃশ্য দুষ্প্রাপ্যের তালিকায়। এইসব আড্ডায় যারাই খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদেরি খাতায় এঁকে দিয়েছেন অসংখ্য ছবি ও স্কেচ। চিত্র শিল্পী অলক কুণ্ডুকে তো প্রায় হাতে ধরে তার ছবিগুলির (অলকের আঁকা) ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি অলকের খাতায় এঁকে দিয়েছিলেন প্রায় ৩০ /৪০ খানা ছবি। পরবর্তীতে পূর্ণেন্দুদা তাঁর একটি বই অলককে উৎসর্গও করেছিলেন। সাত আটটা দিন আমাদের কিভাবে যে কেটে

গিয়েছিল আমরা বুঝতেও পারিনি। সব সময় বলতেন স্থায়ী ও মৌলিক কিছু কর আমি তোমাদের পাশে আছি। পূর্ণেন্দুদা ফিরে যাওয়ার সময় আমরা যেন আমাদের এক নিকট আত্মীয়কে বিদায় জানাচ্ছি এই অবস্থা আমাদের। গাড়িতে ওঠার সময় পূর্ণেন্দুদা বলেছিলেন—অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু রায়গঞ্জে তোমাদের সঙ্গে এই আড্ডার আনন্দ কোথাও পাইনি। কটা দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল। রায়গঞ্জে অনেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এসেছেন কিন্তু পূর্ণেন্দু-দাকে নিয়ে আমরা যেভাবে আনন্দ করেছি, সমৃদ্ধ হয়েছি প্রতি মুহূর্তে—অন্য কারো সান্নিধ্যে সেটা হয়নি, হবেও না হয়তো কোনদিন! দ্বিতীয়বার তিনি উত্তর বঙ্গে আসেন এপ্রিল ১৯৯০-এ আজকাল পত্রিকার একটি অনুষ্ঠানে শিলিগুড়িতে। চাকরি সূত্রে আমিও তখন শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়িতে আসার এক মাস আগে থেকেই আমরা তাঁকে নিয়ে তৈরী করি আলাদা একটা ভ্রমণসূচী। তাঁর সান্নিধ্য মানেই আলাদা একটা উত্তেজনা, হিসেবের বাইরে কয়েকটা দিন ইচ্ছে মত খরচ করার আনন্দ। তিনি শিলিগুড়িতে আসছেন তপনদা (তপনকিরণ রায়) অলক কুণ্ডু আসবে না এটা তো হতে পারে না। তাই আজকালের অনুষ্ঠানের একদিন আগেই তপনদা, অলক কুণ্ডু শিলিগুড়িতে গিয়ে হাজির। আমি সুকান্ত আচার্য, তপনদা, অলক কুণ্ডু মিলে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হ'ল এই আলাদা ভ্রমণ সূচীর। আজকাল পত্রিকার পাঠকের মুখোমুখি শীর্ষক অনুষ্ঠানটি ছিল দুদিনের। পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে আরো অনেক বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা এসে-ছিলেন কলকাতা থেকে। অনুষ্ঠানের শেষে আমরা (আমি, তপনদা, অলক, তপন সাহা) তাঁকে নিয়ে সোজা শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ারে কবি সমীর চক্রবর্তী, বেণু দত্তরায় সেদিন বিকেলে একটি আসরের ব্যবস্থা করে-ছিলেন পূর্ণেন্দুদাকে সামনে রেখে। সেই আসরে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার তুফানগঞ্জ থেকে অনেক কবি সাহিত্যিক এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে গল্প কবিতা পাঠের পর সমীর চক্রবর্তীর বাড়িতেও একটা ছোট মাপের আড্ডা বসে। সেখানে এবং সাহিত্য আসরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমীর চট্টোপাধ্যায়, অমর চক্রবর্তী, অর্ণব সেন, বেনু সরকার, তন্ময় সরকার, কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, হারাধন পাল, সঞ্চিতা দাস প্রমুখ। আমাদের এই ভ্রমণসূচীতে ছিল আলিপুর-দুয়ারের পর জয়ন্তী। তাই আলিপুরদুয়ারের পরের দিন আমরা চলে আসি জয়ন্তীতে। আলিপুরদুয়ারের রোডসের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যিনি আবার পূর্ণেন্দুদার কবিতা এবং ছবির অনুভক্ত তিনিই জয়ন্তীতে আমাদের দুদিনের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছিল তরুণ কবি কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। রাজাভাতখাওয়ার পর রাস্তার দুধারে গভীর জঙ্গলের মাঝখানে সরু ও নিঃসঙ্গ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, কবিতা ও গান, এ এক বিরল অভিজ্ঞতা ও আনন্দ। জয়ন্তীতে পৌঁছে প্রথমটায় আমরা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

জয়ন্তীকে দেখার একটা কৌতূহল ছিলই কিন্তু সেটাও যে আমাদের অনুমানকে এইভাবে ছাপিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। বাংলোর দোতালার বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে পূর্ণেন্দুদাও দু-একবার চোখ কচলালেন, আসলে সুন্দর যে এত সুন্দর হবে আমরা ভাবতে পারিনি। বাংলোর একদম গা ছুঁয়ে সাদা বালির রায়ডাক নদী। বালির মাঝখানটায় সরু ফিতের মত সামান্য কালো জল নিয়ে নেচে চলেছে রায়ডাক নদী। নদীর ওপারে গম্ভীর পাহাড়, বড বড গাছপালার জমায়েত। নদীর ওপর ডানা মেলে ঝুলে আছে এক কাঠের ব্রীজ। সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক অপূর্ব সংগ্রহশালা। বিকেলের দিকে পূর্ণেন্দুদাকে নিয়ে রায়ডাক নদীর সাদা বালির ওপর দিয়ে দু-এক কিলোমিটার হাঁটা কিংবা কখনো বা পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোন এক গুহার মুখে থমকে দাঁড়ানো পাঁচ সাত মিনিট এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যা হতে না হতেই জয়ন্তী তার পোশাক পাল্টে ফেলে অন্য এক জয়ন্তী। মাথার ওপর হাসিখুশির চাঁদ। সামনে রায়ডাক নদীর সাদা বালির বিছানা, ওপারে গম্ভীর পাহাড ও তার গাছপালা, দৃশ্যাবলীর এই অপরূপ কাণ্ডকারখানা চোখ যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। এরই মধ্যে রাত প্রায় বারোটা অবধি চললো আমাদের কবিতা গান নিয়ে তুমুল আড্ডা। মাঝে মধ্যে অলক কুণ্ডুকে নিয়ে পূর্ণেন্দুদার রসিকতা আসরে একটা নতুন মাত্রা এনে দিচ্ছিল। রসিকতাও যে শিল্পের পর্যায়ে পড়ে পূর্ণেন্দুদার সান্নিধ্যে না এলে বুঝতেই পারতাম না হয়তো। প্রায় দশ দিন জয়ন্তীতে থেকে ফিরে এলাম আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ারে কিছুক্ষণ থেকে সোজা শিলিগুডি। শিলিগুড়ির তথ্যকেন্দ্রে সেদিন ছিল ডানপথ ও তথাগত পত্রিকার সাহিত্য আসর ও পূর্ণেন্দুদাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। শিলিগুডির অনেক তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। পূর্ণেন্দুদা সেদিন মনোজ রাউত ও সুশান্ত আচার্যকে বলে-ছিলেন, এই উত্তর বঙ্গের কবি গল্পকারদের বই প্রকাশের জন্যে তোমরা যদি একটা প্রকাশনা সংস্থা কর আমি কথা দিচ্ছি ৫০ টা বইয়ের মলাট বিনে পয়সায় এঁকে দেব। তোমাদের এই সব কাজে আমাকে সব সময় পাবে।

তৃতীয় বার পূর্ণেন্দুদাকে নিয়ে আসা হয় রায়গঞ্জের একটি মাধ্যমিক স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করে ও তমসুক পত্রিকা আয়োজিত পূর্বভারত কবি সম্মেলনে বিশেষ অতিথি (ডিসেম্বর ১৯৯৩) হিসেবে। আমরা সব সময় পূর্ণেন্দুদাকে একটু বেশি সময় ধরে পেতে চাইতাম। তাই তমসুকের পূর্বভারত কবি সম্মেলনের পাঁচ সাত দিন আগেই আমরা পূর্ণেন্দুদাকে, নিয়ে আসি রায়গঞ্জে। রায়গঞ্জের পাশে সুভাষগঞ্জ বলে একটি গ্রামেও নিয়ে যাই সেবার। জয়ন্তী নাগ বলে একটি মেয়ের, বাঁশের বিভিন্ন কাজে ইতিমধ্যে পঃ বঙ্গে ও তার বাইরেও যে বহু পুরস্কার পেয়েছে তার বাড়িতেই বাঁশের কাজের একটি কর্মশালায় আট দশ জন মেয়ে জয়ন্তীর নেতৃত্বে সেখানে কাজ শিখছে। পূর্ণেন্দুদা এইসব কাজ দেখে

অভিভূত। তিনি জয়ন্তীর স্কেচ করলেন সাক্ষাৎকার নিলেন। এর পর দিন নিয়ে যাওয়া হলো রায়গঞ্জ শহর থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে মহিষবাথান বলে একটি জায়গায়। এখানে পঃ বঙ্গ সরকারের অনুদানে চলছে একটি (এখনো) মুখোশ তৈরীর সমবায় কর্মশালা। পূর্ণেন্দুদা এইসব গ্রামীণ শিল্পীদের দু'একজনকে আগের থেকেই চিনতেন, এখানেও এদের কাঠের বিভিন্ন কাজ দেখলেন। দেখলেন গ্রামে ঢুকে ধোকড়া তৈরীর দৃশ্যগুলিও। এখানেও একাধিক স্কেচ করলেন। সারাটা দিন কাটলো আমাদের গ্রামীণ শিল্পীদেব সাথে। পরে 'প্রতিদিন' পত্রিকায় জয়ন্তী এবং মহিষবাথানের হস্ত শিল্প নিয়ে দুটো বড লেখাও লিখেছিলেন। তিন চার দিন রায়গঞ্জে কাটানোর পর আমরা রওনা হলাম কোচবিহার। কিন্তু সরাসরি কোচবিহার না গিয়ে পূর্ব পবিকল্পনা বা ভ্রমণ সূচী অনুযায়ী আমরা এলাম ধূপ-গুড়িতে পুন্যশ্লোক নিখিল বসু আয়োজিত সাহিত্য আসবে। জলপাইগুড়ি এবং আশেপাশের বহু কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। কবিতা পাঠ আলোচনায় অংশ নিলেন তিনি। ধূপগুড়ির ডাক বাংলোয় রাত্রিবেলা জমে উঠল আমাদের আড্ডা ও গান। আমি তপনদা সুশান্ত আচার্য জীবেশ দাস প্রমুখরা এবার পূর্ণেন্দুদার সাথে। সেই রাতে লাল নক্ষত্র পত্রিকার সম্পাদক কবি গল্পকার নিখিল বসু এক বিশাল সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁব। পুন্যশ্লোক পডলেন অনেকগুলি কবিতা। ডিসেম্বর মাসের শীত ধূপগুড়ি শহরকে তাড়াতাড়ি ঘুমোবাব ব্যবস্থা করলেও আমাদের পারেনি। আমাদেব রাতের আড্ডা যথারীতি একটা অবধি চললই। পরের দিন চা বাগানের একটি সাহিত্য আসর দুপুবে সেরে চলে আসি কোচবিহারে। তমসুক পত্রিকার সম্পাদক কবি সমীর চট্টোপাধ্যাযকে আগে থেকেই জানানো ছিল আমরা কবে আসব। সেই অনুযায়ী সমীরদা পূর্ণেন্দুদাকে আমাদের থেকে একটু আলাদা রাখলেন অর্থাৎ আমরা থাকলাম একটি অতিথিশালায়। পূর্ণেন্দুদার ব্যবস্থা হলো একটি বড় হোটেলে ওঁর সঙ্গে থাকলেন তপনদা। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পূর্ণেন্দুদাকে নিয়ে হাজির হলাম অমিয়দার বাড়িতে (প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার)। পূর্ণেন্দুদা অমিয়দাকে প্রণাম করলেন আর অমিয়দা বুকে জড়িয়ে নিলেন ওঁকে। সাহিত্য, রাজ-নীতি, অর্থনীতি নিয়ে অনেক কথা হ'ল। শেষে পূর্ণেন্দুদার কাছে উত্তরবঙ্গের কিছু জ্যান্ত ছবি চাইলেন অমিয়দা। পূর্ণেন্দুদাও মাথা দু'লিয়ে সম্মতি জানালেন। পরের দিন পূর্বভারত কবি সম্মেলন। সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজ্যের কবি সাহিত্যিকরা আসতে আরম্ভ করেছেন। আমরাও পূর্ণেন্দুদাকে নিয়ে কোচবিহারে রাজবাড়ি ঘুরে একটা শুকনো নদীর মুখোমুখি হতেই পূর্ণেন্দুদা কিছু ছবির স্কেচ করলেন। রাজবাড়ি হয়ে ফেরার সময় আলাপ হ'ল নীলমণি ফুকন, বিজিত ভট্টাচার্য, শক্তি-পদ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। পূর্ণেন্দুদা এঁদের আগের থেকে চিনতেন আলাপও ছিল। বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান। কলকাতার আমন্ত্রিতরা প্রায় সবাই এলেন, এলেন না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আর সুনীলদাই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। কি হবে! এইভাবে আমরা যখন এই চিন্তায় দিশেহারা—অমিয়দা তখন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। যথারীতি যেই কথা সেই কাজ, মঞ্চে উঠে পূর্ণেন্দুদার নাম ঘোষণা করলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। পূর্ণেন্দুদা এখানেও একটু রসিকতা করলেন—সুনীল তুমি দেখে যাও তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার কাজটা কিভাবে করছি—

সুনীলদার অনুষ্ঠানে না আসার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। কে বা কারা সুনীলদাকে টেলিগ্রাম করে জানান সমীর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা যাওয়ায় অনুষ্ঠান হচ্ছে না—।

যাইহোক সুনীলদাকে ছাড়াই অনুষ্ঠান হ'ল। পঃ বঙ্গ এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত কবি গল্পকার সম্পাদক সাংবাদিক এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল পূর্ণেন্দুদার। কবি সন্তোষ সিংহ নিত্য মালাকার সম্পাদক গল্পকার বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় অনুভব সরকার ভাস্বতী রায় চোধুরী উর্মিলা চক্রবর্তী প্রমুখদের সঙ্গেও পূর্ণেন্দুদার আলাপ হ'ল। সন্তোষের নতুন বই প্রকাশ উপলক্ষে পূর্ণেন্দুদা ওকে রসিকতার মাধ্যমে ফাইনও করলেন।

পরের দিন সকালবেলা ছিল ছবি আঁকার একটা কর্মশালা। মূল শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। প্রকাশদা যখন নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছবি আঁকতে ব্যস্ত পূর্ণেন্দুদা তখন একটু দূরে চেয়ারে বসে অসংখ্য ছেলেমেয়ের খাতায় স্কেচ সহ অটগ্রাফ দিয়ে যাচ্ছেন, হেসে কথা বলছেন, যেন কতদিনের পরিচিত।

এই মোট তিনবার পূর্ণেন্দুদা উত্তরবঙ্গে আমাদের সংগে ছিলেন এবং প্রায় গোটা উত্তরবঙ্গের কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। নিজে একজন বিখ্যাত কবি হয়েও বারবার বলেছেন মেজর পোয়েট কিন্তু শক্তি সুনীল। আরো অসংখ্য মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কথা আমরা তুলে রেখেছি আমাদের নিজস্ব ক্যামেরায়, প্রয়োজনে সেগুলিকে ওয়াশ করে নেব কোনদিন।

আমার বন্ধু পূর্ণেন্দু

বীরেন্দ্র দত্ত

পূর্ণেন্দু পত্রী আমার বন্ধু। একথার মানে এটা নয় যে তার সব নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। কিন্তু সে আমার বন্ধু। পূর্ণেন্দু মদ্যপান করত, আঁকতে বসে একাগ্র নিবিড় নিবিষ্ট হত, আমি সে অবস্থা দেখিনি, কারণ আমি আদৌ মদ্যপানে অভ্যস্ত নই, তার শিল্পসাধনায় আমি কখনো কাছে থেকে দীর্ঘ সময় কাটাইনি। মাঝে-সাঝে অবশ্য তার ছবি আঁকার সময় কাছে বসে গল্প-গুজব করেছি। পরে শুনেছি, পূর্ণেন্দু হাওড়ার বাগনানের এক গ্রামের ছেলে, আমি হাওড়ার দেউলটি স্টেশনে নেমে মাইল চারেক দূরের পানিত্রাস গ্রামের। এত কাছাকাছি গ্রামে কাটিয়েছি, কিন্তু কখনোই আমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তবে অবশ্য আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে কোন অস্বস্তি বা আড়ষ্টতা বাধা হয় নি।

আমার থেকে পূর্ণেন্দু বয়সে কিছুটা বড়। কিন্তু সেই বড়ত্বটা আমার ওপর দাদাগিরির দাবি চাপায়নি কোনভাবে। পূর্ণেন্দুকে আমি প্রথম দেখি কলকাতাতেই —তখন ও উত্তর কলকাতার শ্রীমানী বাজারের দোতলার উত্তর দিকের একেবারে কোণের ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। সঙ্গে, স্মৃতি হয়ত ভুলও করতে পারে, থাকত ওর কাকা নিকুঞ্জ পত্রী। যাই হোক আমি ওর ঠিকানা জানতাম না। আমি তখন থাকতাম গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটে ঠিক স্বামী বিবেকানন্দের বসত বাড়ির উল্টো-দিকে। আমার বাসার নীচে ছিল অমিয় হোটেল। পাশে একতলায় উমাশংকর প্রেস।

পূর্ণেন্দু আসত সুনীলের সম্পাদনায় ও উদ্যোগে প্রকাশিত কৃত্তিবাস পত্রিকার আড্ডায় এবং মাঝে-সাঝে। এই আড্ডা বসত রববার ও যে কোন ছুটির দিন সকালে। ওখান থেকে বেলা বাড়লে দেশবন্ধু পার্কের নরম ঘাসের ওপর শীতের দিনে, গাছের ছায়ার নীচে গরমের দিনে। বর্ষায় অবশ্য কফি হাউসের ছাদটাই আমাদের বসে আড্ডা দেওয়ার গ্যারান্টি দিত। ওখানেই একদিন এল পূর্ণেন্দু। আড্ডাটাকে আমার দিক থেকে 'আমাদের আড্ডা' বলার সাহস আমার নেই, ছিল সুনীলদের মত উঠতি কবিদের আড্ডা। আমি এর সঙ্গে যুক্ত হই মোহিত, শিবশম্ভু পাল, মতি নন্দী, আনন্দ, সুনীল নিতাই এদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। আমার গায়ে তখনো গাঁয়ের গন্ধ। আমার মুখ-চোখ-স্বভাব কেমন বোকা-বোকা, লাজুক-লাজুক। সুনীলদের আড্ডায় কবিতা পড়া হত, গল্পও। আর কি রাগ প্রতিবাদ সে সব কবিতায়। পঠিত গল্পগুলোয় থাকত রোমান্টিক উত্তরণ, সমাধান। দীপক, শক্তি, তন্ময় দত্ত থেকে শুরু করে মার নর্থ ও সাউথ মিলিয়ে সব রক্ত টগবগে-হওয়া

কবিরা ভিড় করত। অবশ্য মফঃস্বলের কবিকুল বলতে তখনো তৈরী হয়নি, হয়নি আজকের মত সুনীল শক্তিদের ভক্ত কবির দল।

হওয়ার কথা নয়, কারণ সুনীলরা তো সত্য লিখছে, তবে এই বয়সের উত্তেজনা আবেগ, যন্ত্রণা, উচ্চকণ্ঠ এমন ছিল যাতে সব তরুণরাই চুম্বকের মত লেগে থাকতে পারত। হয়নি। এই অবস্থায় এলো পূর্ণেন্দু। আমি চারপাশের ভিড়ের মধ্যে আদৌ লেখকই নই! কেবল শ্রোতা আর আড্ডাটা ভারী হয়ে ওঠার পক্ষে যেন বা অলিখিত সদস্য পদ নেওয়া! এলো উনিশ শ, সাতান্ন সাল। আমাদের বন্ধু-সংখ্যা বাড়ছে। লেখাপত্তরও। মতি, পূর্ণেন্দুরাও উল্টোরথ ঘোষিত মানিক স্মৃতি প্রতিযোগিতায় উপন্যাস লিখে পেয়েছে পুরস্কার। আজ আর গোপনতায় লাভ কি? ওদের এমন লেখার নমুনা দেখে আমি ভিতরে ভিতরে আমার প্রথম উপন্যাস 'উপনদী শাখানদী' শেষ করে ফেলেছি। আর এ নিয়ে প্রতিযোগিতায় যাওয়া! আমি ধারে কাছে নেই!

আদৌ লেখক নয়, সাধারণ বিলাসী পাঠক বন্ধু পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় তখন 'ইন্‌চাঙ্গা' জাহাজে চাকরী নিয়ে কলকাতা থেকে ডারবান বন্দর ঘুরতো। তিন মাস পর একমাস ছুটি পেলে কলকাতায় থাকত। ছুটি শেষে যখনি আবার জাহাজে উঠত, তখন প্রচুর টাকার বাংলা বই, তারাশংকর থেকে কার না—বই কিনে নিয়ে যেত। আমি সাহায্য করতাম। ও হঠাৎ, সাতান্ন সালের এক সময়ে বলল, ও একটা প্রকাশন সংস্থা খুলবে, আমাদের বন্ধুদের বইপত্তর ছাপবে! ঠিক করল আমার 'উপনদী শাখানদী', বন্ধুত্ব তখন আমার সূত্রে মোহিতের সঙ্গেও, মোহিতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' প্রকাশ করবে। প্রকাশনার নাম বুকবিভ্যু, ঠিকানা পদ্মপুকুর 'স্কোয়ার' খিদিরপুর। ওদের নিজেদের বাড়িতে।

প্রচ্ছদ করবে কে? পূর্ণেন্দু তখন রীতিমত নতুন রক্তের আবেগে ও বাসনায় প্রচ্ছদ আঁকছে। ঠিক হল পূর্ণেন্দুকে দিয়েই প্রচ্ছদ করানো হবে। গেলাম ওর শ্রীমানী বাজারের দোতলার সেই কোণের ঘরে। চাটাই পেতে বসে ছবি আঁকছে। মুহুর্মুহু সিগারেট টানছে, চা সঙ্গে আছেই। গায়ে গেঞ্জী আর পাজামা পরা। রোগা পাতলা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আর দিল খোলা হাসি দিয়ে আমাদের দুজনকে স্বাগত জানাল। পূর্ণেন্দু তখন 'দাঁড়ের ময়না'-র কথাকার, মোহিত নানান পত্র-পত্রিকায় তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি। যেমন আড্ডাবাজ পূর্ণেন্দু, তেমনি মোহিত। আমি তো লাজুক এক গ্রামের ছেলে। লজ্জায়, সংকোচে আমার মুখে কথা কম। আমরা দুজন তখন এম. এ. ক্লাশের ছাত্র। মোহিত রেলের অফিসে কাজ করে ছাত্র, আমি বাবার পয়সায় থেকে না-কাজ করে দু'পকেটে টিউশানি ভরা ছাত্র। মনে পড়ে পূর্ণেন্দু তখন আমাদের দুজনকে ওর প্রথম কবিতার বই দিল—'এক মুঠো রোদ'—যোলো পৃষ্ঠার বুকলেট।

তখন দেখেছি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পূর্ণেন্দুর ছবি আঁকায় নিপুণ

নিষ্ঠা, আর আছে প্রত্যয়। আমার 'উপনদী শাখানদী' আর মোহিতের 'আষাঢ়ে শ্রাবণে'—দু'টি গ্রন্থের, তখনকার দিনে অবশ্য অসাধারণ প্রচ্ছদ আঁকল পূর্ণেন্দু। আমরা দুই তরুণ আর এক তরুণের শিল্প চর্চার সান্নিধ্য ও উত্তাপ পেতাম। প্রথম প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে পূর্ণেন্দু আমার কাছে অভিনন্দিত হল। এর পরে পবিত্রর প্রকাশনার প্রসারের মধ্যে পূর্ণেন্দু তখনকার বিখ্যাত নাট্যকার আমাদের ঘনিষ্ঠ ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকেরও প্রচ্ছদ করেছে। পূর্ণেন্দুর ওখানে যাওয়া তেলেভাজা-চা আর সিগারেট সহযোগে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টায় আমরা দুজন কখন যে 'তুই'-এ নেমে এলাম তা আর মনেই পড়ে না।

আমি পূর্ণেন্দুকে 'তুমি' বলতাম, ও সেই যে 'তুই' ধরল, মৃত্যুর আগের শেষ সাক্ষাতের সময়েও সে আমাকে 'তুই' দিয়েই অন্তরঙ্গতাটুকু চিহ্নিত করে গেছে। এই সম্বোধন জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠের প্রতি নয়, এ সম্বোধন বন্ধুকে আপনত্বে আজীবন ধরে রাখার মত এক শব্দ ব্রহ্ম। একদিন কথা প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু বলল, 'ভাখ বীরেন, মানিক স্মৃতি পুরস্কার তো পেলাম, কিন্তু বইটার নাম যখন 'দাঁড়ের ময়না'—যদি ওটা ছাপায় 'ড়'-এর জায়গায় 'ত', আর 'না'-এর জায়গায় 'ল' ছাপা হয়, কি বীভৎস হয় বল্ তো!' 'দাঁড়ের ময়নার' জায়গায় 'দাঁতের ময়লা।' দুজনের সে কি হাসি।

এই রকমই। হ্যাঁ এই রকমই মাঝে-সাঝে পূর্ণেন্দুর কাছ থেকে হিউমার-এর টুকরো উপহার পেতাম। ও যেমন ছবি আঁকত শরীর পাত করে, তেমনি কবিতা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও লিখত সফল শিল্পীর মমতায়। একবার আমার চাকরী জীবনের মধ্যে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। আমি ছাত্র জীবনের শেষ স্তরের শুরু থেকেই পূর্ণেন্দুর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। আমি বাগনান কলেজ ছেড়ে তমলুক কলেজে তিন বছর কাজ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে চলে আসি স্থায়ীভাবে। দারুণ খুশি পূর্ণেন্দু। শ্যামবাজারের কফি হাউসে আমার খবর শুনে অভিনন্দিত করল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাকে বলে! নতুন কলেজে পড়ানোর মধ্যে ওই কলেজের এক জনপ্রিয় বাংলার অধ্যাপকের জনপ্রিয়তা আমার আসার পর ক্রমশ কমতে থাকায় (এসব আমি জানতামই না) তিনি ভিতর থেকে কৌশল করে আমাকে কলেজ থেকে সরিয়ে দিল! পূর্ণেন্দু শুনে যেমন অবাক, তেমনি ক্রুদ্ধ। অনেক কথা বলার পর, বেলাল চৌধুরী (অধুনা বাংলাদেশের একাডেমী পুরস্কার পাওয়া কবি) আমার বন্ধু ও আমার হরিতকী বাগান লেনের আস্তানার বাসিন্দা, তাকে পূর্ণেন্দু বলে, 'বেলাল, ঠিক কর্তো কিভাবে লোকটাকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া যায়।' আমার প্রতি তার বন্ধুত্বের এই সব প্রমাণ আজ আমাকে যেমন গর্ববোধ করায়, তেমনি তার হঠাৎ চলে যাওয়ার বেদনাকে নতুন করে জাগায়।

আমার সঙ্গে পূর্ণেন্দুর সম্পর্কের ভাবনায় অনেক ঘটনা, অনেক কথা মনে পড়ে। সব তো লেখা যায় না। মনেই থাক। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!'—একথা জীবনানন্দের, কিন্তু এর যত তাৎপর্য ব্যাখ্যাই হোক না কেন,

পূর্ণেন্দুর স্মরণে সব ব্যাখ্যাই যেন আমার মনের গভীর থেকে সমর্থন পেয়ে যায়। যাক সে সব কথা। পূর্ণেন্দু অবশ্যই শিল্পী, প্রচ্ছদ শিল্পী, কথাকার, কবি, প্রাবন্ধিক ছড়াকার, শিল্পসাহিত্য রম্য রচনার রচয়িতা। পূর্ণেন্দু ছবির প্রদর্শনী করে গেছে কলকাতায়, ভারতের বাইরে লণ্ডনে আমেরিকায়! কোথায় না! এই সেদিনও শক্তি মারা যাবার পর, লণ্ডনে যাওয়ার আগে, নন্দনে শক্তির কিছু কবিতা ধরে আঁকা ছবির প্রদর্শনী করে বিলেতে নিয়ে গেছে। এখানে মাত্র সাত দিনের প্রদর্শনী। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবার সময় পায়নি। জানা মাত্রই, ওর নির্দেশে, দেখতে গিয়ে হতাশ। তার আগের দিনই শেষ হয়ে গেছে প্রদর্শনী।

পূর্ণেন্দু বাংলা সিনেমা নিয়েও রীতিমত ভেবেছে। জানত, পরীক্ষামূলক ছবি তুলতে গেলে অর্থনৈতিক দুরবস্থার 'রিস্ক' মেনে নিতেই হবে। তবু একাধিক ছবি করে গেছে। স্বপ্ন নিয়ে, ছেঁড়া তমসুক, স্ত্রীর পত্র, মালঞ্চ—এসব আজও চোখের সামনে ভাসে। পূর্ণেন্দুর গভীর বাসনা ছিল স্বপ্ন নিয়ে, প্রেম নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে—এমন তিন নামে বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রিলজি করবে। 'স্বপ্ন নিয়ে'র গল্প হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'। প্রেম নিয়ে ও স্মৃতি নিয়ে কার গল্প নেবে বলেছিল ভুলে গেছি। 'স্বপ্ন নিয়ে' যখন 'রাধা সিনেমায় দেখাতে শুরু হল সে কি উত্তেজনা পূর্ণেন্দুর! আমরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক দিন প্রতি শো-তে ও হলে থাকত। নিজে স্রষ্টা আবার দর্শকও। কোন অংশ ঠিক হয় নি বাদ দেওয়া যায় সে সব তখনো edit করত পূর্ণেন্দু! বইটি কিন্তু হলে বেশীদিন চলেনি। তবু পূর্ণেন্দু ছবি তোলায় ক্লান্ত হয় নি, হতাশাকে ঘেঁষতে দেয়নি চিন্তা-ভাবনায়। যখন 'স্ত্রীর পত্র' তোলে পূর্ণেন্দু, তখন ও নিজে 'সরগম' নামে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের একটি গানের স্কুলে—যেখানে সুবিনয় রায় গান শেখাতেন, যেত সেতার ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতের তালিম নিতে। চলচ্চিত্রের সমস্ত দিক নিজের নখদর্পণে রেখে তবে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে ওঠার নিষ্ঠা ও সততা, শ্রম ও মনন তার মধ্যে ছিল।

পূর্ণেন্দু ওর অনেক বই আমাকে উপহার দিয়েছে। কবিতার বই, প্রবন্ধের বই, আরও অনেক। আমাকে ও একবার বলল, 'তুই অনন্দবাজারে আয়, তোর বইয়ের কভারটা দেব, আর সদ্য বেরুনো কবিতার বইও।' আমি বললাম, 'যাব কি করে! ওপরে ওঠায় তো কত বিধি নিষেধ!' বলল, 'আয় না আমি তো আছি।' আমি পত্রিকা অফিসের সামনে থেকে ওকে ধরলাম। ওর সঙ্গে যাচ্ছি। ওপরে যাওয়ার লিফ্‌টের দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ এনকোয়ারির এক ভদ্রলোক আমাকে যেতে বাধা দিলেন। পূর্ণেন্দু চাপা রাগে তো আগুন। হঠাৎ বলল, কি ভেবেছেন আপনি। দেখছেন না ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে!' বলে চুপ করে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ভদ্রলোক চুপ। কোন কথা না। আমি-পূর্ণেন্দু ওপরে চলে গেলাম। পূর্ণেন্দু ওপরে এসে বলল 'দেখলি তো, ক্ষমতা দিলে এরা তার থেকে কতটা এগিয়ে

যায় নিজেদের মত ক'রে।' বলি, সেদিনের অনেক আগে থেকেই পত্রিকা গোষ্ঠীর অভিভাবকদের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর মর্যাদায় সংঘাত চলছিল রীতিমত।

যাই হোক, চাকরী ছেড়ে দিয়ে পূর্ণেন্দু ফ্রি ল্যান্স কাজ করতে লাগল বাড়ি বসেই। তখনো ও ভাড়া বাড়িতে আছে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ির বিপরীতে, বাঙ্গুরে। পরে নিজের সুদৃশ্য বাড়ি করে সল্টলেকে। পূর্ণেন্দু নতুন চাকরী নেয় 'আজকাল'-এ, 'প্রতিদিন'-এ। এই সময় থেকেই পূর্ণেন্দু নিজের আঁকার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে থাকে। আর আমি এই পর্বে একটি ছোট প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে তার প্রধান উপদেষ্টা, প্রত্যক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে পারিশ্রমিক হীন সাম্মানিক মর্যাদায় যুক্ত হয়ে যাই স্থায়ীভাবে। পূর্ণেন্দু সেই প্রকাশন সংস্থার মর্যাদা-সম্পন্ন প্রচ্ছদচিত্রী হয়ে ওঠে। আর এই সূত্রেই পরিণত বয়স ও মনের পূর্ণেন্দুকে আবার নতুন এক প্রাজ্ঞ বন্ধুত্বে কাছে পাই।

পূর্ণেন্দুর ব্রঙ্কিয়াল ট্রাব্‌ল্ ছিল, এ্যাস্‌মা ছিল আগে থেকেই। এটাই ওকে ক্রমশ অশক্ত করতে থাকে। ওর বাড়ি নানা প্রয়োজনে গেছি। ও বলত ওর শরীরের কথা, ডাক্তার দেখানোর কথা। কিন্তু ছবি আঁকায় ক্ষান্তি ছিল না। আর কি অসাধারণ সব ছবি আঁকত! আমার দেওয়া কাজ ও কখনো ফেলে রাখত না। বলত, 'আমি কোন কাজ যদি অসুস্থতার কারণে বা অন্ত কোন অসুবিধের কারণে আঁকতে না পারি, সুব্রত চৌধুরী ছাড়া আর কাউকে দিয়ে তা করাতে যাস না।' একবার বলল, 'তোর প্রকাশককে দিয়ে আমার একটা কিশোর পাঠ্য বই করার ব্যবস্থা কর।' নিলাম 'রূগণুকে নিয়ে রূপকথা'-র ছাপানো পাণ্ডুলিপি। ওরই নির্বাচনে বইটার ছবি সব ও নিজেই করেছিল যুধাজিতের কিছু 'লাইন ড্রইং' ছাড়া। বাচ্চাদের লেখায় পূর্ণেন্দুর হাত যে কত পাকা, কল্পনায় ও কিশোর মনের জগত ধরায় সে বা কত সিদ্ধ শিল্পী, এই বইটি তার প্রমাণ দেয়।

এবার ওর আঁকা প্রচ্ছদ নিয়েই কথা বলি। যখনি নির্দিষ্ট দিনে কভার আনতে গেছি, ও সঙ্গে সঙ্গে দিত না। আমার সামনেই বসে বসে আরও অনেক রঙের তুলির ঘষা মাজা শেষ করে তবে দিত। এক-একটি ছবি ছিল ওর রক্ত বিন্দু। পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদের বড় গুণ সর্বাবয়বে চিন্তার, মৌলিকতা। এমন অসাধারণ Colour sense আমার মতে পূর্ণেন্দুর সমকালে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ছিল। পূর্ণেন্দু শিল্পী হিসেবে বড়—কারণ তার মধ্যে ছবির Art আর Commercial দিক চমৎকার মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণেন্দু কখনো কোন ছবি দুবার এঁকে দুজনকে ঠকায় নি। সে নিজে যেসব অক্ষরলিপি তৈরী করে গ্রন্থ নামে লেখকনামে বসাত তা তার মৌলিক ভাবনার ফসল, তার কল্পনারই বাস্তব অভিজ্ঞান। আমি দেখেছি, পূর্ণেন্দু তার লেখার সব অক্ষর নিয়ে তালিকা করছিল তার ডায়েরীতে। তার মেয়ে-পুরুষের শরীর এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায় কখনো বিমূর্ত, কখনো বা প্রতীকী হয়ে উঠতো অবলীলায়।

আমার মনে আছে আমার 'রানার চলেছে, রানার' গ্রন্থের প্রচ্ছদে সুকান্ত ভাবনাকে প্রতীকী করেছিল চকলেট রঙের পটভূমিতে দুপাশে কালো রাস্তার উপযোগী তুলির মোচড় আর মাঝখানে রক্তাক্ত রাস্তায় তুলির বলিষ্ঠ টানের মধ্যে। প্রচ্ছদের মূল্য ছিল বেশী, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার শিল্পমূল্য বুঝতে পারবে না। সুকান্তর দুঃখময় জীবনের সঙ্গে এর প্রচ্ছদের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে পূর্ণেন্দুই পারে সচেতন, সহৃদয় পাঠক ও দর্শক মন জিতে নিতে। আমার প্রথম উপন্যাস 'উপনদী শাখানদী'র প্রচ্ছদ ১৯৫৮ সালে রসিক মহলে রীতিমত আলোড়ন তোলে। এর পর আমার নিজের গ্রন্থের একাধিক প্রচ্ছদ, মোহিতের প্রচ্ছদ এঁকে পূর্ণেন্দু শিল্পী ও কবির যৌথ দায়িত্ব পালন করেছে। আমার বিশ্বাস পূর্ণেন্দুর বাংলা গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্রে যে অবদান, তা কোনদিন ম্লান হবে না। তা অবশ্যই হবে অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, উত্তরসূরী প্রচ্ছদচিত্রীদের কাছে পরম প্রেরণাস্থল।

যখন পূর্ণেন্দু প্রচ্ছদচিত্রী, এবং পাঠকরা প্রধানত এই অভিধায় সার্থকতার দিকে গভীর মুগ্ধ বিস্ময়ে তার স্বীকৃতি দেয়, তখন পূর্ণেন্দুর সঙ্গে এতদিন মিশে একটা জিনিস দেখেছি, পূর্ণেন্দু কবি-বন্ধুদের গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকায় ছিল মুক্তমন। ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্ণেন্দু বহু পরিচিত-এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে সমান মর্যাদায়। কোন ছোটবড় লিট্‌ল ম্যাগাজিন, কোন নতুন কবির গ্রন্থের প্রচ্ছদ বা প্রতিষ্ঠিত বহু-কবির প্রচ্ছদ আঁকতে বসে যেমন আক্ষরিক অর্থে কোন মূল্য নেয়নি, তেমনি প্রত্যেকটি প্রচ্ছদে সময়, নিষ্ঠায় অমূল্য কল্পনাকে সমান দরদে ও যত্নে প্রয়োগ করেছে। এখানেই প্রচ্ছদচিত্রী হিসেবে তার মহত্ব ও কৃতিত্ব। পূর্ণেন্দু ছিল রসিক, হিউমারিস্ট। সে সব আজ আর উদাহরণ দিয়ে বলার সময় ও সুযোগ নেই। তবু এই রসিক মানুষটিকে দেখা যায় শেষ দিকে কিছুটা স্বভাব-বিরুদ্ধ হ'তে। আসলে ওর শরীরের মধ্যে যে ভয়ংকর এক রোগ ওকে ঘুণকাঠের মত অসহায় করছিল, তা-ই ওকে নিজের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বীতশ্রদ্ধ করে—অন্তত আমার তাই মনে হয়। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও সে তার অনেক ভাল ভাল কাজ করার কথা বলে, কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সুযোগ দিল না। আমরা আরও অনেক পেতাম তার কাছে, পেলাম না। এই অর্থে তার মৃত্যু অবশ্যই অসময়ের। আর এই মৃত্যু তাকে আমাদের কাছ থেকে চিরকালের জন্যে আড়াল করে দিল, এ দুঃখ, কষ্ট, বেদনা কী আর বলতে পারি, কি ভাবেই বা বোঝাব? পূর্ণেন্দু অনেক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশেছে নিজের মত বা তাদের মত করে। আমার কাছে কিন্তু সে একেবারে আমারই মত। তাই পূর্ণেন্দুর মৃত্যু আমার কাছে এক অন্তরঙ্গতম স্বজন বিয়োগের উপযুক্ত উদাহরণ—বড় বেদনাদায়ক।

উলুবেড়িয়ায় পূর্ণেন্দু পত্রী

সুপ্রিয় ধর

সময়টা সত্তরের দশক। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.-র ছাত্র। বোমাবাজির দাপটে প্রায়শঃই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাশ হয় না। পশ্চিমবাংলার গ্রাম শহর সে সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন আলোড়নে অস্থির। রক্ত ঝরছে গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, নকশালবাড়ী, বরানগর, কাশীপুরে। কে কোথায় খুন হচ্ছে, হিসেব নেই ; কত লাশ যে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, হিসেব নেই। লালবাজারের দেয়ালে কত যুবক যুবতীর রক্ত লেগে আছে, হিসেব নেই ; রাত্রির নৈঃশব্দকে খান্ খান্ করে দিয়ে পুলিশ, সি. আর. পি-র বুটের আওয়াজ আর বন্দুকের গুলি কত লোকালয়কে যে শ্মশান করে দিয়েছে, হিসেব নেই তার তখন। এমনই দম বন্ধ করা সময় ছিল সত্তরের দশক।

ঠিক এরকম সময়েই মুক্তি পেল দীর্ঘদিন বাক্সবন্দী হয়ে থাকার পর ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো', সম্ভবত ছবিঘর সিনেমা হলে। আমি যেহেতু দুর্মরভাবে ঋত্বিকের ছবির অনুরাগী, তাই প্রথমদিন প্রথম শো'তে দেখতে গেলাম 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। ছবির শেষে হল থেকে বেরোচ্ছি, চেতনায় অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ঋত্বিকের সব ছবিতেই তাই হয়, ঠিক তখনই প্রথম দেখি পূর্ণেন্দু পত্রীকে, তিনিও ছবি দেখে বেরোচ্ছেন। কিঞ্চিৎ বেসামাল অবস্থায় ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন খুব লম্বা রোগা আরেকজন, হয়তো বা ঋত্বিক ঘটক, আবার নাও হতে পারেন।

সেদিন মনে হয়েছিলো পূর্ণেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে' গানটির অসাধারণ প্রয়োগ সম্বন্ধে, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি, কী ভাবে আমার প্রশ্নটিকে নেবেন, অযাচিত আলাপ করার ব্যাপারটিকে কী ভাবে নেবেন, এই ভেবে প্রশ্নটি আর করা হয়নি। সেদিনের সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নটি করার সুযোগ পেলাম, খুব আন্তরিক পরিবেশে পেলাম গতবছর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায়, যার উদ্যোক্তা ছিল সমবেতমন, উলুবেড়িয়া শহরের অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, যার সদস্য আমি নিজেও।

গতবছর, বাংলা ১লা বৈশাখ, উলুবেড়িয়া কলেজে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে কবিতা পাঠের আয়োজন করেছিল সমবেতমন। আমার হাতে গোনা বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ রূপেন বসুমল্লিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই স্মরণ সভায় এসেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যার মুখে এলেন, এবং মুহূর্তের মধ্যে আমাদের খুব আপনজন হয়ে পড়লেন। এত বড় মাপের একজন মানুষ, যার প্রতিভা নানাদিকে প্রসারিত, আমরা চমকিত হয়েছিলাম এই দেখে

যে পূর্ণেন্দুবাবু একবারের জন্যও মঞ্চে উঠলেন না, সারাক্ষণ দর্শকাসনে বসে, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আমাদের মতো শিক্ষানবীশ কবিতা লেখকদের কবিতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তিনি নিজেও দুটি অসাধারণ কবিতা পাঠ করেছিলেন, এবং একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলাম, বিস্মিত হয়েছিলাম কত সহজে তিনি অন্তরঙ্গভাবে আমাদের সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি যে পূর্ণেন্দু পত্রী, এই ব্যাপারটা তিনি একবারের জন্যও হল ভর্তি দর্শকদের বুঝতে দেননি। তাঁর এই সহজ সরলতা এবং আড়ম্বরহীনতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সত্যিকারের বড়মাপের মানুষের চরিত্র বোধহয় এরকমই হয়।

স্মরণসন্ধ্যার অনুষ্ঠানের পর সত্তরের দশকে যে প্রশ্নটি করতে পারিনি, সেই প্রশ্নটি করেছিলাম। তিনি এক মুহূর্ত না ভেবে বলেছিলেন—"সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সংগীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি, ঋত্বিকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' তে 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে' গানটির এরকম অব্যর্থ প্রয়োগ আমি কোন ভারতীয় ছবিতে দেখিনি।" তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পাবে, কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল এ কারণে যে বহুদিন ধরে আমার মনে লালিত ভাবনার অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলাম সেদিন পূর্ণেন্দু পত্রীর মন্তব্যে।

এরপর উলুবেড়িয়াতে তিনি আরো দুয়েকবার এসেছেন। 'রং ও রেখার' অনুষ্ঠানে এসেছেন। তাঁর মত মানুষের সবটুকু স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতে পারা যায়নি, কিন্তু হাসিমুখে সবকিছু মেনে নিয়েছেন। কানোরিয়া মিলের শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে আজকাল পত্রিকার তরফে প্রতিবেদন লেখার মালমশলা জোগাড় করতে এসে হঠাৎই, প্রায় বিনা নোটিশে সমবেতমন-এর সম্পাদক ডাঃ রূপেন বসু মল্লিকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গেছেন, এবং সমবেতমন সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছেন। এই যে একবার পরিচিত হলে পরিচিত মানুষদের না ভোলা, তাদের সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া, পূর্ণেন্দু বাবুর এটি একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মারা যাবার পর তাঁর স্মরণ সভায়, যে স্মরণসভার আয়োজন করেছিল সমবেতমন, সেখানে কয়েকজন বয়স্ক, পুরনো আমলের মানুষ এসেছিলেন যাঁদের স্মৃতিচারণে প্রকাশ পেয়েছিলো 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা, হাওড়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহের কথা, পুরনো দিনের বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে বাসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কাঁধে হাত রেখে কুশল বিনিময় করার ইতিহাস। উলুবেড়িয়ায় যতবার এসেছেন, প্রতিবারই পুরনো দিনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথীদের খোঁজ করেছেন, তাদের খবর নিয়েছেন। এরকমই একজন মানুষ ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সম্ভবত ষাটের দশকে উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট হলে কতিপয় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের মানুষ আয়োজন করেছিলেন একটি প্রদর্শনীর, এবং পূর্ণেন্দু পত্রী সেবার কলকাতা থেকে এসে কোন্ কোন্ ছবি কোথায় টাঙানো হবে তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে পূর্ণেন্দু পত্রী হয়তো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন কোন এক সময়, কারণ তাঁর চেয়েও অনেক বড় মাপের পরিচালক ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে ছিলেন, এবং এখনো আছেন। স্বপ্ন নিয়ে, ছেঁড়া তমসুক, স্ত্রীর পত্র—এই তিনটি ছবির মধ্যে স্ত্রীর পত্র ছবিটি কিছুটা উল্লেখযোগ্য, যদিও সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ছবিটির প্রভাব স্ত্রীর পত্রে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রকট। পূর্ণেন্দু পত্রী বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন একজন উঁচু দরের চিত্রশিল্পী, প্রচ্ছদ-শিল্পী হিসেবে, একজন ভাল কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে।

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার হয়ে তিনি হাওড়া জেলার গ্রামের যে সব খবর প্রকাশ করতেন, তার মধ্যে একটা ভাল অংশ জুড়ে ছিল উলুবেড়িয়ার খবরাখবর। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ তখন উলুবেড়িয়া এবং আশেপাশে তাঁর বই-এর জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, একাজে বিনয় ঘোষের সাথী ছিলেন সে সময়ের কয়েকজন কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি এবং অবশ্যই পূর্ণেন্দু পত্রী। কমিউনিস্ট আদর্শটুকু পূর্ণেন্দুবাবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

আমার দেখা শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী

করুণা সেন

তুলিতে, কালিতে নতুন আঙ্গিকের স্রষ্টা পূর্ণেন্দু পত্রী। তাঁর সারা জীবন ব্যাপী যে অবিস্মরণীয় নিষ্ঠা তার থেকে জন্ম নিয়েছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির এক একটি রঙের অসাধারণ কোলাজ। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। আছে অনন্য সাধারণ চিন্তাভাবনার ফসল। রং তার প্রকৃতিকে চিনেছে আঁচড়ের বিন্যাসে। তিনি অজস্র পুস্তকের প্রচ্ছদ কর্মটি এমন নিখুঁত ভাবে রংঙের ও রেখার টানে বিম্বিত করেছেন যা দর্শককে ভাবায়। শিল্পীর তুলি অনবদ্য সৃষ্টির বিন্দুতে এসে যে জ্যামিতিক সমাধানের বৃত্ত রচনা করেছে তাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে পাখির ডানা, ফুলের পাপড়ি, বৃন্তে, বৃক্ষের কাণ্ডে। এক অসাধারণ মাত্রা যোগ ক'রে পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর symbol কে অ্যাবসার্ডিটি থেকে তুলে এনেছেন বাস্তবের রং, শৈলীর কারুকার্যে। তাঁর কুশলতা রেখার আঁচড়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত নতুন মাত্রা যোগে।

হাজার হাজার পত্র পত্রিকার গেট-আপে যে প্রচ্ছদ শৈলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে —পূর্ণেন্দু পত্রী সে গুলিতে যে সব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার মধ্যে মর্ডান আর্ট কথা কয়ে উঠেছে নিজস্ব স্বতন্ত্রতায়। রং তুলি কালির ব্যবহার বিদেশী কোন শিল্পীর চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়, বরঞ্চ তাতে এক ধরণের বিমূর্তভাব নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। কোথায় কতটা রং, কোথায় কতটা ইম্প্রেশন দিলে ছবিটা মানুষের দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে উঠবে তার নৈসর্গিক ব্যঞ্জনার বিচ্ছুরণ ক্যানভাসের ওপর ঘটাতে পারতেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সেকেলে ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে আজকের পৃথিবীতে রঙের যাদু দণ্ডটির আশ্চর্য ব্যবহারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। তাই তাঁর সৃষ্ট গেট আপ গুলিতে আমরা পেয়েছি রঙের যাদুর খেলা। তাঁর গবেষণাগারে শিল্পী ও জীবনের মাঝে এক অসাধারণ সাধনার যজ্ঞাগারটি তুলিতে, কালিতে, রঙে, ক্যানভাসে, মনে ও মননে অন্য যুগ চেতনার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন শিল্পী কবি। শিল্পী লেখক। হাজার মানুষের ভিড়ে তাঁর তুলি কালি যে ছাপ মানুষের হৃদয়ে রেখে গেলেন তার তুলনা নেই। ইংরেজ, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের শিল্পীদের চিত্রকলা থেকে তিনি নতুন আঙ্গিকের কলাকৌশল রপ্ত ক'রে ছিলেন নিজস্ব ভারতীয় ভঙ্গিমায়। দেশী বিদেশী জল রং, তেল রং, প্রিন্ট্‌কাট, ফটোটাইপিং ইত্যাদি থেকে অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের শিল্পকলাকে কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন সেই চরম সত্যটিকে জেনে ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। অবনীন্দ্রনাথ রামকিঙ্কর বেজ, যামিনী রায়,

নন্দলাল—তাঁদের অনুভবের আয়না থেকে শিল্পী পূর্ণেন্দু এক স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়ে গেলেন তাঁর শিল্পকর্মে। সোমনাথ হোড় এই রকম এক জন আশ্চর্য শিল্পী ছিলেন। তাঁর কাছেও পূর্ণেন্দু পেয়েছেন অনেক। তিনি জেনেছেন তাঁর শিল্পী জীবনের আদিগন্ত। পূর্ণেন্দুর শিল্পে নান্দনিক উত্তরণ ঘটেছে শুধু তাঁর অবিরত চর্চার ফলে। এটাই আমাদের মত শিল্পরসিকরা মনে করেন। শিল্পকে শুধু শিল্পের জন্যেই নয়। শিল্প হচ্ছে মানুষের জন্যে এই সচেতনতাই পূর্ণেন্দুকে ঠেলে নিয়ে গেছে মানবতার দুয়ারে। সেই মানুষের প্রতি গভীর আর্তিতেই ছবি রচনা করেছেন পূর্ণেন্দু। সে রস গ্রহণ যারা করেছেন তাঁরা তাঁর শিল্পকর্মকে কোন দিন ভুলবেন না। ভ্যানগগের মতো পূর্ণেন্দুরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর শিল্পকলা-কৌশলের মধ্যে ফুটে উঠেছে। অন্বেষণের নেশা তার সৃষ্টির মধ্যে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে রঙে, রেখায়, আঁচড়ে, চিন্তায়, ভাবনায়। যে রস তিনি নিংড়ে কবি হৃদয়ের স্বপ্নে, রঙে, রেখায়, কল্পনায়, সত্যে ব্যঞ্জিত ক'রে তুলেছেন, একটি শিল্পীর জীবনে তাকে লক্ষ্য করেছেন এই শতাব্দীর শিল্পরসিক মানুষ।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে পূর্ণেন্দুর চিত্রকল্পতার মধ্যে। আমরা চিত্রভানু মজুমদারের, সোমনাথ হোড়ের খুব উঁচু ধরনের চিত্র প্রদর্শনী কলকাতায় দেখেছি। কয়েক মুহূর্ত আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। যিনি তার শিল্পে জীবনে জীবন যোগ করেছেন তুলিতে কালিতে রংঙের আলপনায়। তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করি—

চাঁদমালা

দোলনায় শুয়ে আছে
তুলোর মতো চাঁদ
মুখে হাসি খিল্ খিল্
দুষ্টু চোখে স্বপ্ন মমতা

সেই বুড়ি গাছ
তার তলে গাই—বাছুর
কদম ফুলের চাঁদ মালা
চরকায় সুতো কাটছে
জ্যোৎস্নায় জরি

ছট্‌ফটে পাহাড়ে নদী
আছড়ে পড়ে সবুজ পাথরে
দাঁড়ের ময়না তুই বুকের ভিতরে

কোন নাগরদোলায় লেগেছে চড়ক

বাজনা বাজে গাজনের আগুন সন্ন্যাসী
ডিগবাজি দেয় হাওয়া উথাল পাথাল

মহাকালের ঘোড়া চড়ে হাত নাড়ে
সমুদ্রে পালকি ভাসা দিন
জোয়ারে স্মৃতির নৌকা টান্ টান্
বুকের মেরুতে উড়ে যায় উদ্ধত কাইট
তোর জন্তে জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
এই স্বদেশ ঘর—গেরস্থালি
থৈ থৈ অভাবে ডুবে হাত নাড়ে
পা নাড়ে বিদ্যুতের ঝুঁটি ধরে মেঘের দেয়াল

জীবন দুঃখের পাখি ভাঙ্গাভাঙ্গা
উদাস দুপুর, হাততালি দেয় এসে হাওয়া
দোল্‌নায় চাঁদমালা কুলকুচু ফুলবাতি
জ্বলে নেভে আকাশের তারা হয়ে রাতে

আমার শরীরে তুই ফুলের পরাগ মেখে
উত্তাল ছট্‌ফটে পাহাড়ের নদী
কাজললতা হাতে একটি মিষ্টি মুখ দোলে
তুই চাঁদা মালা যদি আমি তোর দোলনা

তোকে বুকে ধরে রাখি ঘন নীল মেঘে
তুই আমার স্বপ্নের ফুল যৌবনের হাসি
তুই আমার শিল্পীর তুলি কালি ক্যানভাস
তোকে নিয়ে মুগ্ধমতী হয়েছি পৃথিবীতে।

কবি পূর্ণেন্দু পত্রী : এক স্বপ্নমুগ্ধের প্রতিবেদন

রফিকুল হক

১৯৮৩-'৮৪ সাল। আমি তখন এগার বারো ক্লাসের ছাত্র। খবরের কাগজে তখনো গুরুত্ব দিতে শিখিনি। কিন্তু রবিবারের 'যুগান্তর সাময়িকী' আমার বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রতি সপ্তাহে এক কাগজপড়ুয়ার কাছে সংগ্রহ করি, আর তাতে প্রকাশিত কবিতাগুলো পড়ি। ১৫ জানুয়ারি '৮৪-র সাময়িকীতে পেয়ে গেলাম এক মনকাড়া কবিতা—কবি—পূর্ণেন্দু পত্রীর 'আমারই তো অক্ষমতা' , যার বিশেষ কয়েকটি লাইন আমি এখনো যেখানে সেখানে ব'লে বেড়াই : 'পরাধীনতার চেয়ে বেশি বেদনার ভার হয়ে উঠেছে এখন / নানাবিধ স্বাধীন শিকল।' অথবা, 'সমুদ্র আড়াল করে সার্কাসের তাঁবু / আর্কিউসের বাঁশি / দিকপাল ক্লাউনেরা পা দিয়ে বাজায়।' এই স্মরণীয় কবিতা সম্পর্কে এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চাই, তা হ'ল, নিজের প্রায় সমস্ত লেখাই আমি মুখস্থ বলতে পারি ; কিন্তু অন্যের লেখা আমার একমাত্র মুখস্থ কবিতা পূর্ণেন্দু পত্রীর এই 'আমারই তো অক্ষমতা'। শুধু তা-ই নয়, আমার কাছে আধুনিক গদ্য কবিতাবোধের প্রথম পাঠ এই কবিতাটি। সুতরাং এদিক থেকেও পূর্ণেন্দু পত্রী আমার অন্যতম প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় কবি।

এরপর ১৯৮৫-তে সম্ভবত 'আবৃত্তি কোষ'-এ পড়ি তাঁর 'সোনার মেডেল' নামে বিখ্যাত লোকজীবনকেন্দ্রিক কবিতা। বিখ্যাত বিষয়ে ও আঙ্গিকে- দু'দিক থেকেই। যার কিছু অংশ—

> বাবুমশাইরা
> গাঁ-গেরাম থেকে ধুলোমাটি ঘস্‌টে ঘস্‌টে
> আপনাদের কাছে এয়েছি।...
> লোকে বলেছিল, ভানুমতীর খেল দেখালে
> আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
> নিজের করাতে নিজেকে দুখান্‌ করে
> আবার জুড়ে দেখালুম,...
> সোনার ম্যাডেল দিবেন নি ?

মাত্র বছর খানেক আগে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বই হাতে এলো। পড়লাম। বেশ কিছু কবিতা পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। বারবার পড়বার মত, অন্যকে পড়াবার মত সব কবিতা—সিঁড়ি, দিও, এখনো, মানুষের কেউ কেউ, উৎকৃষ্ট মানুষ, অনেক বছর পরে, হে সময় অশ্বারোহী হও, অথচ, বসন্তকালেই, আত্মচরিত, আগুনের কাছে আগে, তুমি এলে, শৈশবও তুমি প্রভৃতি একেকটি আশ্চর্য সুন্দর

কবিতা। মুগ্ধ হ'য়ে বারবার পড়েছি। এখনো পড়ছি। কিন্তু এই মনোমুগ্ধকারী কবিতাগুলিকে ছাপিয়ে যে-কবিতাটি আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে, আমার মধ্যে অপূর্ব এক অনুভূতি জাগিয়েছে—সেটি হ'ল তাঁর 'তাজমহল ১৯৭৫'।

'শাজাহান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতীতকে পুরোপুরি অতীতে রেখে একান্তই মৃত শাজাহানের সঙ্গে কথা বলেছেন—'একথা জানিতে তুমি, ভারতঈশ্বর শাজাহান কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধনমান।' এখানে তেমন গুরুতর কোন কল্পনাই নেই। কিন্তু, কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিমাত্রই যে মৃত নয়, কবিরা অশেষ কল্পনাশক্তির দ্বারা যে সে-দেহেও প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখি নজরুলের একটি গানে—'সমাধিতে মোর ফুল ছড়াতে কে গো এলে?' লক্ষ্য করুন, কবির কল্পনাশক্তি কিভাবে পাতাল ভেদ করেছে। কোনো মৃত ব্যক্তি, আসলে সমাধিস্থ কবি-আত্মা কবরের ভেতর থেকে অনুভব করছে, তার সমাধিতে কে যেন ফুল ছড়াতে এসেছে। এই 'কে'-টি নিশ্চয়ই সে, যে তার সমাধিতে ফুল ছড়াতে পারে বা ফুল ছড়াবার যোগ্য। কিন্তু, সেই মৃত বা কবিআত্মা যেহেতু কবরের ভেতর সমাধিস্থ, সেহেতু সে তাকে অর্থাৎ ফুল ছড়াতে আসা ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষত দেখতে পাচ্ছে না; অনুভব করছে মাত্র। তাই প্রশ্ন—'ফুল ছড়াতে কে গো এলে?' ভাবা যায়, কোনো মৃতব্যক্তি কবরের ভেতর থেকে অনুভব করছে, গান গাইছে বা কথা বলছে? সাধারণভাবে, এ-কল্পনা যেন কল্পনারও অতীত। কিন্তু, এই না হ'লে আবার কবিকল্পনা! কারণ কল্পনার আসল ধনী তো কবিরাই।

এ-কালে সদ্য প্রয়াত কবি পূর্ণেন্দু পত্রী 'তাজমহল' কবিতায় তাঁর অকৃপণ কল্পনাশক্তিকে অনেকটা এরকমই একটি চমৎকারিত্বে নিয়ে গেছেন। ফলে, কবিতাটি হ'য়ে উঠেছে এ-যুগের একটি শ্রেষ্ঠতর ঐতিহাসিক প্রেমের কবিতা। পৃথিবীর আশ্চর্যতম স্মৃতিসৌধ তাজমহলের মধ্যে পাথর নির্মিত পাশাপাশি দুটি কবরে শায়িত সম্রাট শাজাহান ও তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ (আজ এত যুগ পরে, কবরে যাঁদের হয়তো শুধু চুল ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই)-এর চির-স্মরণীয় দাম্পত্যপ্রেমকে বিষয় করে কবি যেন সরাসরি নিদ্রামগ্ন সম্রাটকে জাগিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ১৯৭৫ সালে! অর্থাৎ সম্রাটের মৃত্যুর তিন শতাধিক বছর পরে,—

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
বহুদিন মণিমুক্তো, মহফিল, তাজা ঘোড়া, তরুণ গোলাপ
এবং স্থাপত্য নিয়ে ভাঙাগড়া সব ভুলে আছো।
সর্বান্তঃকরণ প্রেম, যা তোমার সর্বোচ্চ মুকুট, তাও ভুলে গেছো নাকি?

চিন্তা করুন, মৃতের আবার ভুলে থাকা আর মনে রাখা; একভাবে শুয়ে থাকা আর পাশফেরা! বাস্তবে যাঁর কোন অস্তিত্বই নেই, এবং অসম্ভব কল্পনামাত্র।

কিন্তু, রোম্যান্টিক কবিকল্পনায় এর মূল্য অপরিসীম। লক্ষ্যণীয়, তিন শতাধিক বছর আগেকার মৃত মানবের মধ্যে কবি কীভাবে প্রাণ ও সক্রিয়তা আরোপ করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন, এবং কত কাব্যময় সে আলাপের ভাষা—

পাথরের ঢাকনা খুলে কখনো কি পাশে এসে মমতাজ বসে কোনোদিন?
সুগন্ধী স্নানের সব পুরাতন স্মৃতিকথা বলাবলি হয় কি দুজনে?…
হারানো উদ্যানে গাঢ় মেলামেশা মনে পড়ে গেলে
দুজনে কি কোনোদিন বেরিয়েছ নিমগ্ন ভ্রমণে
আকাশ ও ধরণীর চুম্বনের মতো কোনো স্থানে?

কী আকুল জিজ্ঞাসা! আর, প্রেমের সৌন্দর্যবোধে কী বিশাল ধনী হ'লে এ-জিজ্ঞাসা এমন মার্জিত ও আন্তরিক হ'তে পারে। কবি স্নানের কথা বললেন; অথচ সেই স্নানকে শরীরসর্বস্ব না ক'রে সুগন্ধীযুক্ত করলেন। গাঢ় মেলামেশার কথা বললেন; অথচ হারানো উদ্যানের পটভূমি ও বিশেষণে বিষয়টিকে উদাস এবং বেদনাবিধুর করে তুললেন। চুম্বনের কথা বললেন; অথচ মানব-মানবীর প্রসঙ্গ এনে চুম্বন-বিষয়টিকে হালকা করার সুযোগটুকু দিলেন না। বরং, আকাশ ও ধরণীর উপমা টেনে একটা চিরন্তন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এনে দিলেন।

সম্রাট শাজাহান তথা তাঁর জগদ্বিখ্যাত পত্নীপ্রেমের প্রতি কী গভীর আস্থা ও মমতা থাকলে, এ-কবিতা লেখা যায়—হৃদয়সংবেদী পাঠকমাত্রই তা অনুভব করবেন। শাজাহান যে বহুকাল আগে, কবির জন্মেরও বহু আগে মারা গেছেন—এ-কথা যেন কবির অনুভূতি ও বিশ্বাসের বাইরে, তাঁর সময়জ্ঞান বা ইতিহাস-চেতনার বাইরে; এমন কি শাজাহানের মৃত্যু যেন কবির জীবনের অভিধানেই নেই। তাঁর মতে, দুর্ধর্ষ পুত্র আওরঙ্গজেবের ভয়ে তথা ভ্রান্তিতে চোখ-মুখ-নিশ্বাস প্রভৃতি বন্ধ ক'রে নিতান্তই আড়ষ্ট হ'য়ে শাজাহান পাথরের ঢাকনা-দেয়া ঘরে মমতাজের পাশে শব্দহীন গভীর ঘুমে শুয়ে আছেন। তাই বলছেন—

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
দেওয়ান-ই-খাসের ধুলো ভারতের যতটুকু সাম্প্রতিক ইতিহাস জানে
তুমি তার সামান্য জান না, আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে।

সম্রাটের এই অহেতুক ভয় বা ভ্রান্তি দূর করতে কবি একটি গুরুতর সংবাদ দিচ্ছেন শাজাহানকে—যে সংবাদ সত্যি-সত্যিই এতকাল তাঁর শোনা হয়নি, কারো কাছে পাওয়া হয়নি—

আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে
এবং সে নিজে, কেউ বলেনি তোমাকে?

না, কেউ বলেননি। সম্রাট শাজাহানের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ সম্রাটের কাছে সত্যিই পূর্ণেন্দু পত্রী ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারেননি। এ-সংবাদ দেওয়া অত সহজও নয়। কারণ পুত্রস্নেহে অন্ধ শাজাহানের কাছে পুত্রের

মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করাটা রীতিমতো দুঃসাহসই বটে। এখানে কবির এই দুঃসাহসী সংবাদ-পরিবেশনের সতর্কতাটিও লক্ষণীয়। সম্রাটকে তিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সরাসরি নয়; একটু ঘুরিয়ে, মানবিক ভঙ্গিতে। এ কবিতার আবৃত্তিকার-পাঠকেরা নিশ্চয়ই অনুমান করবেন, 'আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে'—এ-কথা কবি যতটা জোরের সঙ্গে জানাচ্ছেন, ঠিক ততটাই মৃদুস্বরে বলছেন—'এবং সে নিজে'। অর্থাৎ, আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে 'মারা গেছে' বা এ-জাতীয় কোনো শব্দ কবি ব্যবহার করলেন না।

পূর্ণেন্দু পত্রীর দুঃসাহস এখানে আরো একদিক থেকে: পূর্ববর্তী মৃত শাজাহানকে কবি দিচ্ছেন পরবর্তী মৃত আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ। এটি নিঃসন্দেহে একটি কাব্যিক দুঃসাহস। আর এই সাহসিকতার জন্যেই কবি তাঁর ভাবনাকে কল্পনার চূড়ান্তে নিয়ে যেতে পেরেছেন। উল্লেখ করা দরকার, উক্ত সাহস কবি দেখাতে পেরেছেন এ-জন্যেই যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যু কবির কাছে কাম্য, কিন্তু শাজাহানের মৃত্যু নয়। সুতরাং, অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষোভ এবং দুর্বিনীতের অবসানকে সমর্থন ক'রে কবির স্বস্তিবোধটিও বিশেষ লক্ষ্যণীয়—

সবচেয়ে দুর্ধর্ষতম বীরত্বেরও ঘাড়ে একদিন মৃত্যুর থাপ্পড় পড়ে
সবচেয়ে রক্তপায়ী তলোয়ারও ভাঙে মরচে লেগে
এই সত্যকথাটুকু কোনো মেঘ, কোনো বৃষ্টি, কোনো নীল নক্ষত্রের আলো
তোমাকে বলেনি বুঝি? তাই আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে,
শব্দহীন গাঢ় ঘুমে, প্রিয়তমা পাশে শুয়ে, ভুলে গেছে সেও সঙ্গীহীন
তারও চোখে নিদ্রা নেই, সে এখনো মর্মান্তিক জানে
তুমি বন্দী, পুত্রের শিকলে।

আমরা জানি, সম্রাট শাজাহানের জীবদ্দশাতেই মমতাজ মারা যান। এবং তিনি দেখে গেছেন, তাঁর ধুরন্ধর পুত্র আওরঙ্গজেবের চালাকির দরুণ তাঁর সম্রাট স্বামী আগ্রার দুর্গে কার্যত বন্দী; আর আওরঙ্গজেব দিল্লির মসনদ দখল ক'রে দেশ শাসনে মত্ত। সুতরাং, তাঁর শান্তি কোথায়—যিনি দেখেছেন, পুত্রের দ্বারা স্বামী বন্দী? এবং এ-দেখাই যখন তাঁর সর্বশেষ দেখা!

শাজাহানের সঙ্গে আলাপরত কবি তাঁকে মমতাজের বেদনা ও অশান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার বলছেন—

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে, মারা যেতে হয়।

অর্থাৎ এটাই নিয়ম। কারণ মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং শাজাহানের প্রতি কবির নিবিড় আশ্বাস—

এখন নিশ্বাস নিতে পারো তুমি, নির্বিঘ্ন প্রহর
পরস্পর কথা বলো, স্পর্শ করো, ডাকো, প্রিয়তমা!

যেন, জীবিত মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছেন, একজন উদ্ধত ক্ষমতালিপ্সু আওরঙ্গজেবের ভয়ে; অন্যজন স্বামীর দুর্ভাগ্যজনক বন্দীদশার চিন্তায় উদ্বিগ্ন চিত্তে। কিন্তু, কবির কাছে সম্রাটের এই ভয় নিতান্তই একটা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ যার ভয়ে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত, সেই ভয়ঙ্কর আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যে মারা গেছেন। এমন-কি তাঁর দুর্ধর্ষ ঘোড়াটিও। সুতরাং সম্রাটের কাছে কবির পুনরুজ্জীবনের আকুতি, পতি-পত্নীর কাছে পুনরায় জীবন শুরুর আবেদন। এবং শাজাহান-মমতাজের এই নির্বিঘ্ন জীবনভূমি যেন কবি নিজেই তৈরী ক'রে দিয়েছেন—আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে।

দুনিয়া জুড়ে বধূহত্যা, বধূ-নির্যাতন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কী তীব্র জীবন-বাসনা, পত্নীপ্রেম তথা দাম্পত্য জীবনের প্রতি কী গভীর বিশ্বাস কবির ছিল—এ কবিতাতেই চূড়ান্ত তার প্রকাশ। সবশেষে কবি বলছেন—

সর্বান্তঃকরণ প্রেম সমস্ত ধ্বংসের পরও পৃথিবীতে ঠিক রয়ে যায়।
ঠিক মতো গাঁথা হলে ভালোবাসা স্থির শিল্পকলা।

এতক্ষণে কবি যেন শান্ত, প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। এতক্ষণে কবি স্বীকার করছেন, ভারতসম্রাট শাজাহান চ'লে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রেমময় অন্তঃকরণের বিনাশ নেই। এবং এটিই কবির অভিপ্রেত। তাই তাজমহল-কে লক্ষ্য ক'রে ভালোবাসার প্রতি আস্থাশীল কবির মরমী অঙ্গুলিনির্দেশ—যেখানে প্রেমের মজবুত গাঁথুনিকে বিশেষত্ব দান ক'রে এর শিল্পসুষমামণ্ডিত দীর্ঘ অক্ষয়তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, পাঠককেও মুগ্ধ করেছেন।

প্রেমিক শাজাহান পত্নীকে ভালোবেসে বিপুল অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে আগ্রার 'তাজমহল' গড়েছিলেন; আর কবি পূর্ণেন্দু পত্রী সেই পত্নী প্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে 'তাজমহল ১৯৭৫' গড়েছেন। শাজাহানের তাজমহল স্থির শিল্পকলার নিদর্শন, আর পূর্ণেন্দু পত্রীর তাজমহল চিরস্থায়ী শিল্পকলার অঙ্গ। তা ছাড়া কবির তাজমহলের কারিগর কবি নিজেই, এবং কী দারুণ তার গাঁথুনি, কবিতাটি না পড়লে তা বোঝা কঠিন। অর্থাৎ, 'ঠিক মতো গাঁথা হলে' কবিতাও তাজমহল হয়।

সাহিত্য, সিনেমা, চিত্রশিল্প, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি বহু সফল গুণে গুণান্বিত কবি পূর্ণেন্দু পত্রী অবশ্য এমন নয় যে, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারাকে বদলে দিয়েছেন। তবে একটি আন্তরিক দিগন্তকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন অবশ্যই; এবং তা উচ্চতর কল্পনার দিগন্ত। কোন বাস্তব সত্যকে ভিত্তি ক'রে বাংলা কবিতায় তাঁর সমকালে এত গভীর বিস্তারিত স্বপ্ন খুব কম কবিই দেখেছেন—যে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন বা কল্পনাই নয়, কান্না এবং হাহাকারও, স্বপ্ন ও বাস্তবের অনিবার্য তথা জীবন্ত সমন্বয়ও। বোধহয় একটিমাত্র উদাহরণেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকাপ্লুত কবি লিখেছিলেন

'তোকে আমরা কী দিইনি, শক্তি ?'—এর কয়েকটি পংক্তিই উক্ত উদাহরণের জন্যে যথেষ্ট :

> যথেচ্ছাচারের সুখে মাতাল হাতির মতো ঘুরবি বলে
> তুলে দিয়েছি জলদাপাড়ার জঙ্গল।
> দেদার ঘুমের জন্যে গোটা জলপাইগুড়ি জেলাটাকেই
> বানিয়ে দিয়েছি তোর মাথার বালিশ।…
> শুধু তোর জন্যেই হাওড়া স্টেশনে জিরোতে দিইনি
> দূরপাল্লার কোনো ট্রেনকে।
> স্টিমারে স্টিমারে ভেঁা বাজিয়ে জাহাজ, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিনদের
> বলেছি. সরে যাও, শক্তি এখন সাঁতার কাটবে সমুদ্রে।…
> তোকে আমরা কী দিইনি, শক্তি ?…

একজন অগ্রগণ্য কবির কাছে আরেকজন কবির বিশালত্ব বোঝাতে এর চেয়ে দরদী ও দিগন্তবিস্তারী স্বপ্নময় কথা আর কীই বা হ'তে পারে—যেখানে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মাথার বালিশ হিসেবে কল্পিত হয় ? সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে যে-বিদীর্ণবক্ষ কবি নিজেকে অনাথ ভেবে এ-কথা বলেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের অনাথ ক'রে গেলেন।

চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দু পত্রী

সোমেন ঘোষ

কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ছবি আঁকিয়ে, সমালোচক, সর্বোপরি চলচ্চিত্রকার—এই রকম বহু শিল্পসত্তার অধিকারী একজন মানুষ যখন নিজের মনন ও বোধকে তাঁর শিল্পের শরীরে মেলে ধরেন তখন সেই শিল্প নির্মিতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। প্রয়াত পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন এই রকম বহুমুখী প্রতিভার এক স্বতন্ত্র শিল্পী। যৌবনের উন্মাদনার দিনগুলি থেকেই লেখা ও আঁকায় তাঁর নিত্য সময় কেটেছিল। আরো কিছু পরে, কর্মজীবনের সূত্রপাতে সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের জগতে নিজের বিশিষ্টতায় আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণীর সংবাদ পত্রের আর্ট ডিরেক্টরের পদে বৃত থাকার আগেই বিজ্ঞাপনের ইলাস্ট্রেশন, বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যকর্মের অলংকরণ, নানা গ্রন্থের প্রচ্ছদ নির্মাণ ইত্যাদির পাশাপাশি স্বকীয় সাহিত্য রচনার গুণে বাঙালী রসিক সমাজে পূর্ণেন্দু পত্রীর একটা নিজস্ব আসন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তাঁর আগমন আর একভাবে তাঁকে আমাদের কাছে পরিচিত করেছিল। মনে রাখা দরকার যে, চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। শিল্পের অন্যান্য শাখার মত চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর নিবিড় মমত্ব গড়ে উঠেছিল যৌবনের প্রথম দিনগুলি থেকেই। ১৯৫৫-য় তৈরী সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' ছবির বিশ্ববিজয়ের পর কলকাতায় প্রদত্ত সত্যজিতের প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন তিনি। কলকাতার আদি ফিল্ম সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।

যদিও তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রকর্ম আমাদের প্রেমসংরাগে উজ্জীবিত হয়নি, তবু চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর শিল্প নিরিখটাকে চিনতে আমাদের ভুল হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রর অনবদ্য গল্প 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অবলম্বনে পূর্ণেন্দুর প্রথম ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে' তৈরী হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ছবিটি শিল্পসফল হয়নি। কিন্তু ছবিটির নির্মাণ পরিকল্পনায় পূর্ণেন্দুর চলচ্চিত্রবোধ, সূক্ষ্মতা, কাহিনী বিন্যাসের সিনেম্যাটিক প্রকরণে তাঁর ভিন্নধর্মী মানসিকতা সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবির দোর্দণ্ডপ্রতাপের সেই সময়পর্বে পূর্ণেন্দুর বিষয় নির্বাচনের দুঃসাহসিকতা এবং চলচ্চিত্রের পর্দায় তাকে মূর্ত করে তোলার বাসনায় তাঁর অনমনীয় শিল্পপ্রয়াস আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। অনেক দুর্বলতার মধ্যেও ছবিটির বিন্যাস ভঙ্গিতে সিনেম্যাটিক দক্ষতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

ছবির ফ্রেমিং, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রয়োগবিধিতে 'স্বপ্ন নিয়ে' ভিন্ন মাত্রা নিয়ে বিরাজ করছে।

পরের ছবিতেই পূর্ণেন্দু নিজের চলচ্চিত্রিক দুর্বলতাকে ঢেকে ফেলেছিলেন। ১৯৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথের চিরজীবী গল্প নিয়ে তৈরী করেছিলেন 'স্ত্রীর পত্র'। বাঙালী দর্শক সমাজ এ ছবিকে অন্তরঙ্গ মমতায় গ্রহণ করেছিল। প্রথাসিদ্ধ বাংলা সিনেমার ঔদ্ধত্যের স্রোতে পূর্ণেন্দু এমন একটি কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রত্যয়ের সঙ্গে। পরিশীলিত ভঙ্গিতে বিন্যস্ত এ ছবির সিনেম্যাটিক কাঠামোয় পূর্ণেন্দু চলচ্চিত্র মাধ্যমের সুচিন্তিত প্রয়োগের পাশাপাশি নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়াস করেছিলেন। মূল কাহিনীর কাঠামোয় যে সময়ের ইঙ্গিত আছে, সেই কালটিকে ধরার জন্য তিনি যত্নবান শিল্পীর মত স্থান কাল-পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে একটা প্রার্থিত পরিমণ্ডল রচনায় অনেকটাই সার্থক হয়েছিলেন। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য ক্যামেরা ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতের সহযোগকে মূলধন করে পূর্ণেন্দু এ ছবির কাহিনীবিন্যাসে চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্প স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। গল্পের কেন্দ্র চরিত্র মৃণালের দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটিকে না সাজিয়ে পরিচালক পূর্ণেন্দু নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীবিন্যাস করেছেন। এ ছবিতে প্রযুক্ত পূর্ণেন্দুর কিছুকিছু টেকনিক, চিত্রকল্প, প্রতীক রচনার ঝোঁক নিয়ে নানা লেখায় বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এক প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রীর পত্র ছবির নির্মাণভঙ্গি প্রসঙ্গে একবার পূর্ণেন্দু বলেছিলেন: "আমি Strict cinema-য় বিশ্বাসী পরিচালক নই। লক্ষ্য করে দেখবেন, ক্লাসিক আদল থাকলেও, তাকে বারবার ভাঙ্গা হয়েছে, নানা জায়গায়।" আসলে এই ছবি করার সময় পূর্ণেন্দু প্রথাসিদ্ধ বিন্যাস রীতির অনুশাসন মানেননি। তাঁর কাছে চলচ্চিত্রের শিল্প স্বাধীনতার অসীম সম্ভাবনাই বিচার্য বিষয় ছিল। তাই মূল কাহিনীর কাঠোমোয় বিধৃত রবীন্দ্রভাবনার মূল রসটিকে তিনি নিজস্ব ভাবনা চিন্তায় চলচ্চিত্রের পর্দায় মেলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ছবিতে চরিত্র চিত্রণের কিছু দুর্বলতা ও কাহিনী গ্রন্থনের কিছু শিথিলতা সত্ত্বেও এ ছবিতে পূর্ণেন্দু শিল্পিত মনের পরিচয় রেখেছিলেন।

তাঁর তৃতীয় কাহিনীচিত্র 'ছেঁড়া তমসুক' করার সময় পূর্ণেন্দু আরো গভীর চলচ্চিত্রবোধের পরিচয় দিলেন। সমরেশ বসুর টানটান গদ্যে রচিত উৎকৃষ্ট ছোটগল্প অবলম্বনে তৈরী এ ছবিতে পূর্ণেন্দু চলচ্চিত্রের আধুনিক প্রয়োগ প্রকরণ ঘটিয়েছিলেন। ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির আবহ সংগীত রচনা করেছিলেন পূর্ণেন্দু নিজেই। অত্যন্ত আধুনিক বিষয় বস্তু নিয়ে এ ছবিতে পরিচালক পূর্ণেন্দু একালের সামাজিক অবক্ষয় আর তরুণ সমাজের অবনমনের একটা দিক তুলে ধরেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। ফ্ল্যাশব্যাকের সুন্দর প্রয়োগের সঙ্গেই কাহিনী বিন্যাসে তিনি স্থিরচিত্রের সুচিন্তিত গ্রন্থন করেছিলেন। ছবির

মুখ্য চারটি চরিত্রের স্বীকারোক্তির ঘটনাগুলোকে তিনি নানাভাবে ছবির গতির সঙ্গে গ্রথিত করেছিলেন। আগের দুটি ছবির তুলনায় এই ছবিটি অনেক দ্রুত গতির ছবি। প্রকৃত সৃজনশীল চলচ্চিত্রস্রষ্টার মত পূর্ণেন্দু উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিষয়বস্তুই একটি ছবির নির্মাণশৈলী গড়ে দেয়। সমরেশ বসুর কাহিনীর মধ্যে যে সমাজজীবন, যে কাল ও যে সব চরিত্রদের অবস্থান ছিল, তা একালের অস্থির সময়ের মফঃস্বলজীবনের বাস্তব আলেখ্য। তাকে রূপ দিতে গেলে যে প্রার্থিত গতি ও বিন্যাস ভঙ্গির দরকার, পূর্ণেন্দু সেটা ছবির চিত্রনাট্য রচনার সময়েই সুগ্রথিত করেছিলেন। ফলে ছবির মধ্যে মূল গল্পের আমেজটা সহজেই ফুটে উঠেছিল।

রবীন্দ্র কাহিনীর প্রতি তাঁর গভীর টানের জন্যই পূর্ণেন্দু চতুর্থ ছবি করার সময় আবার ফিরে যান রবীন্দ্র কাহিনীর বৃত্তে। ১৯৮২-তে রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' চলচ্চিত্রায়িত করেন। এই প্রথম পূর্ণেন্দু রঙীন ছবিতে হাত দিলেন। এ ছবির ক্যামেরার দায়িত্ব পালন করেন পান্ত নাগ। ছবির সংগীত রচনার দায়িত্ব পালন করেন পূর্ণেন্দু নিজেই। মালঞ্চর বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেই রঙ এ ছবির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এ কাহিনীর দুটি দিক ছিল। প্রথমটি হ'ল ছবির মুখ্য পাত্রপাত্রী নীরজা আদিত্য আর সরলার ত্রিকোণ সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্ব, অপরটি হ'ল ছবির বাইরের উপকরণ অর্থাৎ অজস্র পুষ্পশোভিত বাগানের পরিচর্যা। ছবিতে দৃশ্যমান রঙিন ফুলের বাগান এ ছবির অন্যতম চরিত্র হিসেবে পরিগণিত। পূর্ণেন্দু গভীর যত্নে ছবির ঘটনাক্রম বিন্যাসের পটভূমি হিসেবে এই বাগানটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আদিত্যর প্রাসাদোপম বাড়ী ও সংলগ্ন বাগান খুঁটিনাটি ডিটেল নিয়ে ছবিতে স্থান পেয়েছিল। এক্ষেত্রে পূর্ণেন্দুর সজাগ শিল্পচেতনা উল্লেখ করার মত। মূল কাহিনী অনুগ পরিবেশ রচনাতেও পরিচালক পূর্ণেন্দু স্বকীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাঙালী পারিবারিক স্ত্রী-আচার, চরিত্রদের বেশভূষা, অলংকার ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহে তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীরজার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল অভিনয় আর সরলার ভূমিকায় সুমিত্রা মুখার্জীর সংযত মিরুচ্চার অভিব্যক্তিকে পূর্ণেন্দু যোগ্যতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। কেবল এর পাশে আদিত্যর ভূমিকায় নবাগত ধ্রুব মিত্রের আড়ষ্ট অভিনয় ছবির মনস্তাত্বিক ত্রিকোণ সম্পর্কের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের এ কাহিনীর কাব্যিক মেজাজ যে বিষাদমগ্নতার ভেতর দিয়ে পাঠকমনকে পরিব্যাপ্ত করে পূর্ণেন্দু সেটিকে ধরার জন্য কিছুটা difuse lighting ব্যবহার করেছিলেন। তাই ছবিতে চিত্রিত টকটকে লাল আবীর, ধূসর মাটির আভাস, সতেজ নানাবর্ণের ফুল, বাগান খোঁড়ার খুরপি, সবকিছুর মধ্যেই একটা ম্লানতার রেশ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন পরিচালক। প্রথম ছবি থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে দৃশ্যগঠনের জন্য ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন তথা সামগ্রিক কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু অনেকভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেন, যা ছবির

থীমকে গভীরতা দান করতে সাহায্য করে। এ ছবির অনেক কম্পোজিশনের মধ্যেও পূর্ণেন্দুর সেই স্বকীয় মেজাজের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ছবির সংগীতাংশ সীমিত। যতটুকু আবহসংগীত ব্যবহৃত তাকে খুব উন্নত মানের রচনা বলা যাবে না। কিন্তু ছবির মুড ও সিকোয়েন্সের প্রয়োজনে ব্যবহৃত দুটি রবীন্দ্রসংগীত পরিচালকের শিল্পচেতনার পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রকাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে একটি অসুবিধা হ'ল রবীন্দ্র বর্ণনার মধ্যে চলচ্চিত্রানুগ ডিটেলের অভাব। রবীন্দ্রকাহিনীর ভেতর থেকে সিনেম্যাটিক উপকরণ সন্ধান করতে গিয়ে তাই পরিচালককে প্রায়শই চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পব্যাকরণ ও স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল হ'তে হয়। মননশীল স্রষ্টার হাতে রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার প্রাথমিক শর্তেই এমন অনেক উপাদান সন্নিবিষ্ট করতে হয় যা মূল কাহিনীর বহির্ভূত এবং পরিচালকের শিল্পবোধ ও মনীষার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এটা অনিবার্য। পরিচালক পূর্ণেন্দু সে বিষয়ে প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

পূর্ণেন্দুর শেষ কাহিনীচিত্র 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নির্মিত হয় ১৯৮৭ সালে। রবীন্দ্রকাহিনীর পরিমণ্ডল থেকে এবার তিনি সরে আসেন মানিক ব্যানার্জীর গল্পের কাঠামোয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেভাগা আন্দোলনের উপকরণ নিয়ে রচিত তারাশংকরের খুব ছোট আকারের গল্প নিয়ে পূর্ণেন্দু তাঁর ছবিতে তৎকালীন সময়টাকে ছুঁতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে কাহিনী বিস্তারের প্রাসঙ্গিকতায় তাঁর আঙ্গিকটা যেন একালের সমধর্মী সামাজিক পরিপ্রেক্ষিৎটাকেও আমাদের খানিকটা চিনিয়ে দেয়। তারাশংকর তাঁর কাহিনীতে যে পরিবেশ ও সমাজ সংকটের তির্যক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা যে ছবি তৈরীর ৮৭-সালেও বিদ্যমান, এটা পূর্ণেন্দু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্রকারকে যে অনিবার্য ব্যত্যয়ের পথে যেতে হয়, পূর্ণেন্দু পত্রী এ ছবিতে সেই সিনেম্যাটিক শিল্প-স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তাই আন্না চরিত্রের দুঃস্বপ্নের সূত্র ধরে ছবিতে এসেছে পুলিশী সন্ত্রাসের চিত্ররাজি, যাকে পরিচালক সচেতন বাস্তব ডিটেলে বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। অথচ মূল কাহিনীতে এসব বিবরণ নেই। পূর্ণেন্দুর দৃশ্য গঠনের নিজস্বতা এ ছবিতেও বিদ্যমান। চিত্রশিল্পের প্রতি সহজাত মমত্ববোধের দরুণ এবং নিজে একজন দক্ষ ছবি আঁকিয়ে হওয়ার ফলে ছবির অনেক কম্পোজিশনে চিত্রকলার আমেজ রঙে, রূপে, ফ্রেমিংয়ে একটা ভিন্ন পরিবেশ গড়ে তোলে। অসংখ্য সুন্দর খণ্ড-দৃশ্যের গ্রন্থনে, কম্পোজিশনের চারুত্বে, ফ্রেমিংয়ের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ছবির অনেক সিকোয়েন্সই মনে রাখার মত। তবু, সবমিলিয়ে এ ছবি যেন তারাশংকরের মূল কাহিনীর ফোর্সটিকে যুৎসই করে মেলে ধরতে পারেনি। গল্প পাঠে পরিচালকের মনের আয়নায় যেসব চিত্রপ্রতিমা ভেসে উঠেছিল পূর্ণেন্দু তাকে কাহিনীর প্রবহমানতার মধ্যে মেলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেইসব দৃশ্যমালা তাঁর রচিত চিত্রনাট্যের মধ্যে সংহত রূপ নেয়নি। ফলে আলাদা আলাদা ভাবে

অনেক সিকোয়েন্সের সিনেম্যাটিক মুন্সিয়ানা থাকা সত্ত্বেও ছবিটি প্রার্থিত শিল্পরূপ গ্রহণ করেনি। ছবির মুড রচনার জন্য পাশ্চাত্য ক্রুপদী সংগীতাংশের প্রযুক্তি এ ছবির প্রতিপাদ্যের সঙ্গে মেলেনি। অথচ পূর্ণেন্দু ছবিতে গণসংগীতের ব্যবহারে তাঁর শিল্প মানসিকতার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। এ ছবি দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে একধরনের অতৃপ্তি জাগলেও এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে পরিচালক পূর্ণেন্দু কোন অবস্থাতেই স্বকীয় চলচ্চিত্র পরিকল্পনার প্রযত্ন ও নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হননি। চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রেম ও দক্ষতায় তিনি ইচ্ছে করলেই মূলধারার বাণিজ্যিক ছবির জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু প্রথমাবধি সৎ ও শিল্পনিষ্ঠ ছবি করার প্রতি তাঁর গভীর ও আপোসহীন মানসিকতা তাঁকে বারবার শিল্পিত স্বভাবের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সুযোগের অভাবে ভিন্নধারার ছবি করার ক্ষেত্রে তিনি বারবার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক ছবির পরিকল্পনা পাকাপাকি হয়েও সিনেমা জগতের রহস্যময় চতুরালিতে বানচাল হয়ে গেছে। শিল্পীসুলভ হতাশা ও বেদনায় মুহ্যমান থেকেছেন। তবু বাণিজ্যিক ছবির প্রলোভনে নিজেকে বিলিয়ে দেন নি। এটা চলচ্চিত্র নির্মাণ ব্যবসার জগতে একটা বড় দৃষ্টান্তস্বরূপ।

দু'দশকের কিছু বেশী সময়পর্বে নির্মিত মাত্র পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র ও দু'একটি শর্ট ফিল্ম তৈরী করার মধ্যেই পূর্ণেন্দুকে তাঁর শিল্পবাসনা চরিতার্থ করতে হয়েছে। এটা বাংলা সিনেমা জগতের ক্ষেত্রে একান্তই দুঃখজনক ব্যাপার। পূর্ণেন্দুর ইচ্ছে ছিল বঙ্কিমের অনবদ্য রোমান্টিক 'কপালকুণ্ডলাকে চলচ্চিত্রায়িত করার। ছবির ব্যবস্থাপনাও অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিকেও অভিনব আঙ্গিকে রূপ দেবার কথা ভেবেছিলেন। চিত্রনাট্যও লেখা হয়ে গিয়েছিল, যেমনটি হয়েছিল কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রযোজনার স্তর পর্যন্ত আর এগোয় নি।

বাংলা কবিতা ও গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন সমান পারদর্শী ছিলেন, তেমনি চিত্রকলার মুন্সিয়ানার সমান্তরালেই চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে সহজেই রপ্ত করে নিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে নিয়ত চর্চাশীল শিল্পীমানস তাঁকে শিল্পের নানা শাখায় মগ্ন রেখেছিল। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়েও, আমাদের কাছে যেন চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দুই নিবিড় মমতায় স্মরণীয় হয়ে রইলেন। চলচ্চিত্র জগতে নিজেকে পরিপূর্ণ মেলে ধরার আপাত বিফলতায় জীবনের শেষপর্বে তিনি ছবি আঁকার মধ্যে নিজেকে ব্রতী রেখেছিলেন। তবু, বহুমুখী প্রতিভার সৃজনশীল পূর্ণেন্দুর শিল্পীমনের গহন গভীরে সিনেমার প্রতি বহু যত্ন-লালিত টান ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কি না, সেকথা জানার আজ আর কোন অবকাশ নেই। আমাদের এটাই ভাবতে ভালো লাগে যে, রঙ আর তুলির আঁচড় আর কালিকলমের মন্ময়ী গদ্য পদ্যের সৃজনকার পূর্ণেন্দু সিনেমার পর্দায় বাঙালীর ভালবাসা মমতায় চলচ্চিত্র স্রষ্টারূপে বেঁচেবর্তে আছেন।

'দাঁড়ের ময়না'র পূর্ণেন্দু পত্রী

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সিনেমা রসিক পাঠকদের অনেকেরই হয়ত মনে আছে 'স্বপ্ন নিয়ে' নামে একটা বাংলা ছবি মেরে কেটে রাধা এবং পূর্ণ সিনেমা হলে পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়ে সমাধিস্থ হয়েছিল। আজও সেই সমাধি থেকে উঠে আসতে আমি অন্ততঃ দেখিনি। সংস্কৃতির বড়মাপের পৃষ্ঠপোষক কলকাতা দূরদর্শনও ছবিটার কথা মনে রাখেনি। কত এলেবেলে অসহ্য ফালতু ছবি টি. ভি.-র পর্দায় দেখতে হয়, অথচ 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবির সেই বৌদিময় পৃথিবীর কমলা বৌদিকে আমরা আর একবার ফিরে দেখলাম না! দেখলাম না জ্বরের ঘোরে দেখা বিজনের সেই ভুল স্বপ্ন দৃশ্য— যেখানে জ্যোৎস্না রাতের বাগানে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে কমলা। স্বপ্নের বিজন হঠাৎ যেন কোন্‌খান থেকে এসে দাঁড়াল সামনে। দুজনে চোখে চোখে হাসল। পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কমলা। বিজনের পাশাপাশি কোথায় যেন চলে যাবে। পরের দৃশ্য: অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি মাটি থেকে সরাসরি উঠে গেছে নক্ষত্রের দিকেই বুঝিবা। বিজন এবং কমলা পাশাপাশি উপরে উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত স্নিগ্ধ এক হাসি দুজনের মুখে। যেন কী এক সার্থকতার স্বাদ। পেয়েই বুঝিবা দুজনেই উঠতে উঠতে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তারা। পরের দৃশ্য: কমলা বৌদি যামিনীকে সাজিয়ে দিচ্ছে বিয়ের সাজে নানাভাবে। তারপর বিজন এবং যামিনী যখন বিয়ের সাজে মুখোমুখি ওদের দুজনের অন্ধকার শূন্যতা ভেদ করে হঠাৎ ফেড ইন করলো কমলা। মুখে রহস্যের হাসি নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই ফেড-আউট। তারপর শেষ দৃশ্যে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মাঝখানে এক আলোকিত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে বিজন ও কমলা। কিংবা বিজন ও কমলার প্রেম। এই ছবির পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী অবশ্য চেয়েছিলেন শেষ দৃশ্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে পর্দাজোড়া বিশাল মাপের কমলা বৌদির সাজসজ্জায় মাধবীর ছবি এবং অন্তত পক্ষে চল্লিশ ফুট উচ্চতায় তোলা যায়নি। কিন্তু তার জন্যে স্বপ্নের ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে' ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। আসলে 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটার মধ্যে যে চরিত্র একটা অসাধারণ আবহ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল সেই কমলা বৌদি কিন্তু মূল গল্পে ছিলেন না! 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প। 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবির মূল ভিত্তি ঐ গল্পটাই। কমলা বৌদি চরিত্রটি পূর্ণেন্দু পত্রীর নিজের সৃষ্টি। একটা ছোট গল্পকে দু'আড়াই ঘণ্টার সিনেমায় রূপান্তরিত

করা যে কোন চলচ্চিত্র পরিচালকের পক্ষেই সহজ ব্যাপার নয়। অযৌক্তিক টেনে বড করে—অবাস্তব চমক এবং গিলে চমকানো নাটকীয়তা ঢুকিয়ে ছোট গল্পকে বড় সিনেমা করা হয়ত সম্ভব। কিন্তু চারুলতা, অশনি সংকেত, স্বপ্ন নিয়ে, স্ত্রীর পত্র, সংসার সীমান্তে-র মত ছবি খুব সহজে করা সম্ভব নয়। সত্যজিৎ রায় নিজে একজন বড় মাপের সাহিত্যিক। পূর্ণেন্দু পত্রীও গল্প উপন্যাসের কারিগর। ছোট-গল্পকে, তার নিজস্ব সাহিত্য মূল্যকে একটুও আহত না করে সার্থক একটি বড় কাহিনীতে কিভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব সেটা তাঁরা জানতেন। পূর্ণেন্দু পত্রী জানতেন—'যতই আঁটোসাঁটো হোক, ছোট গল্পের মধ্যে থেকে যায় এমন সব ফাঁক-ফোকর, খালি জায়গা, খোলা দরজা, যেখানে সহজেই ঢুকে পডতে পারে, প্রায় বিনা অনুমতিতেই, পরিপূরক অনেক কিছুই। ছাপা গান যখন গাওয়া গান হতে যায়, তখন যেমন স্বচ্ছন্দে 'প্রেলুড', 'ইণ্টারলুডে'র ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে আবহসঙ্গীতের যন্ত্রেরা। উপন্যাস অনেকটা রেলগাড়ির রিজার্ভ কামরার মতো। জায়গা অনেক। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকজনের বাইরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছোট গল্প ইণ্টারক্লাস। জায়গা সীমিত। কিন্তু অজস্রের প্রবেশাধিকারে আপত্তি নেই কোথাও।' গল্প উপন্যাস সম্পর্কে এই যে পরিণত বোধ, এই বোধের জায়গাটিতে শক্তভাবে দাঁড়াবার জন্যে যেখান থেকে গল্পকার পূর্ণেন্দু পত্রী যাত্রা শুরু করেছিলেন সময়ের হিসেবে সেটা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে।

তরুণ ঔপন্যাসিক পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম উপন্যাস 'দাঁড়ের ময়না'কে আজ কজনাই বা মনে রেখেছেন! বরং কিছু সিরিয়াস পাঠকের মনে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠতে পারে—আকাদেমি পুরস্কারের প্রথম দিন, মহারানী, ইডিয়েট নাম্বার ওয়ান, মোমবাতি মশালে জ্বালানো—এইসব উপন্যাসের কথা। কারণটা খুবই স্পষ্ট। এই সব উপন্যাসের পূর্ণেন্দু পত্রী আর 'দাঁড়ের ময়না'র পূর্ণেন্দু পত্রীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তার চেয়েও বড কথা আজ যাঁরা এইসব সাম্প্রতিককালের উপন্যাস পড়ছেন তাদের অনেকেই দুষ্প্রাপ্যতার কারণে 'দাঁড়ের ময়না' চোখেই দেখেননি। কিন্তু গল্পকার পূর্ণেন্দুকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে হ'লে, দাঁড়ের ময়নার কথা ভুললে চলবে না।

পূর্ণেন্দু পত্রী আগে কবি। তারপরে শিল্পী। তারপরে ঔপন্যাসিক। প্রাবন্ধিক তো বটেই। একই সঙ্গে কবি-চিত্রকর-গল্পকার-প্রাবন্ধিক এবং চলচ্চিত্রকার বাংলা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। সত্যজিৎ কবি ছিলেন না। কিন্তু সুররসিক ছিলেন। একসময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক নাট্যকার-গীতিকার-চিত্রকর-গায়ক, অর্থাৎ কী নয়! রবীন্দ্রনাথকে তুলনায় টানাটা নিতান্তই নির্বোধের অপচেষ্টা বলে তাঁকে এসব আলোচনায় সবসময়ে মাথায় তুলে রাখার পক্ষপাতী আমি। অতএব মনে পড়তে পারে অবনীন্দ্রনাথের কথা। চিত্রকর গল্পকার প্রাবন্ধিক। বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলীর কথা তো ভোলার নয়। তারপরে

একই সঙ্গে এতসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ-করার মত কারও কথা মনে করতে গেলেই অবধারিতভাবে সামনে চলে আসে পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম। বিদগ্ধ সমালোচকরা পূর্ণেন্দু পত্রীকে ধ্রুপদী ঔপন্যাসিকের আসনে বসাবার জন্যে মোটেও ভাবনা চিন্তা করেননি। আমিও সেই চেষ্টা করার জন্যে এত বছর পেছনে গিয়ে 'দাঁড়ের ময়না' কে টেনে আনতে চাইছিনা। আমি শুধু দেখতে চাইছি কেমন ছিল পূর্ণেন্দুর প্রথম উপন্যাস! ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ কি দেখা গিয়েছিল? বিশ্লেষণে যাবার আগে একটা গুণগত সত্য বলে রাখি। পূর্ণেন্দুর যেকোন গল্প লেখায় এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে কবিতা ও ছবির অসাধারণ যুগলবন্দী আমার চৈতন্য এবং চোখে খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কঠিন বিষয়ের প্রবন্ধও তাই পূর্ণেন্দুর কলমে রসে নরম হয়ে ওঠে। খটাখট শব্দ বাজে না। আর অত বছর আগেকার পূর্ণেন্দু পত্রীর চেতনায় কৃষক শ্রমজীবী শোষণ সাম্রাজ্যবাদী যাঁতাকল ইত্যাদি বিষয়গুলোর বেশ গুরুত্ব ছিল। আদর্শবাদীতার মধ্যে বৃহত্তর মানবিক সমস্যার প্রাধান্য ছিল। ফলে চিন্তা ও চেতনায় যথেষ্ট প্রগতিশীলতাও ছিল। ছিল দুঃসাহসও। গতানুগতিক চিন্তার স্রোতকে অতিক্রম করে যাওয়ার ঝোঁক ছিল ঐ সাড়ে তিনদশক আগেই।

'দাঁড়ের ময়না'র পটভূমি হিসেবে পূর্ণেন্দু বেছে নিয়েছিলেন একটি কৃষক পরিবারকে। তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই রজনী উপন্যাসের নায়ক। একটু পড়া শোনাও করেছে। স্বভাবতই সে তার নিজস্ব পরিবেশেও একটু আলাদা। সুঠাম সুন্দর চেহারাও তাকে বাড়তি স্বাতন্ত্র্যবোধের অধিকারী করেছে। সর্বোপরি রজনী চারুবালা নামে এক পতিতার সঙ্গে সমাজ-বিস্ফোরক প্রেমে যুক্ত। এই সব কিছু মিলিয়ে তারমধ্যে যে সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরী হয়েছে তাতে তার চরিত্রটি বেশ চিত্তাকর্ষক হতে পেরেছে। রজনীর দৃষ্টি এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে পূর্ণেন্দু একটুকরো জীবনকে কাটা ছেঁড়া করে জীবন সম্পর্কে কিছু বিশ্বাসে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন।

ইচ্ছে না থাকলেও চারুবালার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার পর রজনীর মনে হয়েছে মানুষের জীবনে যত কিছু অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে তার সচেতন ইচ্ছানুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারা। ফলে একদিকে যৌবনের ধর্মকে অস্বীকার করতে না পেরে চারুবালাকে ভালবেসেছে। ভালবেসেও সামাজিকভাবে সে তাকে বিয়ে করে সংসার করতে পারছে না। আবার তার প্রেমকেও সে অস্বীকার করে তাকে দূরে ঠেলে দিতেও পারছেনা। এখানেই একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, উপন্যাস মানেই নিছক গল্প বলার গদ্য নয়, গোটা জীবনের গদ্য। এই গদ্যে যিনি যত সার্থকভাবে রসের প্রাণ দিতে পারবেন তিনি তত সার্থক ঔপন্যাসিক। অন্য শিল্প কর্মের সঙ্গে উপন্যাসের মূল তফাৎ এই যে, সে মানুষের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যরূপে প্রকাশ করে অন্তরকে বাইরের সম্পর্কে বাঁধতে চায়।

উপন্যাসেব বাস্তবতা, তার প্রেক্ষাপট, তার সার্বজনীনতা গান পদ্য নাটকের দুনিয়া থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তৃতি বিশাল কিন্তু জীবন বোধের বিচারে গভীর। 'দাঁড়ের ময়না' উপন্যাসে পূর্ণেন্দু আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছিলেন সেই জীবনবোধের গভীরে পৌঁছুতে। প্রথম উপন্যাসেই সকলের পক্ষে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনো সম্ভব হয়না—হলে সেটাই হয়ে ওঠে মার্গারেট মিচেলের 'গণ উইথ দ্য উইণ্ড'-এর মত কালজয়ী সৃষ্টি। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম উপন্যাসের নায়ক রজনী তার মানবিকতা বোধের কারণেই তার কৃষক সমাজের ওপর উঁচুতলার অমানবিক আচরণকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে কৃষক আন্দোলনের প্রতিবাদ মিছিলে সে সামিল হয়। কিন্তু প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে এক কৃষককে নিহত হতে দেখে সে আন্দোলনের ব্যাপারে আস্থাহীন হয়ে ওঠে। কৃষকদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে যে আন্দোলনের জন্ম সেই আন্দোলন কেন কৃষককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে, এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। এর মধ্যে কোন লজিক নেই বলেই তার মনে হয়েছে। জীবনকে লজিক দিয়ে বোঝার চেষ্টা বৃথা হলেও সে লজিক্যাল ব্যাখ্যাই চেয়েছিল।

আজ থেকে অত বছর আগে এক তরুণ ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাসের নায়ক হিসেবে রজনী যথেষ্ট দুঃসাহসিক চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনীও চটকদার প্রেমকাহিনী মাত্র নয়। অবাস্তব দীর্ঘ গেঁজেল কাহিনী না ফেঁদে ছোটখাট পরিসরে উপন্যাসের পরিণতি দান করতে গিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী দিশেহারা হননি। কাহিনীর যুক্তিগ্রাহ্যতা আমবা পাঠকরা হজম করতে পেরেছি বলেই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করার সামর্থ নিয়ে বিচলিত হওয়ার অবকাশ নেই। রজনী তো বটেই একটি কৃষক সংসারের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অন্য দুই ভাই সুরেন, রমণী এবং তাদের স্ত্রীদের চরিত্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। তুলনায় চারুবালার চরিত্র সবকিছু মিলিয়ে খুব স্বচ্ছ হতে পারেনি এবং প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, ভাষা এবং আঙ্গিকের দুর্বলতা কিছু ছিল। চরিত্র গুলিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কাহিনীকে আরও কিছুটা বিস্তৃত করার প্রয়োজনও ছিল। তবুও সব মিলিয়ে আজও যখন বইটার পৃষ্ঠা ওল্টাই তখন আগের মতই বিশ্বাস জাগে একটা মহৎ উপন্যাস হওয়াব মত উপাদান 'দাঁড়ের ময়না'র মধ্যে ছিল। আর ছিল বলেই না আজকের—মহারাণী, ইডিয়েট নাম্বার ওয়ান, আকাদেমি পুরস্কারের প্রথম দিন-এর মত উপন্যাস জন্ম নিতে পেরেছে। তবু মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে বইকি, পূর্ণেন্দু যে মন নিয়ে কবিতা লেখেন, যে মন নিয়ে ছবি আঁকেন, যে মন নিয়ে ক্যামেরায় চোখ রেখেছেন সেই মন নিয়ে উপন্যাসের কলম ধরেন না কেন ? 'দাঁড়ের ময়না' তো প্রতিশ্রুতি রেখেছিল।

বাগনানের পত্র পত্রিকায় পূর্ণেন্দু পত্রী

শ্রীকান্ত পাল

বাঙলার সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির জগতে পূর্ণেন্দু পত্রী এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। স্বনামখ্যাত মানুষটির সাহিত্যজীবন শুরু কবিতা দিয়ে। মুগকল্যাণ হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ার সময় কানাইপুর সবুজ সংঘ আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অবদান'। এই সময়ে তিনি তাঁর নাকোল গ্রাম থেকে 'জাগরণ' নামে একটি হাতের লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। চাঁদভাগ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হাতে লেখা 'শিখা' পত্রিকায় তিনি লিখতেন। এই সময়ে মূলতঃ কবি হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও প্রবন্ধ ও গল্প কিছু কিছু লিখেছেন। তখন বাগনান অঞ্চলে হাতে গোনা কটা পত্রিকা বের হত। এইসব কাগজে লিখবার তেমন সুযোগ তাঁর হয়নি। কাকা নিকুঞ্জবিহারী পত্রীর ব্যবস্থাপনায় তিনি কলকাতায় থেকে আর্ট স্কুলে পড়াশোনা করেন। ফলে গ্রামের সঙ্গে ক্রমে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাগনান থেকে সেই সময়ে অজিত কুমার গোস্বামীর সম্পাদনায় 'বন্দনা', মদনমোহন গরাই ও কুমারেশ পাত্রের সম্পাদনায় 'লেখা', নবাসন থেকে ১৯৪৮ সালে মদনমোহন গরাই, তারাপদ সাঁতরা ও নলিনী কান্ত মণ্ডলের সম্পাদনায় 'পথের আলো', বাঙ্গালপুর থেকে জ্ঞান হালদারের সম্পাদনায় 'আজকাল', খাদিনান থেকে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'মালঞ্চ', মুগকল্যাণ থেকে শৈলেন ঘোষালের সম্পাদনায় 'উদয়' ইত্যাদি পত্রিকা বের হত। ইংরেজী ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় বাগনানের বহু ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে পত্র পত্রিকাও নষ্ট হয়েছে। ফলে পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা দুঃসাধ্য। দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা অনুসন্ধানে ক্ষান্তি দিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ যে-গুলি করা গেছে সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে পূর্ণেন্দু পত্রীর রচনা প্রকাশিত। বাগনানের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধে তিনি এইসব পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন বলে মনে হয়।

জীবন সংগ্রামী পূর্ণেন্দু পত্রীর ক্রমবিকাশের ঘটনাবহুল জীবন যখন প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য সৃষ্টি সহ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও চিত্রশিল্পী—বিশেষত প্রচ্ছদ শিল্পী হিসাবে খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন, তখনই তাঁর রচনা প্রথম শ্রেণীর ও নানা বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। জীবনভর সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম থেকেই তাঁর রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা প্রতিশ্রুতিবান প্রতিভাকে চিনিয়ে দেয়। তাঁর প্রথম দিকের

রচিত একটি গল্প 'অসুখ' ইংরেজী ১৯৫৯ সালে বাংলা ১৩৬৬ সনে চন্দ্রভাগ থেকে সুনীল মাইতির সম্পাদনায় হাতে লেখা ত্রৈমাসিক 'মিতালি' সাহিত্য সংকলন-রূপে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ শিল্পী ও 'অসুখ' গল্পের গল্পকারের জীবন-দর্শন ও রচনাশৈলীতে 'আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল'।

'জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যাদের নেই—তাদের এত লেখাপড়া শেখা, আধুনিক হওয়ার অহংকার কেন ? সময়ের ঝড়-ঝাপটায় ধুলো কাদা গায়ে মাখবার ক্ষমতা না থাকলে সময়ের সঙ্গে হাঁটতে বেরুনো কেন ? গল্পের নায়ক সুজিতের মুখের এই কথা তো লেখকেরই সাহসী প্রত্যয়যুক্ত শপথ উচ্চারণ। জীবনে নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রমের পূর্বাভাস। লেখক পূর্ণেন্দু পত্রীর গভীর আত্তি-আতুরতা ফুটে উঠেছে গল্পটিতে।

'আমি যখন এখানে থাকবো না, হারিয়ে যাব ভীড়ের মধ্যে, কলরবে, কাজে, যখন জীবনে এমন সব দিন আসবে যার গায়ে আলো নেই, যখন এমন সব পথ দিয়ে হাঁটবো যার দু'ধারে কোন সুস্থ সবুজ গাছ নেই, তখনও কিন্তু এই সমুদ্র আছে, থাকবে, ঠিক এমনি উদাত্ত ধ্বনি নিয়ে, এমনি চঞ্চল ছন্দে, এমনি অকূল অপার মহাসমারোহে।'

হাল্যান থেকে আব্দুল কাইউম ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় 'কফন' পত্রিকার শারদীয়া ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'সংস্কৃতি অচেতনতার বিষয়ে'। সংবাদ-পত্রের উপর আলোচনা। 'সংবাদপত্রই সাহিত্য সংস্কৃতির স্বনিয়োজিত অভি-ভাবক।' 'যতদিন যাচ্ছে দেখা যায় সংবাদপত্রই যাবতীয় প্রতিভার নির্বাচক ও প্রতিপালক'। 'পৃথিবীর আর সব দেশে বুদ্ধিজীবিরা সৃষ্টি করেন নিয়ত—আলোড়িত সেবা দিয়ে। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের আধিপত্য ও প্রশ্রয়ে বুদ্ধিজীবিদের একটা বড় অংশ ক্রমশই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন শুধু মাত্র স্থবির কলম দিয়ে লেখায়। এইভাবেই আমরা গড়িয়ে চলেছি সুদৃশ্য মোড়কে ঝলমলানো এক চরম অন্তঃসার-শূন্য সংস্কৃতি অচেতনার দিকে।'

১৩৯২-এ কফন পত্রিকার কবি দিনেশ দাস স্মরণ সংখ্যায় কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর 'অতএব' কবিতাটি প্রকাশিত হয়—

> তুমি ওদের দিকে তাকিয়ো না।
> চূড়ান্ত বিস্মরণে তলিয়ে যাবার আগে
> যে আমোদ গিলতে চায় গিলুক।
>   অতএব
> এই তো সময়
> একেবারে বীজ থেকে শুরুর।

বাণিজ্যিক তথা হ য ব র ল মার্কা পাঁচমিশালী মিশ্রচারের বাজারী সাহিত্য-পত্রিকাগুলির সাহিত্য সেবার ভঙ্গি-ভূমিকা, প্রচার পাওয়া লেখক ও তাঁদের তথা-

কথিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি কটাক্ষ ও কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি আপোসহীন প্রতিবাদী চরিত্রের প্রগতিবাদী লেখক পূর্ণেন্দু পত্রী। ১৩৯২-এ 'কফন' (৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'প্রতিষ্ঠানের পিঠে-চাপা সাহিত্য' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া লেখকদের একটাই মস্ত গুণ এরা নিজের লেখালেখির প্রতি এত অপরিসীম বিশ্বস্ত ও মনোযোগী যে, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী পড়ার অবসর এদের জীবনে দুর্লভ। দুর্লভ না হলে এঁরা নিজেরাই জেনে যেতেন কোন্ রচনা কি কারণে মরে এবং কোন্ গুণে চিরায়ত হয়ে বাঁচে।' এই মন্তব্য যে কোন লেখক সম্পর্কে সমান প্রাসঙ্গিক ও অনুধাবনযোগ্য অঙ্গুলি নির্দেশ। সচেতন লেখকের আত্মজিজ্ঞাসায় মুহ্যমান প্রতিধ্বনি, নিরুত্তর অবসাদ!

'কফন' পত্রিকার এই সংখ্যাতে তাঁর কবিতা 'শাদা রাজহাঁসের ঘুম'—

'তোমাদের অক্ষরের খেলা যত দেখি
শাদা রাজহাঁসের ঘুম মনে পড়ে
লিখে লিখে লিখে লিখে
তোমরাও হয়ে গেছো না-ভেজা
স্নুখের রাজহাঁস।'

সমাজের ঘুণ যারা দেখেও দেখে না, সমস্যা-জর্জর জীবনে সন্ত্রাস, শোষণ যাদের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস' 'মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়াদের' আড়াল করার প্রবণতা যাদের, বিভেদ-বৈষম্যের বাস্তবতার কথা যারা এড়িয়ে পুরস্কারের লোভে শিল্পের নন্দন-কানন তৈরীতে মশগুল সেইসব কর্তা আর কর্তা-ভজা লেখকের গভীর আঁতাত ভাবিয়ে তোলে।

শিল্প-সাহিত্য জগতের ব্যতিক্রমী প্রতিভা পূর্ণেন্দু পত্রীর বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির অন্যতম 'কফন' ১৩৯৩ শারদ সংকলনে প্রকাশিত নিবন্ধ 'গুনতার গ্রাসের সঙ্গে শিক্ষালোচনা'। গুনতার গ্রাস তখন কলকাতায় এসেছিলেন। একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও অন্যদিকে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। অতিরিক্ত সত্তা-পরিচয়ে আত্মীয়ভাবোধে উদ্বুদ্ধ পূর্ণেন্দু পত্রী ১৯৮৬, ২৩ সেপ্টেম্বর 'সীগাল' বুক শপে এই জার্মান কবির কবিতা পাঠ শোনেন। বিক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশ্বসাহিত্যে শ্রীপত্রীর গভীর জ্ঞান, রঙ ও তুলির জগৎ সম্পর্কে পূর্বসূরী শিল্পীদের শিল্পচেতনা ও শিক্ষা বিষয়ে মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা নিবন্ধটির হৃদয়গ্রাহী বিষয়।

বাগনান থেকে আফসার আমেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'জাগর' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৮৬-তে কবির 'অক্ষরই সবার আগে আধুনিক' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

শব নয়, কবিতাও নয়

সর্বস্বের বিনিময়ে যা কিছু
অক্ষরও নক্ষত্র খোঁজে অজানা দ্বীপের—

*　　　*　　　*

অক্ষরই সবার আগে আধুনিক,
বিপ্লব বিশ্বাসী—

১৩৮৭-তে শারদীয় 'জাগর' পত্রিকায় কবির 'বলো' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। চব্বিশটি স্তবকে লিখিত কবিতাটির প্রতিটি পংক্তির স্বচ্ছ নিটোল ও মুক্তার দ্যুতি-বিচ্ছুরিত-বিস্ময়-অনুভব পাঠককে যথেষ্ট ভাবিয়ে তোলে। সমাজ সচেতনতা সহ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, নানা প্রসঙ্গ-প্রশ্ন-দর্শন শিল্পময়তায় উজ্জ্বল এই কবিতা 'নিজের ব্যথার ছুঁচে নিজে আমি সেলায়ে সেলায়ে নকশি কাঁথার মতো।'

কে ডাকলো, দরজা খুলি, কেউ নেই
পাতাবাহারের
　　ডালে ডালে লুটোপুটি
　　　　হাওয়ার হাসির খিলখিল
যোগাসনে বসে ধীবে খুলতে চাই ডানার আকাশ।
শব্দ। বলো বাল্মিকীর কণ্ঠস্বর পাবো কি পাবো না।
আমার ডানার শব্দ ঝড়ের মতন উচ্ছৃঙ্খল

এই ধু ধু সময়ের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি তার সবই জমা রইল এখানে, এ অক্ষরমালায়।—এমনি অনেক উচ্চারণ, বোধের বর্ণচ্ছটা।

১৩৯৭-এ পিপুল্যান থেকে গৌরবরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত শারদীয় বাগনান বার্তায় প্রকাশিত কবিতা 'সূর্য ও সময়'

আমাদের প্রতিদিন চুরি হয়ে যায়
জমানো টাকার মত স্বপ্ন, সাধ, সম্ভাবনা সৎ অভিপ্রায়।
সবই কি সূর্যের দোষে? সময়েরও বহু দোষ ছিল।

জানা গেছে, পূর্ণেন্দু পত্রী হারপ থেকে প্রকাশিত 'আজকাল' (নবপর্যায়) ও 'পথের আলো' (নবাসন থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় কবিতা লিখেছিলেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকের আঁতুড় ঘর—এই পত্রিকাগুলি তাঁর কবি সত্তার উন্মেষ পর্বের অলংকার-আধার।

স্বয়ম্ভু পূর্ণ ইন্দু

তপন কর

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় অনেক পরে, আটাত্তরে, যখন তিনি আনন্দবাজারে চাকরিরত। আমি তখন একটা প্রকাশনা খুলেছি। দ্বিতীয় বই তারাপদ সাঁতরার 'শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য'-র দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ হবে। প্রচ্ছদ আঁকানোর জন্যে তারাদা আমাকে পাঠালেন পূর্ণেন্দু পত্রীর কাছে। এর অনেক আগে সাতষট্টিতে যখন আমি নিতান্তই গ্রাম্য বালক, তখন আমার কাছে প্রথম তাঁর নাম উদ্ভাসিত হয়। তখন আমি বাগনান থানার ছয়ানি গ্রামের বাসিন্দা। আবার কলকাতায় হাতিবাগানে টাউন স্কুলে পড়ছি। তবে প্রতি শনিবারের দুপুরে ছয়ানি চলে যাই। মা-ও থাকতেন ছয়ানিতে। সেসময়েই এক অপরাহ্নে আমাদের উঠোনে লাউমাচার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অমল গাঙ্গুলী ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। অমলবাবু মাচায় ঝুলে থাকা কচি লাউয়ের গায়ে নখের আঁচড় কেটেছিলেন। আমার ঠাকুর্দা হারাচাঁদ কর সেটা দেখে বেশ বিব্রত হয়ে তাঁকে লাউয়ের গায়ে দাগ কাটা থেকে নিরস্ত করেছিলেন মনে আছে। সেদিন অমলবাবু ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তৎকালীন ভোট প্রচারে। আমার বাবা পঞ্চানন কর (পরে এ্যাফিডেবিটে শিশির কর) তখন কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী ছিলেন। সেই সুবাদে বাবাকে তাঁরা ঐ গ্রামের মানুষকে প্রভাবিত করার কাজে প্রতিনিধি করেছিলেন। তাঁদেরই রেখে যাওয়া বিস্কুট রঙের মলাটের একটা ছোট বইয়ে আমি প্রথম এই পুণ্যনামটি দৃষ্টিতে ও মনে স্পর্শ করেছিলাম। মলাটে লেখা ছিল 'অমল গাঙ্গুলী প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী।'

অমল গাঙ্গুলীকে যা দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল লোকটি একজন বিরাট লোক। আমার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। কলকাতার ইস্কুলে পড়লেও ছুটি ও কামাই মিলে ছয়ানিতেও থাকতাম অনেকটা সময়। তাতে বিভিন্ন সময়ে লোকমুখে অমলবাবু সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে তাঁকে একজন বিরাট লোক বলেই মনে হয়েছিল। সেই লোককে যিনি পরিচয় করাচ্ছেন তিনিও তাহলে কত বড় লোক এসব প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কিন্তু তখন বা পরবর্তী সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রীকে জানলুম অন্য পরিচয়ে। লেখক, শিল্পী, কবি, ও ফিল্ম ডিরেক্টার হিসেবে। তার মধ্যে লেখক বা কবি-টবিও নয়, সিনেমার লোক হিসেবেই জানতুম তাঁকে। কারণ আমাদের ১৫৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ভাড়াঘর থেকে হাঁটাপথে রূপবাণী হয়ে টাউন ইস্কুলে যাবার সময় 'রাধা' সিনেমা হলের বারান্দায় 'স্বপ্ন নিয়ে' সিনেমার হোর্ডিং দেখতুম। দক্ষিণমুখো রেলিং-এর গায়ে বেশ সাজগোজ করা একজন মেয়ে গড়গড়ার

নল হাতে তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে জমিদারী ভঙ্গিমায় ব'সে আছে—এমন একটা সাদা-কালোয় আঁকা ছবি টাঙানো থাকত। সে সিনেমা আমি কোনদিন দেখিনি।

এর অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের একটা সূত্র হাতে এসেছিল, কিন্তু আমার ব্যাকবেঞ্চার চরিত্র তখনো কাটেনি। তাই সে সুযোগ আমি নিতে পারিনি। সালটা বাহাত্তর-তিয়াত্তর। তখন কুলগাছি থেকে চৌরঙ্গীর সরকারী আর্ট কলেজে যাতায়াত করছি। একদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর মুন্টিয়া গ্রামের নিমাই মণ্ডলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিমাই মণ্ডল আমাদের আত্মীয়। তিনি কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলের কোন প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করেন। নিমাইদা আমাকে বলল, শুনেছি তুমি আর্ট কলেজে পড়ছ, তো তাহলে নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলুম, নিকুঞ্জ পত্রী আবার কে? নিমাইদা বললেন, আরে নিকুঞ্জ পত্রীকে চেনো না, পুর্ণেন্দু পত্রীর কাকা। আমি তো অবাক। বললুম, নিকুঞ্জ পত্রীকে কোথায় পাব? নিমাইদা বলল, ঐ তো যাচ্ছে, এসো তোমার সাথে আলাপ করে দিই। হাওড়া স্টেশনের বারো নম্বর প্ল্যাটফরমে নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর হাতে একটা ঝোলা ব্যাগ ছিল, অতি সাধারণ একজন ফর্সা মতন ভদ্রলোক। আমাকে ওঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতে বলেছিলেন, আর ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা চিত্রিতা পত্রিকার মোটা মতন সংখ্যা দিয়েছিলেন, যা দেখতে অনেকটাই 'উল্টোরথ' বা 'জলসা' পত্রিকার মত ছিল। চিত্রিতা পত্রিকার কোন কপি ঐ প্রথম ও শেষ আমি হাতে পেয়েছিলাম। বস্তুতঃ আমাকে সাধারণ টিউশন ক'রে এবং আট-টাকা দশ-টাকা দামের ধূপের প্যাকেট কিংবা ছোট ছোট প্যাকেটের ডিজাইন এঁকে সেই পয়সায় আর্ট কলেজের খরচ চালাতে হত। বিশেষ করে টিউশনের বাড়িতে হাজিরা দেবার জন্যে আমাকে সন্ধ্যার আগেই কুলগাছি ফিরে যেতে হত। ফলে নিকুঞ্জবাবু তো দূর, নিজের আঁকা ভালো করার জন্য হাওড়া স্টেশনের ফিগার স্টাডিতেও ভালভাবে সময় দিতে পারতুম না। ফলে নিকুঞ্জবাবুর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ হারালুম। পুর্ণেন্দুও দূরে রয়ে গেল। তারপর যেমন হয়। আমি আমার দিশাহীন এলোমেলো পথেই ঘুরছি। কুলগাছিতে ক্লাব সংস্থা গঠন করে কাজ করছি, আর কলকাতায় এটা-সেটা কমার্শিয়াল ডিজাইনের কাজে কিছু পয়সা পাবার চেষ্টা করছি।

ঐ সময়েই অর্থাৎ পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরেই সংস্কৃতি-জগতে পুর্ণেন্দু পত্রীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা অনুধাবন করতে এখানে আরো একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সামতাবেড়ের শরৎ মেলার প্রস্তুতি পর্বে বাগনান কলেজে বড় একটা ঘরে একটা সভা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পানিত্রাসের বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ঐ সভাটি যদি ১৯৭৬-এ হয়ে থাকে তাহলে পুর্ণেন্দু পত্রীকে আমি তখনই প্রথম চোখে দেখি। সেই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ড. অসিতকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভারতী, সন্তোষকুমার ঘোষ, ড. শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীও ছিলেন। যখন তাঁর বলার পালা এল তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠেছিল। তাঁর সেদিনের কটি কথা আমার এখনো মনে আছে। সভায় শ্রোতাদের বসার জন্য ছিল মেঝেতে শতরঞ্চি। আর বক্তাদের জন্য ক্লাসরুমের ফুটখানেক উঁচু প্ল্যাটফর্ম কয়েকটা জুড়ে চাদর বিছিয়ে একটা মঞ্চ, যেখানে সবাই বসে আছেন। মাইকে শ্রোতাদের প্রাথমিক সম্বোধনের পর তিনি বললেন, "আজ আপনারা আমাকে আপনাদের চেয়ে খানিকটা উঁচু আসনে দেখছেন, কিন্তু আসলে আমি আপনাদেরই ঘরের ছেলে। বাগনানের পথে ঘাটে আমি কত ঘুরে বেড়িয়েছি…" যাইহোক, তখন, সেই বিশ-বাইশ বছর আগেই তখনকার সংস্কৃতি জগতের প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে একই মঞ্চে পূর্ণেন্দুপত্রীও সমান উজ্জ্বল ছিলেন দেখেছি।

এবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের কথায় আসি। আমার তখনকার ধনী বন্ধু কেশব জানার পাঁচ হাজার টাকার মূলধনে নামতে গেলাম প্রকাশনা ব্যবসায়। প্রথম বই বাগনানের ড. জয়ন্ত গোস্বামী ও মায়াঞ্জনা গোস্বামীর 'বিবেকানন্দের সাহিত্য।' দ্বিতীয় বই তারাপদ সাঁতরার। যে বইয়ের কথা আগেই বলেছি। এবং পৌছলাম আনন্দবাজারে পূর্ণেন্দু পত্রীর টেবিলের সামনে। বসতে বললেন। কাজের মধ্যেই কথা বলছিলেন। মাঝে মাঝে অন্য কর্মীরা আসছিলেন। আমাকে পরে একদিন আসতে বললেন। সেদিনও উনি খুব ব্যস্ত। যথারীতি কভারটা হয়নি। আরেক দিন গেলাম। সেদিন—ওটা হয়নি রে। আরেক দিন গেলাম।—বইয়ের নামটা কি যেন! আচ্ছা তুই ব'স। ক'রে দিচ্ছি।

এইভাবে 'শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য'-র প্রচ্ছদ করাতে বারবার যেতে যেতে আমি তাঁকে কিছুটা চিনেছিলাম। কিন্তু তিনিই আমাকে বেশি করে চিনে রেখেছিলেন। তার প্রমাণ পরে পেয়েছি। তারপর বছর দুই কোন যোগাযোগ ছিল না।

আমি আটাত্তরের জুন থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গবেষণা পরিষদে' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের সমীক্ষা কাজে ফিল্ড ইন্‌ভেস্টিগেটর পদে যোগ দিই। বর্তমান আনন্দমেলার কর্মী বিমল পাল আমাকে ডেকে নিয়ে যায় এই কাজে লাগার জন্যে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আর্ট কলেজে পড়তে পড়তে আমার এক বান্ধবীর প্রেরণায় আমিও প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করেছিলুম। বিমল বলল, তারা নাকি একটু শিক্ষিত আর্টিস্ট খুঁজছে। আসলে আমি তো অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেই কাত। ইতিমধ্যে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি। আরও কত কথা শুনেছি। তাঁর অধীনে কাজ পেলে তো জীবন ধন্য হয়ে যাবার কথা, অন্ততঃ আমার মত ব্যাকবেঞ্চার এবং গেঁয়ো ছেলের তো হবেই। আঁকা এবং স্বয়ং অসিত বাবুর ঘরে বাংলা বিভাগের

প্রধানের সুবৃহৎ টেবিলের সামনে বসে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমার তিনশ টাকা মাইনের চাকরি হল। বাংলায় টাইপ করা কাগজে নিয়োগ পত্রও পেলাম। পূর্ণেন্দু পত্রী রইল পড়ে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, দার্জিলিং থেকে পুরুলিয়া, জেলায় জেলায় থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে বছরের প্রায় ন'মাসই ঘুরে বেড়াচ্ছি। থাকা-খাওয়া সরকারী পয়সায়। সরকারী বাংলো, সার্কিট হাউসে থাকা, সরকারী গাড়িতে ঘোরা-ফেরা, দিনে গ্রামের চাষাভুষাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আর সন্ধ্যায় ডি. এম., এস. পি., এস.ডি.ও, বিডিও-দের সঙ্গে ওঠা-বসা, সে এক পর্ব গেছে পশ্চিমবঙ্গকে দেখার। কে অত মনে রাখে বাংলা প্রকাশনা হল কি হল না, পূর্ণেন্দু পত্রী আমায় মনে রাখল কি রাখল না! তবে ধাক্কা এল বিয়ে করার পরে। চাকরি চাই। বলা বাহুল্য যে, চাকরি পাবার আগেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কারণ ততদিনে জেনেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা চাকরি নয়, ওটা নাকি স্কলারশিপ্।

আবার গিয়েছিলুম পূর্ণেন্দু পত্রীর আনন্দবাজারের অফিসে। চাকরির জন্যে নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা দরখাস্ত করব। ভারাদা বললেন পূর্ণেন্দুর থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আয়। পূর্ণেন্দু পত্রীর বাংলা লেখা অনেক পড়েছি। ইংরেজী কোনদিন কিছু পড়িনি। প্রতিক্ষণ 'কাউন্টার পয়েন্ট কাউন্টার' কাগজ করেছিল পূর্ণেন্দুদার আমলেই। তাতে কিছু লেখা থাকতে পারে। তবে সেদিন দেখলুম পূর্ণেন্দুদা কোন কাটাকুটি না করে নিজের লেখার প্যাডে হড়হড় করে ইংরেজীতে সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে দিলেন আমাকে। সার্টিফিকেটটা এখানে হুবহু তুলে দিলাম এজন্যে যে আমার সম্পর্কে তখনই তিনি অনেকটাই খোঁজখবর করে ফেলে ছিলেন। সময়টা ছিল আশির মাঝামাঝি—

139 Bangur Avenue Block B
Calcutta 700055 Purnendu Sekhar Pattrea
Phone 574575

Sri Tapan Kumar Kar is very much known to me. I have seen many of his drawings, sketches and cover designs, which deserve high-praise. For six years, he is running a Art-teaching school at Kulgachia for infants. He is imaginative in his drawing and keenly interested in the field of Art. I am sure that a prosperous future is waiting for him.

with Regards
Sd/ 25. 7. 80

একাশির গোড়ায় আমার সরকারি স্কুলে চাকরি হয়ে গেল। আমি চলে গেলুম পুরুলিয়া জিলা স্কুলে। এরই পরে উনি আনন্দবাজার ছেড়ে প্রতিক্ষণে গেছেন। আমাদের বন্ধু আফসার আমেদ, কেশব আড্ডু তখন প্রতিক্ষণের নিয়মিত কর্মী। পুরুলিয়া থেকে কলকাতা এলে মাঝে মাঝে প্রতিক্ষণে যাই। পূর্ণেন্দুদা জিজ্ঞেস করেন, কিরে তুই কোথায় থাকিস, আসিস না কেন। কলকাতা ছেড়ে আঁকাআঁকি ছেড়ে পুরুলিয়াতে ইস্কুলে আঁকার মাস্টারি করছি, এটা পূর্ণেন্দু পত্রীর মত কাজ-পাগল লোককে বলতে লজ্জা পেতুম। তাই একরকম পূর্ণেন্দুদাকে এড়িয়েই চলতুম। কারণ আঁকার মাস্টারি করে পেট চালান যে আঁকিয়ের পক্ষে লজ্জার এটা তখন আমি বুঝতে শুরু করেছি। ঐ পর্বেই পূর্ণেন্দুদার একবার একটা কবিতা নিয়ে পুরুলিয়ার একটা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপতে দিয়েছিলাম। কাগজটা এতই বাজে ছাপা হয়েছিল যে পূর্ণেন্দুদাকে সেই কাগজের কপি দিতে যাইনি নিজে।

ছিয়াশির শেষ দিকে কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পরেও যাইনি। নব্বইতে সল্টলেকে গ্যালারি সিবি ৫৬ উদ্বোধনে সব নামী শিল্পীদের একটা করে ছবি নিচ্ছিলাম। গ্যালারির পক্ষে রমেন দাসের সঙ্গে আমাকে দেখে পূর্ণেন্দুদা অবাক। —কিরে তুই! সব শুনে বাইরের ঘরে সোফায় রমেনবাবু ও তাঁর বন্ধুকে বসিয়ে রেখে আমাকে আঁকার ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, তুই যে এতকিছু করছিস কই বলিসনি তো? আসিস না কেন! দেখ্ কোন্ ছবিটা দেওয়া যায়। দুজনে মিলে ছবি পছন্দ করলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, দাম কি থাকবে? বললেন, তুই যা হোক ঠিক কর না। শেষমেষ বোধহয় তিন হাজার টাকা দাম ঠিক করলাম। অবশ্যই সে ছবি বিক্রি হয়নি।

একানব্বইতে ঐ গ্যালারিতেই যখন আমার টেরাকোটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথা হল তখনো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আসতে পারলেন না। বিরানব্বইতে যখন ফুলগাছির মেলায় সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করলাম, তখনো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা হাঁপানির বা ব্রঙ্কো-জাতীয় কিছু একটা চলছিল। আমার মনে হত তাই। বইমেলায় আজকালের স্টলে ব'সে ভক-ভক করে সিগ্রেট টানছেন আর ঢকঢক করে কাশছেন, আমি ফুলগাছির এক তরুণকে নিয়ে আলাপ করালাম। কাশি এবং হাঁপের প্রকৃতি দেখে মনে হল ব্রঙ্কো। কারণ আমার মা-ও দীর্ঘদিন ঐ অসুখের যাত্রী ছিলেন, রোগলক্ষণ কিছুটা বুঝেছিলাম। যাইহোক আমি আমার এলোমেলো কাজ নিয়েই থাকি। পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে কোনভাবে জমানোর ব্যাপার মাথায় আসেনি বা সুযোগও ঘটেনি। অথচ সাতাশি থেকে লাগাতার সল্টলেকে নানা কাজে, প্রদর্শনীতে ব্যস্ত আছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সভায় উলুবেড়ে কলেজে গেলুম পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে দেখা হবে এই আশায়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আবৃত্তিকার সুপ্রিয় ধর ও ডাঃ রূপেন বসু মল্লিকও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন বীরশিবপুরের লোকসংস্কৃতি মেলার

মাঠে দাঁড়িয়ে। উলুবেড়ে কলেজের সভায় পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে ছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিয় ধর লিখেছেন সব কথা। ঐ সভায় সভা আরম্ভের আগেই দর্শকাসনে বসে পূর্ণেন্দুদাকে আমার ছোট ইঞ্চি চারেক আকারের একটা 'ভাঁড় গণেশ' উপহার দিলাম। সেটা নিয়ে তিনি যে কতটা খুশি হয়েছিলেন তা তাঁর চোখ মুখেই প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ সমসাময়িক গণেশ-কালচারে 'ভাঁড়-গণেশ' তিনি আগে পাননি বা দেখেন নি। পরে যখন তাঁর বাড়িতে গেছি তিনি দেখিয়েছেন, দেখ্ তোর গণেশকে কোথায় রেখেছি।

তাঁব কাজের ঘরে উত্তরের দেয়ালে নিজের গ্রন্থরাজির মধ্যে ফাঁকা মত এক টুকরো জায়গায় বসিয়েছেন সেটি। উলুবেড়ে কলেজ থেকে সেদিন ফেরার সময় কলেজের পুকুরপাড়ে গাড়িতে ওঠার আগে আবার আমাকে বললেন, "তপন তুই আসিস।…" আবও কিছু বলেছিলেন, যা আমার প্রতি নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতার কথা। যদিও কথাগুলি সেদিন উপস্থিত অনেকেই শুনেছিলেন, তবুও তা এখানে লেখার যোগ্য নয়। আশা করি যাঁবা শুনেছিলেন তাঁরাও তা ভুলে গেছেন।

এরপব যে ক'বার তাঁর বাড়িতে গেছি তার মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের দিন হল যেদিন তিনি তাঁর দোতলায় উঠতে সিঁড়ির বাঁদিকের দেয়ালে লাগান একটা কাঠের বোর্ড দেখিয়ে বললেন, "তুই তোব ইচ্ছেমতন একটা টেরাকোটার কাজ করে দে এখানে।" আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি ইস্কুলের চাকুরি করে এই রকম কাজ করার জন্যে তো সময় পাই মাত্র রবিবারটা। ফলে অনেক দিন লাগল ব্যাপারটা সাজাতে। তার পরেও কিছু অংশ বাকী রয়ে গেছে। সেগুলো লাগাবার আগেই পূর্ণেন্দুদা চলে গেলেন। এর মধ্যে তিনি মাটির কাজ করবেন বলে বায়না ধরলেন, বললেন, তুই তো আমাদের ওখানকার জমির মাটিতেই কাজ করছিস, সেই মাটিই আমাকে একটু এনে দে। পলিথিনে বেঁধে কুলগাছি থেকে মাটি এনে দিলাম। মডেলিংয়ের কাঠের ভাঁটি দিয়ে এলাম। আমার সামনেই একটা ছোট ইঞ্চি তিনেক আবক্ষ মূর্তি করে ফেললেন। বললেন আমি ছোট বেলায় কত পুতুল করেছি, জানিস! বললাম, আবার করুন। আমাদের সিবি ৫৬ গ্যালারীতে প্রদর্শনী করব, 'পূর্ণেন্দু পত্রীর পুতুল' যার শিরোনাম হবে। একটু ভেবে বললেন, ব্যাপারটা নতুন হবে, না? বললুম, সবাই আপনাকে চলচ্চিত্রে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে মলাটে ছবিতে জানে, পুতুলে জানে না। এটা আপনার পরিচয়ে নতুন একটা মাত্রা এনে দেবে। বললেন, তোকে মাঝে মাঝে আসতে হবে, নাহলে আমি ভুলে যাব। যার যা দরকার এসে আমাকে কাজে লাগিয়ে দেয়, আমার নিজের কাজ ভুলে যাই। সিগ্রেট দে।

পূর্ণেন্দুদা এই সেদিনও একটার পর একটা সিগ্রেট খেতেন। উইলস্ ফিল্টার। আমি খেতুম চার্মস বা ঐ ধরনের সস্তার কিছু। ফলে পূর্ণেন্দুদার বাড়ি যাবার সময় আমাকে পকেট ভর্তি উইলস্ ফিল্টার কিনে ঢুকতে হত। আমি মোটামুটি ঘণ্টায়

একটা খেতুম। পূর্ণেন্দুদা খেতেন ঘণ্টায় চার-পাঁচটা। মাঝে মাঝে আঁকা থেকে উঠে বসার ঘরে সোফায় চলে আসতেন, সিগারেট তো খেতেনই, পকেট থেকে ওষুধ বের করে কয়েকটা ট্যাবলেট নিয়ে বলতেন, জল দে। জল দিলে ট্যাবলেট খেয়ে ফেললেন। একদিন জিজ্ঞেস করলুম, আপনি এত ওষুধ খান কেন? উড়িয়ে দিতেন, ও তুই বুঝবি না। আমার মনে হয়েছে, ঐ ব্যাপক এবং দীর্ঘকাল ওষুধের যে ধারাবাহিকতা সেটাই তাঁর সর্বশেষ অসুখ কর্কট রোগের উৎস।

যেদিন আমি ও আমার মেয়ে বুড়ু মিলে সিঁড়ির দেয়ালে টেরাকোটা লাগাচ্ছিলুম সেদিন ওঁর বাবা পুলিনবাবু আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। আমি সব কথা শুনতে পাচ্ছিলুম না। পূর্ণেন্দুদা ভিতর থেকে আমার হয়ে মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছিলেন। আমার মেয়েও উত্তর দিচ্ছিল। সেদিন আমার একটা অনুভূতি হয়েছিল। বিখ্যাত পুত্রের অখ্যাত বাবার সম্পর্ক কেমন হয় তা প্রত্যক্ষ করে।

একদিন বললেন একটা দুর্গার মুখ কর টেরাকোটায়। দেবীভাব আনবার চেষ্টা করবি। কুলগাছির বাড়িতে বসে করেও ফেললুম। বিশেষ ধরণের আঁকিবুঁকি বা টেক্সচার আনার জন্যে অতি নরম মাটিতে কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে কাজটা করেছিলুম। হয়ত সে জন্যেই বা মাটির ভিতরে কিছু গোপন রস থাকার জন্যে পোড়াতে গিয়ে মুখটা ফেটে টুকরো হয়ে গেল।

এদিকে পূর্ণেন্দুদাকে বলেছি যে কাজটা হয়ে গেছে, পোড়ান হলেই আনব। ব্যাস, এখন তাঁকে যদি বলি মুখ ফেটে চৌচির, তিনি কি বিশ্বাস করবেন! যাইহোক কাঁচা অবস্থায় কয়েকটা স্লাইড তুলেছিলাম। তা থেকে বেছে একটা স্লাইড নিয়ে গেলাম। বললাম সব। স্লাইডটা তুলে ধরে দেখে বললেন, এই মুখ যদি টেরাকোটা আকারে আসত, বুঝলি, আগুনের মত জ্বলত। বলতে বলতে স্লাইডটা নিয়ে একটা ছোট পিসবোর্ডের বাক্সর মধ্যে রেখে দিলেন। সেটা নিশ্চয় এখনো তাঁর ঘরেই কোথাও রাখা আছে।

তারাপদ সাঁতরার লেখা আনন্দ নিকেতন থেকে প্রকাশিত 'বাংলার দারুভাস্কর্য' বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং টাইটেল পেজ ও ভিতরের ড্রয়িংগুলি করেছিলাম আমি। ড্রয়িংগুলি যে ভাল হয়েছিল তার সবচেয়ে মূল্যবান সার্টিফিকেট পেয়েছিলুম আশি সালেই অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। তারাদার আগ্রহে যেদিন প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল সেদিন তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে, কারণ তুমি যেমন নিবের কাজ জান আমিও তেমনি ক্যামেরার কাজ জানি।" আমি যাতে চাকরির দরখাস্তর সঙ্গে দিতে পারি সেজন্য তিনি তাঁর প্যাডে একটা প্রশংসাপত্রও টাইপ করে সই করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রায় পনের বছর পর সেই একই কাজের জন্যে দ্বিতীয় বার সার্টিফিকেট পেলাম পূর্ণেন্দুদার কাছে। 'ড্রয়িংগুলো ভালই হয়েছিল। তারপর বললেন আমার কাঠের কাজের কালেকশানগুলো দেখেছিস তো।' বলে

উঠে এসে বসার ঘরের কাজগুলি আলাদা করে করে বোঝাতে ও দেখাতে লাগলেন। তারপর বললেন আমার কাছে এখনো অনেকগুলো কাঠ পড়ে আছে। কাজে লাগাতে পারিস? ড্রয়িং বলে দিলে কাটতে পারবে এমন লোক আছে? তুই তো অনেক জায়গায় ঘুরেছিস? লোক আছে? আমাদের হাওড়া জেলার লোক আছে?

আমি তো হতভম্ব। লোকটা পাগল নাকি! এই যে লোক আমেরিকা লণ্ডন পাড়ি জমাচ্ছে, জজ ব্যারিস্টার আমলা মন্ত্রীরা যাকে নিয়ে আসর বাসর করছে সেই লোক কি না মাটির পুতুল কাঠ খোদাই নিয়ে আকুলি-বিকুলি করছে! আমরা যখন এইসব ফালতু কাজ ছেড়ে কিভাবে কোথায় দু-পয়সা কামানো যায় এই চিন্তায় ব্যাতিব্যস্ত, এই লোক তখন কিভাবে কোন কাজে 'দু-পাঁচ' হাজার গচ্চা দেওয়া যায় তাই ভেবে ছটফট করছে। আরও হতভম্ব এই ভেবে যে, যে লোক বাল্যকালে গ্রাম ছেড়ে কলকাতার বুকে পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে, সল্টলেকের মত অত্যাধুনিক শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে মুখ্যমন্ত্রীর হাতার মধ্যে, কয়েকশ' ভিআইপি রাজ্যের মধ্যে বসবাস করছেন, সেই লোক কেন "আমাদের হাওড়া জেলার কাঠের কাজের লোক" খুঁজে মরছেন। এটা কি আকস্মিক কোন আবেগের প্রকাশ? না কি মনের কোণে পুষে রাখা সুপ্ত বাসনা কিংবা শৈশবের স্মৃতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে মূর্ত করার মরিয়া প্রয়াস। সেদিন এক ঝলকে মনে পড়েছিল শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের একটা কথা, নব্বইয়ের গোড়ায় আমি ও আমার বন্ধু 'পাঁপা' সম্পাদক শ্যামল দত্ত বাঙুরে বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়েছিলাম, একটা প্রদর্শনীর প্রস্তুতিপর্বে। সেদিন বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "তুমি পুতুল নিয়ে যে কাজ করছ এটার মূল্য অনেক। দেশ-এ পুতুল নিয়ে তোমার লেখাগুলো পড়েছি। দারুণ কাজ হচ্ছে। তুমি আমাদের বাংলার এই পুতুলগুলোকে হাইলাইট কর। গুড ডিসপ্লে করতে হবে। বিড়লায় আমি বন্দোবস্ত করে দেব তুমি সাজিয়ে ফেল।" আমার মুখভাবে উনি হয়ত সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, তাই আবার বললেন, "আমরা যে ছবি আঁকছি এ তো দেশের ফাইভ পার্সেন্ট মানুষও দেখে না, পঁচানব্বই ভাগ মানুষের শিল্প হল ঐ পুতুল। তুমি পুতুলগুলো নিয়ে একটা বড় প্রদর্শনী কর।"

বলা বাহুল্য নানা কাজে অর্থাৎ পাঁচ-দশ টাকা রোজগারের কাজে ব্যাস্ত হয়ে ঐ পুতুলচর্চা বিশেষ এগোয়নি। তাছাড়া একানব্বইয়ে দিল্লীর সিসিআরটি-র ট্রেনিং সেরে ফিরে পোড়ামাটির কাজে মেতে যাবার ফলে গ্রাম ঘুরে ঘুরে নতুন করে পুতুল সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। পূর্ণেন্দুদা আবার এই পঁচানব্বইয়ে এসে পুতুলের ব্যাপারটা খুঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ বছরেই কুলগাছিয়ার কিছু দুষ্টপ্রকৃতির লোকের এক বিসদৃশ কাণ্ডকারখানায় আমার কুলগাছিয়াকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কাজকর্ম এবং মানসিক শান্তি স্থৈর্য বিঘ্নিত হল। ফলে গ্রাম ঘোরার কাজ কিছুই হল না।

বস্তুতঃ পূর্ণেন্দু পত্রীর অন্য সব পরিচয়ের আড়াল থেকে যখন এই বিশেষ মনের

পরিচয়টা আমার সামনে বেরিয়ে এল, তখনই ১৯৯৫ এর গোড়ায় আমি তাঁকে নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে শুরু করি, এবং হাওড়া জেলা তথা বাগনানকেন্দ্রিক গন্ধটা বজায় রাখার জন্যে তাঁর বহু স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম কানাইপুর থেকে প্রকাশিত 'আলেয়া' পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যা পূর্ণেন্দুদাকে নিয়ে করার পরিকল্পনা করলুম। আলেয়া সম্পাদক মোহন কাপড়ী বলল, এই সংখ্যায় লোগো করার জন্য ওঁর একটা ছবি নাও। পূর্ণেন্দুদাকে বলতে তিনি খুঁজে পেতে একটা ছোট ছবি দিলেন। সেটা দিয়ে বাগনানেরই একটা প্রেসে সেটা ছাপা হল। সংখ্যার কাজ এগোচ্ছিল খুবই টিমে তালে, যাকে 'আঠার মাসে বছর' বলা হয়। এসব কথা সম্পাদকীয়তে বলেছি। তাই এখানে শুধু এটুকুই বলা যায় যে পূর্ণেন্দু পত্রী একজন সাধারণ সফল শিল্পী বা সফল কবি মাত্র ছিলেন না, তিনি শিল্পের প্রাণ কেন্দ্রে অর্থাৎ দর্শনে পৌঁছতে পেরেছিলেন। হয়ত আর কটা বছর সময় পেলে তিনি শিল্পের দর্শন প্রসঙ্গে কিছু বলে যেতে পারতেন। বাঙালি সেটা পেল না।

পূর্ণেন্দু পত্রী : শেষ স্বপ্ন, শেষ রচনা

সুব্রত চৌধুরী

ঘুরতে ফিরতে যাঁর এত সৃষ্টিসম্ভার চোখে পড়ে, সেই মানুষটা আজ নেই একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারি না। তাঁর কবিতা, সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র, এত সব এমনভাবে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে যে, সেটা ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে।

এমন কিছু অব্যক্ত বেদনা বা কথা যেটা মানুষ নিজেও নিজেকে বুঝতে দেয় না, পূর্ণেন্দুদা মানুষটা বোধ হয় তেমনই একজন যে কিনা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রতারণা করে গেলেন নিজের সঙ্গেই।

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক অদ্ভুত মুহূর্তে, সেই সাল তারিখ এখন আমার স্মরণে নেই। তবু এটা পবিষ্কার মনে আছে, বই মেলায় কোনও এক ধুলো ওড়াউড়িব সন্ধ্যায় স্বর্গত অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলা যায সেদিনই আমি একজন সাহিত্য ও শিল্পের চলমান কিংবদন্তীকে প্রথম আবিষ্কার করলাম, শ্রদ্ধায অবনত হয়ে গেল আমাব মাথা। এমন একজন দুবন্ত সব্যসাচী যে কিনা দশভুজা হযে সাহিত্য শিল্প চলচ্চিত্রেব ক্ষেত্রে সাবলীল ভাবে বিচরণ করেন।

কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপাব লক্ষ্য করলাম, পূর্ণেন্দুদা অনেক আগেই আমার নাম শুনেছেন. শুধু তাই নয়, আমার সম্বন্ধে ভীষণ আশাবাদীও। এর পর থেকে আমার প্রতি পূর্ণেন্দুদার আগ্রহ বাডতে থাকে, আর আমার পূর্ণেন্দুদার প্রতি।

পূর্ণেন্দুদা অসুস্থ হয়েছেন শুনে আমি একদিন এস. এস. কে. এম-এর উডবার্ন ওয়ার্ডে দেখতে গেলাম। তখন সবে পূর্ণেন্দুদাকে ক্যালকাটা হস্‌পিটাল থেকে মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিয়ে এলেন এই এস. এস কে এম-এ। তার কয়েক দিন পরেই আমি গেছি, দেখলাম বেডে টানটান হয়ে বসে সামনে একটা জল-চৌকির উপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে কবিতা লিখে যাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম উনি সাবাদিন এই-ই করেন। হয় লিখছেন নয় ছবি আঁকছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম বেডে এসেও আপনি একটু বিশ্রাম নেবেন না? একটা কৌটো থেকে খুলে নাটিস্ দিলেন আমাকে আর পাশে বসেথাকা শ্রদ্ধেয় শিল্পী অনুপ রায়কে। বললেন, 'সুব্রত তুই তো দেখেছিস, আমি কাজ না করে একদম থাকতে পারি না'।

কথাটা সত্যি, পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে দেখেছি কাজ না করতে পারলে যেন পূর্ণেন্দুদার অস্তিত্বই থাকে না। সব সময় কিছু না কিছু করেই চলেছেন, হয় লিখছেন না হয় কোনও বই-এর কভার করছেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডাও

মারছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কাজ, যেটা কম্পালসারি ছিলই তা হল কাগজ কাটার কাঁচি দিয়ে নিজের চুল কেটে কেটে সমান করা।

সমরেশ বসুর কাগজ 'মহানগরে' কাজ করাকালীন আনন্দবাজারে প্রায়ই আসতে হত, আনন্দবাজার রবিবাসরীয় সম্পাদক রমাপদ চৌধুরীর আগ্রহে পূজা-সংখ্যা আনন্দবাজারে আমাকে তখন কিছু কিছু কাজ করতে হত। সেই সুবাদেই এসে পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে খানিকটা আড্ডা মেরে যেতাম। কাজ নিয়ে কথাবার্তা হত। তিনি কী ভাবছেন, কী করতে আগ্রহী, যে সব ভাবনা চিন্তা মাথার মধ্যে জমাট বেঁধে আছে তা আমার কাছে ব্যক্ত করতেন। আমি উৎসাহ প্রকাশ করতাম। প্রবীনের সঙ্গে নবীনের নিবিড় সম্পর্ক আরও ঘনীভূত হল। তখনই একটা নতুন কাগজ করার পরিকল্পনার কথা বললেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হবে এ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন আমি চোখ জুড়ে স্বপ্ন ও বুকভরা উৎসাহ নিয়ে 'মহানগরে' নতুন নতুন উদ্ভাবনীতে ব্যস্ত। তবুও আমি রাজি হয়ে গেলাম, এমন একটা লোকের সঙ্গে কাজ করা কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়।

এক রকম তাঁর সাগ্রহ উৎসাহেই আমি 'প্রতিক্ষণে' এলাম, টানা চার বছর কেটেছে নানা সুখ দুঃখে, কাজে কর্মে, আলাপ আলোচনায়, আড্ডায়। একটা গোটা পরিবারের মতই হয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

পূর্ণেন্দুদাব কাছ থেকে কাজের ব্যাপারে বহু উৎসাহ পেয়েছি, নতুন ধরণের কাজ করার আস্বাদ পেয়েছি। সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সঞ্চয় করেছি সেটা হল সাহস। আমাদের উৎসাহ দেওয়ার ধরণটা ছিল তাঁর একটু অন্য ধরণের। 'প্রতিক্ষণ' ম্যাগাজিন ছাড়াও একটা পাবলিকেশনও করেছিল। জীবনানন্দ দাশের ফ্যাক্‌সিমিলি 'রূপসী বাংলা'ই হল প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনের প্রথম বই। আর এ বই-এর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ-টাই করেছিলেন পূর্ণেন্দুদা নিজে। প্রতিক্ষণের কর্ণধার প্রিয়ব্রত দেব, তাঁকে বলা হল, সুব্রত রাজি হলে, আমি এই ফ্যাক্‌সিমিলি নিয়ে লড়ে যেতে পারি।

তার পর শুরু হল কর্মকাণ্ড। জীবনানন্দের হাতের লেখার ব্রোমাইড চেক্‌আপ করা, ফিনিস করা। একটা প্রেস থেকে বিদ্যাসাগরীয় টাইপ পছন্দ করে প্রিন্ট নিয়ে, তার ভাঙ্গা টাইপগুলোকে টাচ্ আপ করে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সামনে বুক ফেয়ার, অতএব কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আমাদের এমনও হয়েছিল কাঁকুড়গাছিতে হেডওয়ের স্ক্যানিং সেক্‌সনে টেবিলে বসে আমি এক দিকে পাতা চেক্ আপ করছি, পূর্ণেন্দুদা প্রিফেস্ পেজের জন্য তুলি কালি দিয়ে নকৃশি কাঁথার আদলে ইলাস্ট্রেশন করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দুদা সুভো ঠাকুরের কাছ থেকে বেছে পুরান কাঁথার একটা ছবিও তুলে ফেলেছেন সোমনাথকে দিয়ে, কভারে ব্যবহার করবেন বলে।

শেষ অবধি বইটা যখন বেরুল, দেখা গেল সবাইকে চমকে দেওয়ার মতই

একটা প্রোডাকশন। এখনও বইটা মাঝে মধ্যে উল্টে-পাল্টে দেখি। এর পর পূর্ণেন্দুদার আগ্রহে বহু বই প্রতিক্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমি সে সমস্ত বই-এর তাঁর নানাবিধ কাজের সঙ্গী ছিলাম। তার মধ্যে রাম রাবণের ছড়ার বইটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেবারেও প্রিয়বাবুর তাড়া। সামনে বুক ফেয়ার, নানান কাজ নিয়ে তখন ব্যস্ত পূর্ণেন্দুদা, ছড়ার বইটিও তাঁর নিজেরই লেখা। প্রথমে ঠিক ছিল বইটির কাজ উনি নিজেই করবেন। আমরাও তখন ভীষণ ব্যস্ত অন্য সব বই-এর কাজকর্ম নিয়ে। ঠিক্ সেই মুহূর্তেই পূর্ণেন্দুদা একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করলেন, তিন জনে মিলেই এ বই-এর ছবি আঁকার কাজটা সম্পন্ন করা হবে। পূর্ণেন্দুদা নিজে, আমি আর যুধাজিৎ সেনগুপ্ত।

তিন জন তিন রকম ভাবে কাজ করলাম, পূর্ণেন্দুদা কালো কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে ইলাস্ট্রেশন করলেন, আমি আর যুধাজিৎ করলাম যথাক্রমে পেন ও ক্রোকুইলে। তাই তো এই বইটির প্রিফেসে তিনি লিখেছেন হারি জিতি নাহি লাজ, তিনে মিলে কারুকাজ। এ বইটিও অসাধারণ হয়েছিল।

বই প্রকাশনার সঙ্গে সম্পর্কিত এমন বহু ঘটনা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। একবার এক তরুণ কবিকে অসাধারণ একটা প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুদার মাথা এবং চোখ যে সর্বক্ষণ কাজ করে চলে এটাও তার একটা প্রমাণ।

আমি পূর্ণেন্দুদার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে কী একটা কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। পূর্ণেন্দুদা যথারীতি কাঁচি দিয়ে চুল কেটে চলেছেন। সামনে সাদা কাগজ বিছান, কাঁচা পাকা চুল তার উপর পড়তে পড়তে অদ্ভুত একটা জঙ্গলা প্যাটার্ন তৈরি হয়েছিল। পরে সেটাকে লাইন নেগেটিভ করে পি এন এস স্টুডিও কে দিয়ে একটা রিভার্স প্রিন্ট আনিয়ে নিয়ে ডিজাইনটার কোনও একটা ফাঁক দেখে সেখানে বইটির নাম অঙ্কন করে দিয়েছিলেন। অপূর্ব দেখতে হয়েছিল বইটি।

মানুষটা স্বভাবে দুরন্ত হলে কী হবে, অসম্ভব ভীতু প্রকৃতির ছিলেন।

একবার আমেরিকার কোনও এক সাহিত্যসভায় যোগ দেবার জন্য পূর্ণেন্দুদাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। সেখানেও দেখা গেছে বিদেশের রাস্তাঘাট সম্পর্কে বা প্লেনে চড়ার ব্যাপারে তাঁর ভীষণ ভীতি, সামনে উপস্থিত হওয়া প্রায় সবাইকে তিনি জনে জনে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। পরে অবশ্য একজনকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সব বিষয়েই ছিল তার যথাযথ আগ্রহ। অসম্ভব রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন, পুরান কলকাতার ব্যাপারেও ছিল তাঁর অসামান্য আগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ এবং কলকাতার নানান বিষয়ে বহু গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

তাঁর বহুমুখী সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে বিস্তার একটা নিজস্ব আঙ্গিক। আমরা যেটাকে ঘরানা বলি, সে ঘরানা কিন্তু পূর্ণেন্দুদার কাজের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে লক্ষণীয়। কী মলাট, কী অলংকরণে, এমনকি কবিতা বা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও।

ছিয়াশিতে আমি পাকাপাকিভাবে আনন্দবাজারে যোগ দিই। ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। কোথাও না কোথাও পূর্ণেন্দুদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। কলকাতা বইমেলা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিদের পীঠস্থান, আত্মার উৎসব, সেই পীঠস্থানে কোনও না কোনও ভাবে সবাইকে টানে। সে টানে টানেই চলে যাই। সেখানেও দেখেছি 'পরিচয়ের'-এর স্টলে তুলি কালি দিয়ে ছবি এঁকে অল্প টাকার বিনিময়ে সেগুলো বিক্রি করে চলেছেন, নয় তো প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনের স্টলে সবার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন।

চুরাশিতে একবার পূর্ণেন্দুদা প্রদর্শনী করে ছিলেন গোর্কি সদনে। বিষয় ছিল 'হস্তশিল্প'। ঢালাইয়ের কাঠ, চট, রঙিন কাপড়, তলতা বাঁশ, এই সমস্ত মেটিরিয়াল দিয়ে অসম্ভব সব সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে ঢালাইয়ের কাঠ চিজেল দিয়ে কেটে নিজস্ব ঘরানার যে সমস্ত নকশা তৈরি করে ছিলেন তা দেখতে অদ্ভুত সুন্দর হয়েছিল। আমার যে খুব পছন্দ হয়েছিল সেটা পূর্ণেন্দুদা বুঝতে পেরে তার থেকে দুটো কাজ আমার বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। সে কাজ দুটোই আজ আমার কাছে অম্লান স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল চিরদিনের মত।

'স্বর্গের অনতি দূরে শুয়ে আছে সবুজ স্ট্রেচার' উডবার্ন ওয়ার্ডের বেডে বসে এই কবিতার জন্ম দিয়েছেন চিরকালের আশাবাদী এই লোকটি। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছিলেন কি না জানি না, দ্রুত বহু কবিতা লিখে ফেলেছেন। বহু ছবি এঁকে ফেলেছেন। সম্ভবত মৃত্যুকে নিয়ে এগুলোই বোধ হয় তাঁর শেষ স্বপ্ন, শেষ রচনা।
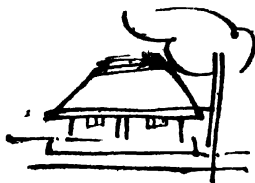
বাংলা প্রকাশন-শিল্প ও পূর্ণেন্দু পত্রী

রমাপ্রসাদ দত্ত

চারপাশে গণ্ডী কেটে যাঁরা নিজেদের কাজের সাফাই গাইতে অভ্যস্ত তাঁদের দলভুক্ত নন এমন মানুষ আজকের পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ কমছে। পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন তেমনই একজন। জীবনে খ্যাতি, সম্মান, অর্থ যা পেয়েছেন সবই ঘনিষ্ঠ সংগ্রাম ও সাধনায় অর্জিত। ফাঁকি দিয়ে বা চালাকি করে তিনি কখনও পা তোলেন নি, পা ফেলেননি। বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু মনের গঠন অন্যরকম ছিল বৈকি। সেই মনটাই আসল। কাকা নিকুঞ্জ পত্রী হয়ত আবছা ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন সেই মনটাকে। তাই তাঁর ডাকে কিংবা প্রেরণায় পূর্ণেন্দু গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলেন। গ্রামের জীবনে নিশ্চিন্ততা ছিল, সুখ ছিল, শান্তি ছিল। দিনগুলো যেভাবে হোক ভেসে যেতে বাধা ছিল না। কিন্তু ঐ জীবন পূর্ণেন্দুকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তাই বেরিয়ে পড়ার প্রথম সুযোগ নিতে ভুল করেননি।

ছাপা শব্দের জগৎ পূর্ণেন্দুকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল বোধহয় এতদিন। কলকাতায় এসে ছাপাখানার সঙ্গে অন্যভাবে পরিচয়ের সুযোগ মিলল। শিক্ষানবিশী-পর্ব শুরু হল। সীমাহীন আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে পূর্ণেন্দু ছাপার কাজ দেখতে লাগলেন। চটপট জেনে গেলেন নানান রীতি পদ্ধতি। এরপর সুযোগ এল একটু আধটু নকশা করার, পাতা সাজানর। পত্রপত্রিকার অঙ্গসজ্জার ব্যাপারটা আয়ত্ত হয়ে গেল কিছুটা। পাশাপাশি চলতে থাকল লেখালেখি। নিকুঞ্জবাবু অন্যদের কাছে শুনতে পেলেন ভাইপোর প্রশংসা। ছেলেটির চোখ আছে, মাথা আছে, কাজ করার আগ্রহ আছে।

পূর্ণেন্দুর আর পিছনে তাকাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন শুধু এগিয়ে চলার পালা। পরিচয় হতে লাগল নানা জনের সঙ্গে। কাজের তারিফ মিলতে লাগল। কলকাতা পূর্ণেন্দুকে আপন করে নিল। পূর্ণেন্দুও কলকাতার প্রেমে পড়লেন। সেই প্রেম সারাজীবন অটুট ছিল। কলকাতা শহরে রয়েছে অনেক কাজ, অনেকরকম আকর্ষণ। কলকাতা তাঁকে শিক্ষা দিল, দীক্ষা দিল, প্রেরণা দিল। আর্ট কলেজ শেষ করেননি। পূর্ণেন্দু সারাজীবনই অবশ্য স্বীকার করেছেন, তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক। আত্মশিক্ষাই বড় শিক্ষা। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, যিনি স্বশিক্ষিত তিনিই সুশিক্ষিত। পূর্ণেন্দুর আত্মশিক্ষা তাঁকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। কলম এবং তুলি, রেখা এবং লেখা—দুটি ক্ষেত্রেই তিনি নিজের পথ নিজে তৈরি করে নিয়েছেন। চির-অস্থির এবং চির-অনুসন্ধিৎসু মনই এগিয়ে যেতে সাহায্য

করে শিল্পীকে, স্রষ্টাকে। পূর্ণেন্দুর মধ্যে এ দুটি জিনিসই ছিল প্রবলভাবে।

শ্রীমানী মার্কেট ছাড়িয়ে বিবেকানন্দ রোডের মোড় পেরিয়ে প্রায় হেদুয়া পর্যন্ত তখন বিস্তৃত ছিল বইপাড়া। বইয়ের জগতের মধ্যে পূর্ণেন্দু নিজেকে অন্যভাবে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন। নানান্ আকারের নানা ধরনের বই চারপাশে ছড়ান। কাল কাল অক্ষরের মধ্যে ধরা আছে জ্ঞান-চিন্তা-মনীষা। গ্রামে থাকার সময় বইয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল শুধু পড়ার জন্য। শহরে এসে দেখলেন বই তৈরির বিভিন্ন পর্ব, কীভাবে লেখকের পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়ে বইয়ে রূপ নেয়। বইয়ের অঙ্গসজ্জা প্রচ্ছদপট এসব তাঁকে টানতে লাগল। কলেজ স্ট্রিটের নতুন পুরান বইপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে বড় বিস্ময়ে মনে হত, এত কিছু লেখা হয়ে গেছে !

এর মধ্যে পূর্ণেন্দু জেনে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের নাম। সিগনেট বুক শপ তখন বাংলা প্রকাশনা জগতে এনেছে নতুন ভাবনার জোয়ার। কর্ণধার দিলীপ-কুমার গুপ্ত রুচিসম্মত প্রকাশন পারিপাট্য চান। বনেদী পরিবারের অভিজাত রুচি; মানুষ। সত্যজিৎ রায় তখন তাঁর সহযোগী। বিজ্ঞাপন কোম্পানি ডি জি কিমারে কাজ করেন। পাশাপাশি বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদপট আঁকার কাজ। ঐ সময়ে 'পথের পাঁচালী'র কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ছবি আঁকার সময় 'পথের পাঁচালী'র চলচ্চিত্রায়নের ভাবনা মাথায় আসে সত্যজিতের। পূর্ণেন্দু দেখলেন মুগ্ধ চোখে সত্যজিৎ রায়ের গ্রন্থসজ্জার কাজ। অসাধারণ লেটারিং, ড্রইং এবং বর্ণবিন্যাস। অঙ্গসজ্জার গুণে বই অন্য চেহারা পায়—এটা বুঝেছিলেন। সিগনেটের বই আর অন্য প্রকাশনীর বই পাশাপাশি রেখে দেখেছিলেন। এই সময়ে পূর্ণেন্দুও দুচারটে বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ আঁকার দায়িত্ব পেলেন কার কার কাছে। অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করলেন।. আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকল। ভাল কাজের খোঁজ যাঁরা করতেন তাঁদের অনেকের কাছে পৌঁছাল পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় পূর্ণেন্দু পত্রীর নিত্য আসা যাওয়া শুরু হল বইয়ের প্রচ্ছদপট শিল্পী ও অঙ্গসজ্জাকর হিসেবে।

কাটিং-পেস্টিং-লেটারিং-এর এই বাঁধা জগতে বসবাসে এখন যাঁরা অভ্যস্ত, যেসব মগজ বা মেধাহীন প্রচ্ছদপট-আঁকিয়ে এখন বইপাড়ায় করেকম্মে খাচ্ছে তারা এখন ভাবতেই পারবে না। পূর্বসূরীদের কত শ্রম ও নিষ্ঠায় কাজ করতে হত। নকশা করতে হত নিখুঁতভাবে। খুব ভাল ব্লক নির্মাতারা তখন ছিলেন। মুদ্রক হিসেবে দারুণ সুনাম ছিল অনেকের। বাঁধাই-এর কাজ হত অতি যত্নে। বই তৈরির প্রতিটি ক্ষেত্রে সুযোগ্য অধিকারীরা ছিলেন। এখনকার মত অর্ধশিক্ষিত, আনাড়ি বা পয়সাসর্বস্ব মানুষরা তখন প্রকাশন শিল্পকে গ্রাস করতে পারেনি। তখন বইয়ের দাম কম ছিল, প্রকাশন ব্যয়ও আজকের তুলনায় অনেক কম। অতি সামান্য সম্মান দক্ষিণা পেয়ে মলাট এঁকে দিয়েছেন পূর্ণেন্দু। কখনও টাকা পাবার আশ্বাস মিলেছে, টাকার দেখা পাননি। মনে মনে হেসেছেন। হতাশ হননি, কোনরকম

বিরক্তি প্রকাশ করেননি। ভেবেছেন 'কেউ কেউ পয়সা দেবে না, অনেকেই দেবে —যারা দেবে না তাদের নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে আছে।'

এই মানসিকতার জন্যই তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। আত্মশিক্ষক পূর্ণেন্দু আত্মবিশ্বাসও অর্জন করেছিলেন। সেজন্য আবেগবর্জিত অর্থলোভী প্রচ্ছদপট আঁকিয়ে হতে চাননি কখনও। বরং বলতে চেয়েছেন এই যে বইয়ের জগৎ ছাপা শব্দের জগৎ এখানে আমিও ভাসিয়ে দেব আমার কাগজের নৌকা। আমার ভাবনাকে ধরে রাখব রেখায় লেখায়। যে স্রোত বয়ে চলেছে আমি তার সঙ্গে মিশে যাব। বলব 'ভাসো আমার ভেলা।' আঁকাজোকার পাশাপাশি লেখালেখি চলেছে পুরোদমে।

উল্টোরথ পত্রিকার যে সময় খুব নাম, তখন তারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উপন্যাস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। প্রতিযোগিতায় তিনজন পুরস্কৃত হলেন। প্রথম মতি নন্দী, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রী, তৃতীয় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। চার দশক আগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণেন্দু পত্রীর উপন্যাসটির নাম ছিল 'দাঁড়ের ময়না।' শোনা যায় ঐ উপন্যাসটির নাম ছাপার ভুলে বামপন্থী কাগজে বেরয়—'দাঁতের ময়লা।' ঐ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনজন লেখক এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। পরবর্তীকালে তিনজনেই যশস্বী হয়েছেন। পূর্ণেন্দু ঔপন্যাসিক হতে পারেননি। কিন্তু অন্য দুজন মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি দাঁড়ান তিন তরুণ লেখকের ছবি পুরান উল্টোরথের পাতা ওল্টালে এখনও দেখা যাবে। এই কলমী শক্তির অধিকারী হলেও পূর্ণেন্দু লেখক হিসেবে আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। কোন সময়েই তাঁর কোন বইয়ের ভাল বিক্রি ছিল না। অথচ তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের আকর্ষণে অন্যের অনেক বইয়ের কাটতি বেড়েছে। বইপাড়ার অতিআপনজন হলেও সে কারণে অনেকে পূর্ণেন্দু পত্রীর বই ছাপতে রাজি হতেন না। ভাবতেন বই ভাল হলেও বিক্রি না হলে সবটাই ঝুঁকি হয়ে যাবে। তবে কেউ কেউ ঝুঁকি স্বীকার করেও তাঁর বই প্রকাশ করেছেন। অতি মন্থর গতিতে বিক্রি হয়েছে। প্রকাশক বুঝেছেন, এ বই প্রকাশক হিসেবে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়েছে। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা ইতিহাসভাবনা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে পূর্ণেন্দুর ভাবনা এভাবেই ছড়িয়ে আছে। তবে প্রায় কোন বইয়েরই দ্বিতীয় মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়নি।

প্রচ্ছদপট শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল প্রবন্ধ বই এবং কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে। এখনকার অধিকাংশ আঁকিয়ে চালাকির মাধ্যমে মাত করতে চায়। তারা ভাবতেই পারবে না, পূর্ণেন্দু পত্রী কিভাবে শুধু অক্ষরের খেলা দেখিয়ে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট তৈরি করতেন। বাংলা অক্ষরের বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে তেমনি সীমাবদ্ধতাও। এর মধ্যেই কাজ করেছেন পূর্ণেন্দু। সত্যজিৎ অবশ্যই দিশারী। পূর্ণেন্দুও বইয়ের মেজাজ ও চরিত্রকে তুলে এনেছেন মলাটে শুধু অক্ষরের মাধ্যমে,

রঙের নির্দিষ্ট মাত্রায়। তাঁর মাথায় খেলা করেছে সব সময় দুটি বর্ণ—একটি বর্ণ হল অক্ষর, অন্য বর্ণটি হল রঙ। বর্ণ বিন্যাসের পারিপাট্যের গুণে প্রচ্ছদ পাঠকের মন কেড়েছে, তাঁদের ভাবিয়েছে। বাংলা প্রকাশন জগৎ গর্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে বিদেশী বইয়ের প্রচ্ছদ ও প্রকাশনের পাশাপাশি।

পূর্ণেন্দু স্বীকার করতেন ড্রইং জানতেন না বলে। কিন্তু তাঁর মন ড্রইং জানত বৈকি। যিনি অত চমৎকারভাবে ক্যালিগ্রাফি বা অক্ষর অঙ্কন আয়ত্ত করেছিলেন তাকে নতুনতর রূপ দিয়েছিলেন। ছাপার পর কোন ছবি কোন অক্ষর কেমন রূপ নেবে—এই পূর্বানুমান তাঁকে শিল্পীতে পরিণত করেছিল। গতানুগতিকতার জাবর কাটতে অভ্যস্ত ছিলেন না কোন সময়েই। একটু অন্যরকম করে ভাবতে হবে। একই জিনিস একটু ঘুরিয়ে দেখতে পারলেই তা অন্য মাত্রা পায়। এই নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি চালিয়েছেন প্রকাশন জগতে। সুযোগও পেয়েছিলেন। অনেকে বলেন, মলাটই ললাট। প্রচ্ছদপটই স্থির করে দেয় বইয়ের ভবিষ্যৎ। পূর্ণেন্দুর আঁকা প্রচ্ছদ অনেক বইয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেছে।

সব প্রকাশকের কাছে সমান মর্যাদা বা সমাদর মেলেনি। একেকজনের মানসিকতা একেকরকম। দিলীপকুমার গুপ্ত সত্যজিৎ রায়ের যুগলবন্দী সবসময় সম্ভব ছিল না গ্রন্থজগতে। তবে কোন কোন প্রকাশকের ব্যবহার তাঁকে উৎসাহিত করেছে। এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সময়ে প্রথম অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি শুরু হয়েছে, সে সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রীকে দেখা গেছে আনন্দমেলার ঘরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাশে বসে কাজ করতে। তখন ও ঐ কাগজে আলাদাভাবে আর্ট ডিপার্টমেন্ট বলে কিছু ছিল না। শিল্পী বলতে গোটা অফিসে ছিলেন তিনজন। উপরে চারতলায় বিজ্ঞাপন দপ্তরে বসতেন অহিভূষণ মালিক, সামনে থাকত একটা জল ভর্তি গামলা। কদাচিৎ ছবি আঁকতেন, পড়তেন, ছবি দেখতেন, রুচিশীল মানুষ। চমৎকার লিখতেন ইংরেজি এবং বাংলা। কলা সমালোচনা করতেন আনন্দবাজারে। তিনতলায় ছিলেন ম্যাপ আঁকিয়ে অর্ধেন্দু দত্ত আর ব্যঙ্গচিত্রী চণ্ডী লাহিড়ী। পূর্ণেন্দু পত্রীকে এসময় প্রধান শিল্প নির্দেশকের পদ দিয়ে তাঁর সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হল বিপুল গুহ আর অসিত পালকে। বিপুল গুহ শিল্প-নির্দেশক হবার পর অহিভূষণ মালিককে মর্যাদার সঙ্গে নিয়ে যান বিজ্ঞাপন দপ্তর থেকে শিল্পীদের বিভাগে। খবরের কাগজের বিভিন্ন পত্রিকার দাবি অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে পূর্ণেন্দুকে। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে তরুণদের পাশাপাশি।

ঐ সময়ে আনন্দ পাবলিশার্সের প্রচুর কাজ করতে হয়েছে। বইয়ের মলাট, ক্যাটালগের নকশা, শুভেচ্ছাপত্র ইত্যাদি। সেসময় আনন্দ পাবলিশার্সে ফণিভূষণ দেব মশায়ের আমল। পূর্ণেন্দু একের পর এক কাজ করতেন। অধিকাংশ বই ছাপা হত ব্লক করে লেটার প্রেসে। অফসেট পদ্ধতিতে প্রচ্ছদপট ছাপা শুরু হয় অনেক

পরে, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর আমলে।

পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে নানাকারণে পূর্ণেন্দুর সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়েছিল।

এরপরে আমরা তাঁকে দেখেছি 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকাব সঙ্গে। সেই পত্রিকার প্রকাশন বিভাগ শুরু হতে পূর্ণেন্দু নানাবকম কাজ করেছেন। অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী ছিলেন, সংস্থার পরিচালক প্রিয়ব্রত দেব দিয়েছিলেন তাঁকে সে ব্যাপাবে অবাধ ছাডপত্র। পূর্ণেন্দুব শেষপর্বের ভাবনা-চিন্তা প্রতিক্ষণ প্রকাশনীব বইযেব মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এ মুখার্জি কোম্পানিব সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন পূর্ণেন্দু। 'বই নয়, বিষয় ছাপি' এমন শ্লোগানও দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মুখার্জি কোম্পানির যাঁবা নতুন কর্ণধার হয়েছিলেন তাঁদের ব্যবসা করার সদিচ্ছা ও সততা না থাকায় সব ভেস্তে গিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যে। পূর্ণেন্দু যেভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন তা ঠিক মত যত্ন পায়নি। শেষ দিকে আব কোন বড ধরনের প্রকাশন-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি। শরীব এবং মন কোনটিই অনুকূলে ছিল না।

কিন্তু মলাট আঁকতে হযেছে। কতজন বাডিতে গিয়ে আঁকিয়ে এনেছেন। একসময় প্রকাশকেব বা স্ব-ব্যযে গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী লেখকেব সামর্থ্যেব কথা ভেবে বা তাঁদের সাশ্রয়ের জন্যে ভেবেচিন্তে কম খরচে ভাল মলাটের নকশা করে দিয়েছেন। পরে অফসেট যুগেব প্রাবল্যে যত খুশি বঙ ছড়িয়ে ছবি এঁকেছেন। ছাপা হয়েছে। স্বীকাব করেছেন, অফসেটের ছাপা ভাল না হলে তা বিড়ির লেবেল কিংবা ধুপের প্যাকেট হয়ে যায়। লেটার প্রেসের ছাপা এখনও তুলনামূলক ভাবে ভাল। তবে অফসেটের সম্ভাবনা প্রচুর, যদি যন্ত্রকে ভালভাবে জেনে নিয়ে ছাপার কাজ হয় তাহলে ভাল ফল মিলবে, মিলতে বাধ্য। পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাবার সপক্ষে ছিলেন বরাবর।

ছাপার জগৎ সম্পর্কে তাঁর অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছিলাম শ্রীপান্থর লেখা 'যখন ছাপাখানা এল' বইটির প্রাক্-প্রকাশ ভাবনা দেখে। লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজারে। গ্রন্থাকারে প্রকাশে আগ্রহী হন বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের পরিমল চন্দ্র। বইটির প্রচ্ছদপটের নকশাটা ছিল অভিনব। একটা নকশা করে তার ব্লক তৈরি হয়েছিল। সেই ব্লকের ফোটোগ্রাফ নিয়ে তা ব্লক করে প্রচ্ছদ ছাপা হয়। অসাধারণ কাজ। স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও বলেছিলেন, 'খুব ভাল কাজ।' তখন অফসেট যুগ নয়। লেটার প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। কিংবা বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৭৮ সালে যে প্রদর্শনী মেলার আয়োজন করেছিল ভিক্টোরিয়ার পাশের মাঠে, সে সময়েও পূর্ণেন্দু পত্রীর ভাবনার নানান পরিচয় আমরা পেয়েছি। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' নামে একটি বই বেরিয়েছিল। পূর্ণেন্দু পত্রীর উপর ছিল অঙ্গসজ্জার দায়িত্ব। বাংলা প্রকাশনাব

জগতের প্রতি পূর্ণেন্দুর শ্রদ্ধার আগ্রহ ও ভালবাসার পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই বইটির মধ্যে।

প্রায় চার যুগ দাপটের সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া বা বাংলা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। খবরের কাগজের কাজ, আঁকাজোকা, সম্পাদনার পাশাপাশি গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রে পালা বদলের পালা ঘটাতে সক্রিয় ও সার্থক ভূমিকা নিয়েছেন। বইপাড়ার যথাযথ ইতিহাস লেখা হয়নি। আগামী দিনে কেউ-না কেউ হয়ত, লিখবেন। সে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় থাকবে পূর্ণেন্দু পত্রীর নামে, তাঁর অবদান বা ভূমিকা সম্পর্কে। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু শ্রদ্ধাশীল মানুষ নিজেদের ঐতিহ্যকে খুঁজতে আগ্রহী সব সময়েই। পূর্ণেন্দুর সেই সতত অনুসন্ধিৎসু মন ছিল, সেই আগ্রহ নিয়ে কলকাতার অতীত জানতে চেয়েছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তরপুরুষ একই রকম আগ্রহ নিয়ে শিকড়ের সন্ধানে আগ্রহী হয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর নতুনতর পরিচয় জানবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা স্মরণ করবে। লেখক, চিত্রকর হিসেবে একদিন যিনি বাংলা প্রকাশন জগতের আপনজন ছিলেন তিনি তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন উত্তরপুরুষদের কাছে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আর তা আছে বলেই বলতে পারি, পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী বাংলা প্রকাশন জগতের ইতিহাসে এমন এক কুশীলব, যাঁকে বাদ দিয়ে এ শিল্পের ইতিহাস রচনা অসম্ভব।

বাগনান অঞ্চলে শিল্প-সাহিত্য চর্চায় পূর্ণেন্দুদার প্রভাব

খায়রুল বাসার

১৯৯৫-এ বাগনানের একমাত্র নিয়মিত পাক্ষিক পত্রিকা "আলেয়া"-র বাগনান বিশেষ সংখ্যায় লিখেছিলাম, "পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সংস্কৃতি পরিষদের সূত্রে। কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকার, লম্বা ফর্সা মিহি কণ্ঠস্বর, বাচনে মুহুর্মুহু বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক, প্রতিভাবান, তপস্বীসুলভ একাগ্রতা, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী, যাঁর শিল্পকৃতি বৈদগ্ধ প্রশ্নাতীত। ১৯৫৪ সাল থেকে এই হল সংক্ষেপে পূর্ণেন্দু পত্রী। চুলচেরা বিচারে বাগনানবাসী না হয়েও যিনি বাগনানের উজ্জ্বলতম সাংস্কৃতিক নক্ষত্র।"

সেদিন ভাবিনি, তার পরেও ভাবিনি, এ বছর '৯৭ ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ভাবিনি —এমন কি খবরের কাগজে তাঁর পিজি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পড়েও ভাবিনি, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অন্য কিছু লিখতে হবে। হাঁপানি তো তাঁর ছিলই। সেবারে অনেকদিন পরে "প্রতিক্ষণ" অফিসে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, চেয়ারে দুপা গুটিয়ে আপন মনে বসে মগ্ন হয়ে পাঠ করছেন একটি ইংরেজী পত্রিকা। জেনেছিলাম, মনযোগের বিষয়টি ছিল হাঁপানি রোগ সম্পর্কিত একটি রচনা। ৯৩-এ সল্টলেকের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমার প্রথম উপন্যাস 'আতুর আসা যাওয়া'র প্রচ্ছদচিত্র আদায়ের মতলবে। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন। রোগটার বাড়াবাড়ি হয়েছে। কিন্তু যাঁর ব্যাধি তিনি তো পরাভব মানার ধারে কাছে নেই। তিনি মাথা উঁচু করে আছেন। তাঁর হাত কাজ করছে, মাথা কাজ করছে, মন কাজ করছে, এমন কি মুখও কাজ করছে ঠিক আগের মত। কেন তাঁর সম্পর্কে অকল্যাণের কথা মনে হবে! হয় নি। বরং এই ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ ভেবেছিলাম, 'বামাচরণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে বাগনানের মিষ্টি স্মৃতিরূপে এক বাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে আবার গিয়ে জ্বালাব, একটি মাত্র তুলির আঁচড়ে যেভাবে এঁকে দিয়েছিলেন একটা হরিণীর পিছু ফিরে তাকানর আদলে আমার 'আতুর আসা যাওয়া' উপন্যাসের প্রচ্ছদপট, সেইভাবে আমার তৃতীয় গল্প গ্রন্থ 'জীবনের মুখোমুখি'-র মোলায়েম ঢাকনাটা। ব্যাপারটা আর কিছু না। আমার মত লেখকের পক্ষে, চাই কি বাগনানের পক্ষেও, তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনেক বড়। কিন্তু বাগনানের পরিচিত জনদের তিনি আর পাত্তা দিতে চান না, এমনটা তো নয়। সাহিত্যের সুতো ধরে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছান, সে তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর কলকাতার সতীর্থ বন্ধু বান্ধবরা তো তাঁকে বাগনানের লোকই বলতেন, যদিও তাঁর 'দাঁড়ের ময়না' বা 'মহারাণী'

পড়লে বাগনানবাসীর বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি এঁকেছিলেন বাগনান ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণের একটা জনপদের ছবি, কি আদি যৌবনে, কি আদি প্রৌঢ়ত্বে তিনি যার কথা ভুলতে পারেন নি, তাঁর জন্মভূমি শ্যামপুর থানার নাকোল দেওড়া অঞ্চল। সাবাস।

কিশোর বয়স থেকেই তাঁর বাগনানের সঙ্গে সম্পর্ক। মুগকল্যাণ হাইস্কুলের ছাত্র হিসাবে প্রথম প্রথম কিছু না বুঝেই ছিলেন কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী কংগ্রেসী। পরে কানাইপুর সবুজ সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। নাম সবুজ সংঘ, আসলে লালের পাঠশালা। সেখান থেকেই 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-সমাজের অবদান' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে হাতে পেলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'। তখনও এতটাই কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ যে বন্ধু মহলে আস্ফালন, কমিউনিষ্টদের মিটিং-এ গিয়ে কিছুতেই নিজের হাতে পুরস্কার গ্রহণ করবেন না এবং উপরন্তু সুকান্তর কবিতা কবিতাই নয়, যেহেতু তার মধ্যে ছন্দ মেলে না। অচিরেই অবশ্য সবুজ সংঘ তাঁকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল। সুকান্ত হয়ে উঠলেন প্রিয় কবি, গদ্য কবিতা লেখায় সড়গড় হয়ে উঠলেন, পরিচিত হলেন একের পর এক শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, কবি সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখের সঙ্গে এবং আরও একজনের সঙ্গে। তাঁর নাম জ্ঞান চক্রবর্তী, পার্টির তরফে হাওড়া জেলার যাবতীয় সাংস্কৃতিক উদ্যোগের অধিনায়ক এবং অচিরোত্তরকালে বাগনানে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের মুখ্য রূপকার, যিনি আক্ষরিক অর্থে সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে সম্মেলন মঞ্চেই জীবন-উৎসর্গ করে বাগনানের মাটিতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কৃষক সম্মেলন সূত্রেই পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল বাগনানের অমল গাঙ্গুলি, অমর মান্না, বিভূতি ঘোষ, আলি আনসার, তারাপদ সাঁতরা (তখন কৃষক নেতা) প্রমুখ বাগনানের সমস্ত কমিউনিষ্ট নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে এবং তাঁর নিজের জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-নাট্য পরিচালক নিমাই সুর, শচীন ঘোষ, চিত্রশিল্পী নিতাই দাস, গায়ক-গণসঙ্গীত শিল্পী অভিনেতা হারাধন চট্টোপাধ্যায় (হারুদা), সঙ্গীত শিল্পী মন্টু ঘোষ, বাসন্তী ঘোষ প্রমুখ একগাদা সাংস্কৃতিক কর্মীর সঙ্গে। প্রতিষ্ঠিত হল, বাগনান সংস্কৃতি পরিষদ, পূর্ণেন্দু পত্রী যার সভাপতি এবং পরিষদের দেওয়াল পত্রিকার সম্পাদক পদে আমি। কানাইপুর সবুজ সংঘের সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রী স্বয়ং লিখেছেন, "গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ মিলিয়ে আমার যা কিছু লেখা, তার মধ্যে যদি কোন পাঠক খুঁজে পান মানুষের প্রতি বিশ্বাস, সভ্যতার আস্থা, যে কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যে কোন শোষনের বিরুদ্ধে ঘৃণা, তাহলে অকপটে স্বীকার করব, আমার চেতনার ভিতরে এই সব বৃহৎ উপলব্ধির বীজ বোনার কাজটা শুরু হয়েছিল ঐ সবুজ সংঘের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যুগে। অন্তরঙ্গতার সূত্রে।"*

* পূর্ণেন্দু পত্রীর মূল রচনাটি পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকপালদের মধ্যে অনেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়ান নি। পূর্ণেন্দুদা ছিলেন সেই সুপরিচিত ধারার একজন স্বনির্মিত অর্থাৎ Selfmade উত্তরসূরী। তাঁকে আলাপচারিতায় দেখার সুযোগ পেয়েছি। বহ্নিদীপ্ত রসবোধের দ্যুতি। অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে যেতে পারতেন কোন একটি বিষয়ের গভীরে। শ্রীমানী মার্কেটের বাসায় দেখেছি কর্মরত অবস্থায়। যেন যোগী অবধূত। চেয়ার নয়, টেবিল নয়, স্রেফ উবু হয়ে বা আধশোয়া অবস্থায় গাদাগুচ্ছের বইপত্র অঙ্কন সামগ্রীর মধ্যে এঁকে যাওয়া বা লিখে যাওয়া। হাতের কাজের মধ্যে ডুবে থাকার গভীরতা আমাদের মত লোকের পরিমাপ সাধ্য নয়। বিবাহিত জীবনে অন্যত্র বাসা নিয়েছিলেন। সেখানে মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' চলচ্চিত্রের প্রচার লিপি রচনার কাজে বাগনানের সঙ্গী শিল্পী নিতাই দাসকে কিছু দিনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। নিতাইদা নিজেও খুব পরিশ্রমী। সেই নিতাইদাকেও বলতে হয়েছে ওর শরিশ্রমের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। রাত তিনটে পর্যন্ত দিনের পর দিন কাজ করতেন। আর পড়াশুনা, শ্রীমানী মার্কেটের বাসাতেই দেখেছি। খাবার দাবারে নয়, পয়সা খরচ করতেন দেশ বিদেশের দামী দামী বইপত্র কেনায়। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে যে নয়, তাঁর অজস্র প্রবন্ধ নিবন্ধে সে-প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।

বাগনানে সেবারে প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে এসে খুব জোরালো ভাষায় উদীয়মান কবি লেখকদের উদ্দেশে নিরন্তর অধ্যয়নের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অধ্যয়নের সুফল সূত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা গদ্যকার প্রাবন্ধিক। সম্ভবত গল্প-উপন্যাসে নয়, তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর গদ্য ও প্রবন্ধ কুশলতার জন্যে। তাঁর প্রবন্ধ রচনার শৈলী সাধারণ ও সুধী পাঠকের কাছে সমান আকর্ষণীয়। এক সময় পাঁচের দশকে তিনি নতুন সাহিত্য পত্রিকায় 'অন্য গ্রাম অন্য প্রাণ' শিরোনামে কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টাজ, লিখতেন। সে অন্য স্বাদের রচনা, উত্তরকালে তাঁর নিজের বা অন্যের হাতে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। হওয়া উচিত ছিল।

গ্রামের সন্তান কেমন ভাবে নগর-চেতনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন পূর্ণেন্দু পত্রী তার সার্থক দৃষ্টান্ত এবং অনুকরণীয়। তাঁর মধ্যে গ্রাম্যতার নেতিবাচক ত্রুটির লেশমাত্র ছিল না। আবার নগর চেতনা মানে তাঁর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন পারিপাট্যই নয়; নিরন্তর অনুশীলন পরিশীলনের মধ্য দিয়ে awareness এর বৃত্তটাকে বাড়িয়ে যাওয়ার সাধনা। অধ্যয়ন, মনন, সৃজন—এই তিনের বিরল এক সমন্বয়। গুণী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি তিনি ভারতের দশ জন সেরা কমার্শিয়াল আর্টিস্টের মধ্যে একজন। তাঁর রচিত প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য কারুকর্মের যতটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছি তা থেকে বারে বারে মনে হয়েছে—তাঁর অধ্যয়ন মনন সৃজন সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পকলার এই বিশেষ অঙ্গনে। তাঁর

সমকালের সব কবিদের মধ্যে তিনি সেরা নন। একই কথা বলা যায় গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রের ব্যাপারে। কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রী, বাগনানের পূর্ণেন্দু, আমাদের পূর্ণেন্দুদা প্রবন্ধ প্রচ্ছদপট তথা কর্মাশিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে ছিলেন অনেকের উপরে। সাহিত্য শিল্পকলার অবিভাজ্যতায় বিশ্বাসী এবং এই দিক থেকে প্রবলভাবে, এমন কি তাঁর সমকালে প্রবলতম ভাবে রবীন্দ্রানুসারী মানুষটিকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নিয়ে যথাযথ শিরোপা দেওয়া তাই বুঝি খুবই কঠিন। এখন না বিশেষায়নের যুগ। এই যুগে তাঁর মত শিল্প সাহিত্য সাধকের যথাযথ মূল্যায়ন হয়ত অবহেলিত থেকে যাবে নিতান্ত দুরূহ বলেই।

পুনশ্চ ঃ পূর্ণেন্দুদার মৃত্যুতে বাগনান শোকমগ্ন হয় নি, এই সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। বাগনান এই রাজ্যের অনেক জনপদের মত হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণশক্তি। গত তিরিশ বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক স্নায়ুতন্ত্র যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। সমাজ শরীরে ফিরে এসেছে পুরান সব রোগ ব্যাধি, একত্রে যার নাম ভাল্‌গারিটি। অনুশীলিত নম্রতার পরিবর্তে চীৎকৃত কলহ, আত্মপ্রচার। কান ঝালাপালা। গণআন্দোলনের রাজপথ পরিহার করে জনসংযোগ এখন যেপথে হাঁটছে তাকে গলিপথও বলে না। একান্নবর্তিতার ভাঙ্গন সুরু হয়েছিল আরও কয়েক দশক আগে থেকে। সেই ভাঙ্গনের শেষ পর্যায়ে জ্ঞাতি-বিদ্বেষের চেহারা কদর্যতম আকার ধারণ করেছে। কেউ কারও ভাল দেখতে চায় না। চোখের সামনে দেখছি, নতুন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তর তর করে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু তার জন্যে গর্ববোধের পরিধিটা ছোট হতে হতে কম্পাসের জোড়া কাঁটার ক্ষুদ্রতম ব্যাসার্দ্ধে আটকে পড়ছে। যেন জং ধরে কাঁটা দুটির জোড়মুখের গ্রন্থির বারোটা বেজে গেছে!

পূর্ণেন্দুদার আগে আর্ট কলেজে নাম লিখিয়ে বাগনানের কেউ ছবি আঁকা শেখার কথা ভাবত টাবত? বাগনানের আশে পাশে, দক্ষিণে শ্যামপুর থানার নাকোল পর্যন্ত যেখানে পূর্ণেন্দু জননী কাঁথা-শিল্পীরূপে নাম কিনেছিলেন? বাগনানের মানুষ অনেক প্রতিমাশিল্পী পটশিল্পীর সন্ধান জানতেন। তাঁদের কেউ কেউ (যথা বাগনান, গোপালপুরের কিশোরী সাঁই) নাট্যমঞ্চের পটশিল্পীরূপে নাম কিনেছিলেন। কিন্তু পূর্ণেন্দুদার আগে নয়, পরবর্তীকালে, এক এক করে বেশ কয়েকজন আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে শিল্পী হয়েছেন বাগনান এলাকায়। পূর্ণেন্দুদার প্রভাবে, প্রেরণায় বা দৃষ্টান্ত অনুসরণে নয়, তা কি জোরের সঙ্গে বলা যাবে? এঁদের মধ্যে আছেন নিতাই দাস, দিগেন মুখার্জী, সীতারাম মণ্ডল, তপন কর, নির্মলেন্দু সামুই, প্রথমজন ব্যতিরেকে বাকি যাঁরা শিল্পচর্চাকেই নিজের নিজের জীবিকারূপে বেছে নিয়েছেন। একটা এলাকার উত্তরণের যৎকিঞ্চিত নমুনা বলা যায় না কি, যার উৎসমুখ পূর্ণেন্দু পত্রী!

সাহিত্যচর্চা? সূত্রপাত করেছেন যাঁরা তাঁদের কজনই বা কলম ধরে আছেন!

প্রাক্তন, একদা, লিখতেন টিখতেন—মোটামুটি এই রকমই সব ছেঁড়া তমসুক! মুস্কিলটা সহজবোধ্য। সাহিত্যচর্চা বড় বেশি নিজের ব্যাপার। নিজেকে একা না পেলে সাহিত্য হয় না। আজকের দিনের জীবনযাপনে ভিড় এড়িয়ে বাঁচা কঠিন। ডাক্তার বাবুরা যে কি অলৌকিক দক্ষতায় রোগী আর রিপ্রেজেণ্টেটিভ সামলান তা দেখে মাথা ঝিম ঝিম করে। ভিড়ের অন্যতর দৃষ্টান্ত না দিয়ে বলা ভাল, আজকের সাহিত্য-পথিকের জীবনে ভিড় শুধু অনিবার্য নয়, অপরিহার্যও। এই ভিড়ের মধ্যেই তাকে একাকী হতে হয়, ভীষণ একাকী। এতটা একাকীত্ব কে তাকে বরাদ্দ করবে! তাছাড়া, একটা ভাল সাইন বোর্ড রচনা করলে মন্দ নয় গোছের পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু একটা ভাল কবিতা বা গল্পের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বা আদৌ পয়সা জুটবে কিনা বলা মুস্কিল। ভাল পত্রিকায় ছাপা হলে তবে তো পয়সা এবং প্রচার। সে সুযোগ সহসা মেলে না। তবু যারা লেখে এবং অকাতরে তুলে দেয় লিটল ম্যাগের হাতে, তারা কোন্ শ্রেণীর চিড়িয়া! ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখার কাঙাল! মনে তো হয় না। কেন না, যে পর পর লেখে সে নিশ্চয় একই জিনিস লেখে না। তার মধ্যে জন্ম নেয় নতুন কিছু নতুন-ভাবে বলার তাড়না। তখন তার লিখতে লিখতে লিখিয়ে না হয়ে উপায় থাকে না। বাগনানে যে দু একজন নিয়মিত লেখেন ঘটনাচক্রে আমি তাদের মধ্যে একজন। আঠার বছর বয়সে শুরু। শুরু যেমন তেমন না, ম্যাক্সিম গোর্কী। তাঁর নবজাতক গল্প গ্রন্থের ভূমিকাই আমার পড়া প্রথম সাহিত্যতত্ত্ব। যখন পাঁচের দশকে পড়ছি বিদেশী সাহিত্যের এলোপাথাড়ি বাংলা অনুবাদ, দেখতে পেলাম, ঐসব বই-এর প্রচ্ছদশিল্পীদের একজন পূর্ণেন্দু পত্রী। তখন তো এলাকা দখল করে রেখেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, রমেন মল্লিক প্রমুখ শিল্পীরা। যতদূর মনে পড়ে, রুশ লেখক নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'হার্ড দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড' বইটির বাংলা অনুবাদ—'ইস্পাত'-এর প্রচ্ছদ রচনা করে পূর্ণেন্দুদা সংরক্ষিত এলাকাটিতে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। এরই কাছাকাছি সময়ে 'উল্টোরথ' আয়োজিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' স্মৃতি পুরস্কার লাভ 'দাঁড়ের ময়না' উপন্যাসের জন্য। প্রায় একই সময়ে সিগনেট বুক শপে সত্যজিৎ রায়ের স্থলাভিষিক্ত শিল্পী। ও দিকে আবার কবিতা শুধু নয়, শিল্প-সাহিত্যের উপরে বড় বড় প্রবন্ধ লিখছেন 'পরিচয়'-এর মত নামী পত্রিকায়।

আমি গল্প লিখি, গল্প লিখছি, গল্প লিখব—এই উচ্চারণের পিছনে কি পূর্ণেন্দুদার কোন ভূমিকা নেই? আছেই, যদিও ভূমিকাটি অনির্দিষ্ট, অনির্ণেয়—কতকটা যেন এক আলো থেকে শতজনের আলোকিত হওয়ার মত। জানি না, আফসার আমেদ কী বলবেন। তিনি এখন বাংলা সাহিত্যের পরিচিত নাম। মনে হয়, বাগনানের পূর্ণেন্দু পত্রী, এই ব্যাপারটুকুই তাঁকেও সাহিত্য চর্চায় যথেষ্ট প্রাণিত করেছে।

পূর্ণেন্দুদার সাহিত্যের পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ আমাকে আকৃষ্ট করত। সাহিত্যকে কোন না কোন অছিলায় অক্ষম আত্মরতিমূলক যৌনতার গবেষণাপত্ররূপে তুলে ধরার প্রবণতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস তাঁর সাহিত্যে আগাগোড়া শুভার্থক। তাঁর সাহিত্যে নাগরিকতাবোধ মানে গ্রাম্যতা থেকে উত্তরণ, সুদীর্ঘকালের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার কাটিয়ে ওঠার লড়াই। তিনি কলকাতাকে ভালবেসেছিলেন নিছক জীবিকার ক্ষেত্র রূপে বা কলকাতার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার আকর্ষণে নয়, বহুমুখী জীবনসংগ্রামের এক বিশ্বস্ত রণাঙ্গণরূপে, নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উর্বরতম ক্ষেত্ররূপে। কলকাতার ইতিহাস তাঁকে রোমাঞ্চিত করত কলকাতাজাত বুদ্ধিজীবীরা যে রোমাঞ্চের আস্বাদ পান নি। বহুদিন আগে 'অন্য গ্রাম, অন্য প্রাণ' শিরোনামে লিখেছিলেন কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টাজ, অন্য স্বাদের সাংবাদিকতা। যে কথা আগেই বলে'ছ। উত্তরকালে দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন'। পত্রিকায় ঐ ধারার সাংবাদিকতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ছিন্ন হওয়ায় তা আরর হয়ে ওঠে নি।

হয়ে ওঠে নি অমলদা (গাঙ্গুলি)-চরিত অবলম্বনে একটি উপন্যাস লেখার কাজ। ২৭. ৮. ৯১ তারিখের একটি বড চিঠিতে অমলদা আমাকে লিখেছিলেন, "পূর্ণেন্দু পত্রী আমাদের এলাকারই সন্তান। বয়সের কিছুটা পার্থক্য থাকলেও এক সময়ে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে পূর্ণেন্দু অনেক নামী দামী মানুষ হয়ে গেছে। তবে তা অপরের অনুগ্রহে নয়, নিজস্ব প্রতিভাবলেই। * * পুরোনো ঘনিষ্ঠতার সুবাদে পূর্ণেন্দুকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। * * * পূর্ণেন্দু কয়েক বছর আগে হয়তো রসিকতা করেই বলেছিল : আমার জীবন নাকি এমন বিচিত্র ও ঘটনাবহুল যার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ধরণের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস লেখা যেতে পারে এবং এই রকম একটি উপন্যাস সে লিখবে। উপন্যাস লেখার মালমশলা হিসাবে আমার কাছ থেকে বেশ কিছু কাগজপত্রও নিয়েছিল সে সেই সময়ে। * * কামনা করব, পূর্ণেন্দু জীবনে আরও সাফল্য লাভ করুক, তার পারিবারিক জীবনও আনন্দ ও শান্তির হোক।"

অমলদা-ও সদ্য প্রয়াত। এলাকাগতভাবে আমাদের ক্ষতি প্রত্যক্ষ। সুযোগ পেলে, পূর্ণেন্দুদা কীভাবে ব্যবহার করতেন অমল গাঙ্গুলির জীবনকাহিনী তাঁর প্রস্তাবিত উপন্যাসে, তা আর কারুরই দেখার সৌভাগ্য হবে না।

অনেকেরই আক্ষেপ টিকা টিপ্পনি—পূর্ণেন্দু পত্রী এত বিচিত্র বিষয়ে মাথা না ঘামালেই ভাল করতেন। প্রকারান্তরে পূর্ণেন্দু ব্যর্থ—এইটাই কি তাঁরা বলতে চাইছেন? আমার তো মনে হয়, পূর্ণেন্দুদা এম. এ. টা পাশ করলে ভাল করতেন। সভা সমিতিতে তাহলে তাঁর উপস্থিতিটা হয়ে উঠত দারুণ ভারি জ্ঞান ভাণ্ডের মত। সভাস্থলের সমবেত মানুষজন জ্ঞানের উত্তাপে ঘেমে নেয়ে উঠত। পরিবর্তে রস-

পিপাসু জ্ঞান পিপাসু বঙ্গজন পেলেন তারুণ্যের শানিত দীপ্তি ছ'ছটি দশক যার তেজ এতটুকু ম্লান করতে পারেনি, আরও শানিত কৌতুকের চমক যা অশালীনতার কাছে কদাচ আত্মসমর্পণ করে নি, পরিধানে অকুতোভয় স্বনির্বাচন যা মানুষের মনে অল্পস্বল্প জিজ্ঞাসা জাগ্রত করত। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, অহংকারী জীবনরসিক। তিনি কারও সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বিবাদ করেন না, অথচ কারও ধার ধারেন না। তাঁর প্রত্যাখ্যানে হিমশীতল ঔদাস্য। তিনি কবি শিল্পীদেব স্বতন্ত্র এক নিশান অপ্রাতিষ্ঠানিক। আত্মদীপ্তিতে অম্লান। সেই নিশান তাঁর মৃত্যুতে অর্ধনমিত রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

দরকার নেই কারও শোকমগ্ন হওয়ার।

শব্দের বিদ্যুৎ ও অভিমান : পূর্ণেন্দুর কবিতা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পূর্ণেন্দু পত্রীর চলে যাওয়ার ক্ষত আমার মনে এখনো গভীর। হয়ত তা সময়ের বনৌষধি মুছে নেবে আরো কিছুদিন পরে। ফলে এখনো তাঁর সম্পর্কে আমার যে কোন উচ্চারণ আবেগ ও মুগ্ধতার, মূল্যায়নের নয়। আমি প্রণত রয়েছি তাঁর বিচিত্র ও বহুমাত্রিক সৃষ্টিকর্মের কাছে।

আমাকে যা প্রথম থেকে প্রবলভাবে টেনেছে তার দিকে তা তাঁর কবিতা, কিছুটা চিত্রশিল্পও। অসামান্য গদ্যের মুখোমুখি হয়েছি অনেক পরে, শেষ ঘাটে এসে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রমী অবদান উপভোগ করেছি তারও পরে। একটু একটু করে রচিত হয়েছে সাহিত্য নির্ভর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আমার সুখদুঃখের অংশীদার হয়েছেন, আমিও তাঁর। এভাবে তিনি আমার আত্মীয়ের অধিক, আজও তাই চলতে ফিরতে কত স্মৃতি উন্মন করে দেয়। ভাবি, সক্রিয় মানুষের প্রয়াণ বেশি বেদনার।

তাঁর একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক জীবন ছিল। অগ্নিময় দিনগুলির আলোড়ন তাঁর কবিতায় কখনো কখনো হয়েছে, অবশ্যই; কিন্তু তিনি মূলত স্বীকারোক্তি মূলক আত্মজৈবনিক কবিতাই লিখেছেন বেশি। 'কামান বন্দুকের মত শক্ত সমর্থ এক যুবক' হয়ে 'আগুনের ঝাঁপি খুলে' দিতে পারেন, যেমন তিনি পারেন ভালবেসে 'আত্মার ক্রন্দনে ক্লিষ্ট' হতে। একটি নারীর মাঝে অকস্মাৎ' খুঁজে পেয়েছেন আশ্চর্যের ও 'ক্ষণিকের' নীলিমাকে—কখনো প্রবল আনন্দে। কখনো বা ভীষণ বিষাদে মুখোমুখি হয়েছেন 'ভীষণ নীরবে'র।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সংকলনটি মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখি—পড়ে যাই কবিতার পর কবিতা। কখনো তাঁকে মনে হয় প্রতিবাদী। কখনো বা অভিমানী। কখনো সংরক্ত, কখনো উদাসীন। কখনো কৌতুক করছেন নিজেকে নিয়ে, কখনো দারুণ সিরিয়াস। একটি কবিতায় যদি মানুষের প্রতি বিশ্বাসী, অন্যটিতে দেখি মহিমার স্পর্শহীন মানব সমাজ। কখনো দেখতে পাই 'কোজাগরী আকাশের পিলসুজে জ্যোৎস্নার পিদিম', কখনো দেখছি 'জিভের ভিতরে এক ক্ষুধাতুর উলঙ্গ কাঙাল।'

সংকলনটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে একাংশে লিখেছেন 'হয়ত বক্তব্যে অগভীর কিন্তু ছন্দের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এমন একটা কবিতা সম্পর্কে একজন কবি স্বভাবতই হবেন মমতাময়। এবং নির্বাচনের সময় সেটিকে বর্জন করতে গিয়ে শুধু যে হাতই কাঁদবে তা নয়, মনের ভিতরেও কাঁপুনি তুলবে কিছু একটা অথবা এমন হতে পারে, দুর্বল একটা কবিতার একটি কি দুটি পংক্তির মধ্যে জড়িয়ে আছে প্রবল

আলোড়নময় কোন ব্যক্তিগত স্মৃতির তীব্র তাপ।' যদি ঠিক বুঝে থাকি পূর্ণেন্দু নিরূপিত ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণে সম্মত এবং এক প্রবল অতীত বিধুরতায় আক্রান্ত। মিশ্র কলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তে কবিতা লেখায় স্বচ্ছন্দ তিনি—টানা গদ্যেও তো কত কবিতা লিখেছেন যতি ও বিরতির ভারসাম্য রক্ষা করে। যেখানে অন্ত্যমিল দেন নি। সেখানে মধ্যমিলের ঐশ্বর্যে পাঠকমনের সিন্দুক ভরে দিয়েছেন।

কয়েকটি উদাহরণ :

'আর কী দিয়ে পূর্ণ করবে তুমি
শূন্য আমার খাঁচা'
যার সমস্ত লুট হয়েছে তারও
ফুরোয় নি সব বাঁচা।'
(আমি আছি আমার শস্যে বীজে)

'আজ সব খুলে দিও
কোনো ফুল রেখো না আড়ালে
ভূ-মধ্য সাগরও যদি চাই, দিও
দু'হাত বাড়ালে।'
(দিও)

'পায়ের তলায় বন্যার জল, রূপোর মল পরা ঢেউ
মখমল মাটি, শামুক, কাটা পায়ের রক্তের দাগ,
সব ফিরে আসে আবার।'
(আত্মচরিত / ২)

'আত্মচরিত' শিরোনাম দিয়ে ছটি কবিতা লিখেছেন যা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত। ছ বছর বয়স থেকে আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত কবির অভিপ্রায়, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা মর্মরিত হয়েছে এই কবিতাগুলিতে। মাধুর্যময় উচ্চারণে, নিখুঁত শব্দ নির্বাচনে, চিত্ররচনার দক্ষতায়, এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতার সংঘাতে, ইন্দ্রিয়ঘনত্বে একটি দুটি স্তবক চিরস্মৃতিধৃত হয়ে গেছে :

'যখন আঠার বছর বয়স
দীর্ঘকায় এক মন্দির তুলেছিলাম নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
তার ভিতরে ধূপ, ধূপের ভিতরে পুষ্পগন্ধ, পুষ্পের ভিতরে নারী
নারীর ভিতরে আকাশময় ওষ্ঠ, ওষ্ঠের ভিতরে কেবল প্রবহমান চুম্বন।
এখন চল্লিশ।
এখন স্বপ্নের ভিতরে ঈশ্বরের তুমুল অট্টহাসি॥'
(আত্মচরিত / ১)

কখনো কখনো পরাবাস্তবতার ধার ঘেঁষে কবি হেঁটে গেছেন, অবচেতনার অতল থেকে তুলে এনেছেন শব্দচিত্রের বর্ণময় ঝিনুক কিন্তু মূলত পূর্ণেন্দু এক তীব্র

রোমান্টিক কবি। বিন্যস্ত ও সংলগ্ন স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর যাওয়া আসা।

'আমাকে ছুঁয়েছো তুমি
শরীর পেয়েছে প্রিয় রোদ
আমার যা কিছু ভেসে গিয়েছিল
সব ফিরে পেয়ে যাব এই তৃপ্তবোধ
আমাকে করেছে নীল পাখি।'

(বোধ)

এই যে ছোট কবিতাটি উদ্ধৃত হল তার আরো গাঢ়, আরো সংহত রূপ আমরা দেখেছি হাসপাতালে উডবার্ণ ওয়ার্ডে অসুস্থতার সময় জীবনের শেষ দিনগুলিতে রচিত তেৎটিটি কবিতায়। মর্মস্পর্শী বিষাদের আত্মমগ্ন সংলাপ শুনতে শুনতে শূন্য খাঁ খাঁ বুকে ঘনিয়ে এসেছে অতল রোদন। তবু কোথাও একটি শব্দও যেন পাত্রচ্যুত হয়ে বাইরে পড়েনি। এতটাই কবির পরিমিতিবোধ :

'কখন শিয়রে এসে হাত দিয়ে ছুঁয়েছ কপাল
বুঝতে পারি নি। পেলে তৎক্ষণাৎ জেগে উঠতাম।
বছর কুড়ির মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরা ঝরে গেল ?
সাত সূর্য জ্বলে উঠত, পুনরায় সেই স্পর্শ আনো।'

(১লা মার্চ ১৯৯৭)

জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে ঘরে ফিরে আসার মতন
মনে হয় দিনগুলো। বিঘ্ন গেছে, আতঙ্ক মরে নি।
ক্ষমার স্বর্গীয় মূর্তি ডাকঘরের রাজার পোশাকে
পাশে এসে বসতেই গায়ে অন্য ভুবনের আলো।

(১৩ মার্চ ১৯৯৭)

'স্বপ্নকে বিশাল করে দাও আরো, তাকে উড়তে দাও,
তাকে বলো অশ্বমেধ যজ্ঞ জয় করে ফিরে এসো।
যতদিন যাচ্ছে তুমি কুঁকড়ে যাচ্ছ আপন বিবরে
জানো না তোমাকে খুঁজছে ময়দানের বিজয় উৎসব ?

(১৬ মার্চ ১৯৯৭।)

'আমার শ্রাবণ গাথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল আজো
চৈত্রে ও বৈশাখে এত জীর্ণ হয়ে এল প্রাণকণা,
পালকেরা খসে খসে পিণ্ডাকার মাংস করে দিল
সোনার মন্দির। জালো আর একবার পঞ্চপ্রদীপ

(১৭ মার্চ ১৯৯৭)

মৃত্যুর দুদিন আগেও অনুভূতি জ্বলে উঠছে শব্দের বিদ্যুতে। শরীরের যন্ত্রণা

শব্দের অভিমানের কাছে পরাজিত হচ্ছে। দূরে কোথাও সরোদ বাজছে সোনার মন্দিরে ইমন কল্যাণে। সারাজীবন কবি বলতে চেয়েছেন :

'পুরুষ কীভাবে বাঁচে সেই শুধু জানে।'

আমি সেই একই কবিতার অন্য একটি পংক্তির কাছে আভূমি আনত হয়ে আছি :

'পুরুষ কিভাবে কাঁদে সে-ই শুধু জানে।'

পূর্ণেন্দুদা আপনাকে

তপনকিরণ রায়

পূর্ণেন্দুদা আপনাকে নিয়ে লিখতে বসেছি। আজ ১৯শে মার্চ '৯৮। আজ থেকে একবছর আগে আপনি আমাদের মত হাজারো আপনার গুণমুগ্ধ পাঠক পাঠিকাকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন, যেখান থেকে কেউ কোনদিন আর ফিরে আসে না। আপনার লেখার সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। প্রথম উপন্যাস পড়েছিলাম উল্টোরথ পত্রিকায় 'দাঁড়ের ময়না'। এর পর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস—অনেক বই পড়েছি।

নীরদ রায়ের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৯৮৮ সালে, কলকাতার প্রতিক্ষণ অফিসে। এদিক দিয়ে নীরদের কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞ। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে আপনি নীরদ রায়ের উদ্যোগে সর্ব প্রথম রায়গঞ্জ আসেন। সেবার চারটে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিটি অনুষ্ঠান হয়েছিল আকর্ষণীয়। তন্মধ্যে ইনষ্টিটিউট মঞ্চে 'সাম্প্রতিক আড্ডা' আয়োজিত অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সবার সেরা। আমরা শ'দুয়েক কবি-গল্পকার-সাহিত্যপ্রেমী মানুষ আপনাকে ঘিরে বসেছিলাম। নবীন-প্রবীণ অনেকের লেখা পাঠ হয়েছিল উল্লেখযোগ্য। অচিন্ত্য সেনের রবীন্দ্র সংগীত, তরণীমোহন বিশ্বাসের বাউল ও লোক সংগীত, বীরেশ সরকারের তবলা সঙ্গত আপনার ভীষণ মনপছন্দ হয়েছিল। 'সাম্প্রতিক আড্ডা' থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় নিবেদিত একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম কপিটি আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নীরদ রায়। সাহিত্য আসর পরিচালনা করেছিলেন আশিস সরকার। নীরদ রায়কে আপনি অসম্ভব ভালবাসতেন, ওর কবিতাকেও।

প্রথমবার যেদিন এলেন, দুপুরে নীরদ রায়ের বাসায় অন্ন গ্রহণ করেন। খেয়ে দেয়ে দোতালা থেকে নেমে রিক্সায় ওঠার সময় বললেন : তপনকিরণ, নীরদের স্ত্রী ছায়ার হাতের মত সুস্বাদু রান্না আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, কোথাও খাইনি। বলে রিক্সায় উঠে সিগারেট ধরিয়ে হেসে ছিলেন। সেবার আপনাকে নিয়ে একদিন মালদহে গিয়েছিলাম। মালদহের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন। আদিনায় কাটিয়েছিলাম দীর্ঘ সময়। আপনার সঙ্গে নীরদ, আমি, অলক কুণ্ডু গিয়েছিলাম। অলক অসংখ্য ফটো তুলেছিল।

১৯৯৩ সালে পুনরায় রায়গঞ্জ আসেন নীরদের উদ্যোগে রায়গঞ্জ কসবার কৈলাশ নাথ রাধারাণী স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে। মঞ্চের সামনে হাজার দুয়েক শ্রোতা। আপনার বক্তব্য সবাই গভীর মনযোগ সহকারে শুনেছিল। স্থানীয়

কয়েকজন কবির কবিতা পাঠের পর আপনি কবিতা পড়েছিলেন। আপনার কবিতা পড়বার জবাব নেই। নীরদের কবিতা পাঠ হয়েছিল চমৎকার। সাহিত্য আসর পরিচালনা করেছিলেন সুজিতভূষণ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৈলাসনাথ রাধারাণী স্কুলের শিক্ষক ড. উৎপল দত্ত। স্কুল থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সর্ব প্রথম কবিতাটি ছিল আপনার। সেবার কোচবিহারে 'তমসুক' পত্রিকা আয়োজিত পূর্ব ভারত কবি সম্মেলনে আপনাকে নিয়ে নীরদ রায়, জীবেশ দাস, সুশান্ত আচার্য ও আমি গিয়েছিলাম। অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। কবিতা পড়েছিলেন অসাধারণ। অমিয়ভূষণ মজুমদারের অনুরোধে উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় ক'টি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। চৈতালী সাগর খাতায় স্কেচ করে দিয়েছিলেন। শুধু কোচবিহার কেন রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, আলিপুর দুয়ার, সর্বত্র আপনি অসংখ্য সাহিত্যপ্রেমী মানুষের অটোগ্রাফ খাতায় স্কেচ সহ স্বাক্ষর দিয়েছেন। আপনি কখনো একটু বিরক্ত বোধ করেননি।

আপনাকে উত্তরবঙ্গে আনার সময় প্রত্যেকবার নীরদকে উমা বৌদির বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসতে হত। আপনি পাইলস্ ও হাঁফানির পেশেন্ট, আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্য আমি সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতাম। কোন কোন রাত গেছে আপনি সারারাত বুকে বালিশ চেপে কাটিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমাকে রাত জাগতে হত। বারবার গরম জল সহ ওষুধ খাচ্ছেন। মুখ দিয়ে ভেপার নিচ্ছেন সকালের দিকে হয়ত একটু ঘুমুতেন। গভীর আশ্চর্য হতাম প্রতিটি অনুষ্ঠানে এত শারীরিক কষ্ট সত্বেও গল্প, নাটক, কবিতা, চলচ্চিত্র সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখতেন। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। অধ্যাপক ইন্দু সাহা রায়গঞ্জ ভেষজ উদ্যানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রায়গঞ্জের দুটি দ্রষ্টব্য স্থান হল কুলীক পক্ষী নিবাস ও ভেষজ উদ্যান। ভেষজ উদ্যানে ঢুকে আপনি দারুণ আনন্দিত হয়েছিলেন। ঘুরে ঘুরে ইন্দুবাবুর সঙ্গে সমগ্র বাগান দেখলেন। অসংখ্য মূল্যবান গাছ রয়েছে। ওখানে আপনার আসার সংবাদ পাওয়ামাত্র কলেজের ছেলে মেয়েরা আপনাকে ঘিরে ধরল স্কেচ সহ অটোগ্রাফের জন্য, আপনি কাউকে নিরাশ করেননি। সব শেষে স্কেচ সহ অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন অধ্যাপক ইন্দুলাল সাহাকে।

আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের কথা আমাদের জানা ছিল। যে জন্য সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকলেও আমি মেপে মেপে কথা বলতাম। যদিও আপনি আমাদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতায় হেসে কথা বলতেন। হাসি, আনন্দ, কৌতুক, গান কবিতা পাঠে কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। রবীন্দ্র সংগীত আপনার কণ্ঠে শোনা এক বিরল অভিজ্ঞতা।

হ্যাঁ, কোচবিহার পান্থনিবাসের তিনতলায় একটি ঘরে আপনাকে নিয়েছিলাম সেবার। নীরদ, সুশান্ত প্রমুখরা অনুষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে যাতে সম্পন্ন হয় সেই জন্য ব্যস্ত ছিল। সকালে একটি ছেলে এল। ছেলেটির সঙ্গে কবিতা ও আবৃত্তি

সম্পর্কে অনেক কথা হল। বেলা চারটে নাগাদ সেই ছেলেটির সঙ্গে চৈতালী সাহা ও আরো কজন ছেলে এল। উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়া। আপনি বললেন, আমার কোন ছবি দেখেছ? উত্তর এল, হ্যাঁ। আপনি জিজ্ঞেস করলেন আমার কোন একটি ছবির নাম বল তো?

একটি ছেলে বলল, কেন 'মা'।

সঙ্গে সঙ্গে রাগে আপনার মুখশ্রী লাল হয়ে গেল, বললেন, বের হও। ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

তাদের সঙ্গে চৈতালীকেও বের করে দিলেন।

আমি গত ক'বছর ধরে অসুস্থ। রায়গঞ্জের বাইরে কোথাও যেতে পারি না। আগে নীরদের সঙ্গে প্রতিবছর কলকাতা বইমেলায় যেতাম। প্রতি বারই বাস থেকে নেমে নীরদের সঙ্গে আপনার বাসায় যেতাম। আড্ডাতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যেত। একাধিকবার খাবার আসত। আপনি শুধু চা খেতেন। আমার সম্পাদিত 'প্রভাতি' সাহিত্য পত্রিকার প্রচ্ছদ নীরদই আপনাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়ে এসেছিল। প্রভাতির প্রথম কবিতাটি থাকত আপনার। এমন হয়েছে আপনি স্বইচ্ছায় কবিতা পাঠিয়েছেন।

আমরা কলকাতায় তিনচার দিন থাকতাম। আপনার সঙ্গে বইমেলা যেতাম। আপনি আমাদের বই উপহার দিতেন। প্রতিবার প্রথম বইটি নীরদকে, দ্বিতীয়টি আমাকে। নীরদের ছেলে গেলে মেয়ে মামনকে বই উপহার দিয়েছেন। দুটি ঘটনার কথা কখনো ভুলব না। প্রথমটি বইমেলায় প্রতিক্ষণের বই প্রকাশ উপলক্ষে যাচ্ছি, পথে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। দু'বন্ধু বুকে জাপটে ধরলেন। বইমেলার হাজারো দর্শক দেখলেন। সেই নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্য এখনো আমার চশমার লেন্সে ভাসছে। অন্যটিও বইমেলায়। 'প্রতিক্ষণে'র অফিসের সামনে যেতে প্রিয়ব্রত দেব কফি নিয়ে এলেন। অনেক প্রখ্যাত কবি। সাহিত্যিক আপনাকে ঘিরে ধরল। হঠাৎ নীরদকে না দেখে আপনি ভীষণ উতলা হ'য়ে উঠলেন, বার বার বলছেন: তপনকিরণ, নীরদ গেল কোথায়? আমি মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এদিক ওদিক ঘুরে নীরদকে ধরে আনতেই আপনি হেসে কফির পেলায় চুমুক দিলেন। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমার গল্পের বই 'মুখ' বের হয়েছে ১৯৯৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী। আমার অসুস্থতার জন্য নীরদই আপনার হাতে 'মুখ' এর প্রথম কপিটি তুলে দেয়, সঙ্গে ছিল শংকর রুদ্র। 'মুখ'এর প্রচ্ছদ এঁকে দেবার জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে ২৭. ৩. ৯৬ আপনি লিখেছিলেন:

প্রিয় তপন,

তোমার অসুখের কথা শুনলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি সব সময়েই চাই আমি ছাড়া অন্য সবাই সুখে থাকুক, ভাল থাকুক। এটার উপরেই তো নির্ভর

করছে আমার সুখে থাকা। সবাইকে মিলিয়েই তো আমি। তোমার গল্পের বই বের হতে চলেছে জেনে ভীষণ ভাল লাগল। তেমনি দুঃখ পেলাম, আমাকে তার প্রচ্ছদের জন্য অনুমতি প্রার্থনায়। তুমি বা নীরদ এরা আমার অনুমতি চাইবে কেন? তোমরা আমার সংসারের লোকের মতই। আমি তো নীরদের একটা বইয়ে ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিতে চাই। কবে থেকে এই ইচ্ছে। সেরে ওঠ জলদি। আমি পাশে আছি সব সময়েই।

শুভেচ্ছা সহ পূর্ণেন্দু পত্রী

পূর্ণেন্দুদা, আপনার অকাল প্রয়াণে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। আমরা হারালাম আমাদের একান্ত আপনজনকে। যার তুলনা নেই।

স্নেহের চোখে ক্ষমার চোখে

উমা পত্রী

আমি যাঁর কথা বলতে বসেছি তিনি আপনাদের ও আমাদের প্রিয় ব্যক্তি।

উনি বাবা মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। মাঘী পূর্ণিমার রাতে জন্মেছিলেন বলে ওঁর দাদু (ঠাকুরদা) পূর্ণেন্দু নাম রেখেছিলেন। ডাক নাম দুলাল। সকলের অতি আদরের ছিলেন। তা বলে আদুরে ভাবটা ছিল না। বরং উনিই সকলকে স্নেহের চোখে দেখতেন। আমিও ওঁর স্নেহধন্যা ছিলাম। বাবা (শ্বশুরমশাই) পুলিন বিহারী পত্রী ও মা ৺ নির্মলা দেবী আমাদের বিয়ের পরে ওঁর ছোটবেলার গল্প এত করেছেন যে, তা আজ চল্লিশ বছরেও পুরান হয়নি।

মা বলতেন, দুলাল তো বাড়িতে রঙ তৈরি করত, হলুদ বাটায় হলুদ রঙ, আলতায় লাল রঙ, শিম পাতায় সবুজ রঙ, আর পুঁই-মেচুড়িতে (পুঁই শাকের পাকা দানা) বেগুনি রঙ। একবার বৌমা, দুলাল এমন কাণ্ড করেছিল, কি বলব তোমাকে! দুধে আলতা গায়ের রঙ হত যারা বেশ ফরসা,—তাই শুনে একদিন ছোট মাটির খুরিতে অল্প একটু দুধ ও কিছুটা আলতা ঢেলে রেখে দিল খাটের তলায় শোবার ঘরে। কদিন পরে পচা গন্ধ পেয়ে—মা বলছেন—আমি খাটের তলা পরিষ্কার করতে গেলাম। দেখি সেটা পচে ভেকুনো ফুটে একাকার হয়েছে। তা দেখে শুনে বাবা (শ্বশুরমশায়) বকাবকি করলেন মাকে। তখন মা—আপনাদের পূর্ণেন্দু পত্রী—আমার স্বামীকে ডেকে এনে বললেন, "দেখ তো বাবা, কি করেছিস! আমার পা ছুঁয়ে বল, আর কখনো এমন করবিনি।" তা উনি নাকি মায়ের পা ছুঁয়ে বলেছিলেন, "না মা, করব না। তবে তোমরাই তো বল কত মেয়ের নাম করে, গায়ের রঙ দুধে আলতার মত। তাই পরীক্ষা করে দেখছিলাম।" মা তখন আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৭-তে। কিন্তু ১৯৫৬ থেকেই ওঁকে চিনি। কারণ আমার দাদা ও দাদার বন্ধু তরুণ স্যান্যাল ছিলেন ওঁরও বন্ধু। বলতে গেলে তরুণদাই আমাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

আমি তখনো কোনদিন পাল্কি চড়িনি, এমনি দেখেছি। বইতেও ছবি দেখেছি। আমার শ্বশুর মশায়রা একান্নবর্তী ছিলেন তখনো। বাড়ির বড় ছেলের বিয়েতে—৺ঠাকুরদা বলে দিয়েছিলেন, বড়-বৌ পাল্কি চেপে আসবে, তাঁর নির্দেশমত। পাল্কি থেকে নেমে ঠাকুর মন্দিরে প্রণাম করে বাড়িতে নামতে হয়েছিল। আমি ও উনি, সঙ্গে বড়দা ও ছোট বোন, বাগনান থেকে প্রাইভেট কার চেপে নাউলের হাটে নেমে ওখান থেকে পাল্কিতে বসতে হল। পাল্কি করে

খানিক দূর গিয়ে বেহারারা নানা রকম পাল্কির গান শুরু করল। একে তো পাল্কি, তার উপর গনগনে রোদ, তারপরে গান, বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তারই মধ্যে বসে আছি, আর উনি আমার পিছনে বসে আছেন। কিছুতেই সামনে ঘুরছেন না। রাগের চোটে চলন্ত পাল্কি থেকে হাতের রুমাল ফেলে দিলাম। পাল্কি থেমে গেল। বেহারারা বলতে লাগল, "অ দুলালবাবু, দুলালদা আপুনিদের রুমাল পড়ে গেছে গো।" তখন উনি মিষ্ট কণ্ঠে বলেন, "থাম্ থাম্ দেখছি কি পড়ল।" এই বলে রুমাল তুলে এনে আমায় দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার রুমাল। এতে মুখ মুছো না, আমারটায় মোছো।" কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছল করে উঠল। ভাবলাম এবার সামনে তাকাবেন। কিন্তু তা হল না। কারণ বর আগে এবং কনে তাব দিকে পিঠ দিযে বসবে এটাই নিয়ম।

খানিক বাদে ওরা কোথায যেন নামাল। তারপর বলল, "দাদাবাবু বৌদিমণি এবার একটু জল খাবেনি?"

আমাকে জিজ্ঞেস করতে বললাম, "এখন খাব না, পরে খাব।'

এরকম নানান ঘটনা মাঝে মধ্যে মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। তখন যেন মনে হয়, এসব ঘটেছে এই কিছুদিন আগে।

আমার বাবা আমার ছবি আঁকার প্রেরণা

পুণ্যব্রত পত্রী

আমার বাবা পূর্ণেন্দু পত্রীই সচেতনভাবে আমার প্রথম ছবি আঁকার প্রেরণা। এর আগে অন্যান্য শিশুদের মত দু-একটা ছবি যে আঁকিনি তা নয়। এঁকেছি। তা নেহাতই তুচ্ছ। তবে সেই সাত-আট বছর বয়সেই বাবার 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিতে দেওয়ালে আঁকা শিশুচিত্রগুলি, যেগুলো ফিল্মের চরিত্র 'তুতুল' আঁকছে সেগুলো আমি ও আমার বড় বোন উপমা মিলে এঁকেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমি বইপড়া আর দুষ্টুমিতেই ছোটবেলাটা কাটিয়েছি। দুষ্টুমির জন্যে বাবার হাতে অনেক ঠ্যাঙানিও খেয়েছি। আমি ছাড়া আমার তিন বোনই (উপমা, রূপমা, আর তন্দ্রিমা) লেখা, আঁকা বা নাচ, গান, নাটকে ছেলেবেলা থেকেই পারদর্শী ছিল। আমি এসব কিছুই করতে পারতাম না।

প্রথম সচেতনভাবে ছবি আঁকার ঘটনা ঘটল ১৯৭২-এ হাজারীবাগ বেড়াতে গিয়ে। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন শিল্পী অসিত পাল।

হুড্রু ফলস্ দেখে এসে আমার বোনেরা ও অন্যরাও খুব ছবি আঁকছে। কেউ পাহাড়ের, কেউ ঝর্ণার ছবি আঁকছে। হঠাৎ বোনেদের বললাম, আমাকেও একটা কাগজ আর রঙ-তুলি দে। আমার কথা শুনে ওরা হাসিঠাট্টা শুরু করে দিল, এই, দাদাও ছবি আঁকবে!

আমি আঁকলাম।

এ খবর বাবার কানে গেল।

আমার আঁকার বিষয়টা ছিল ঝর্ণা। ঝর্ণার জল পাথরের উপর পড়ছে। পড়ে জলের ফোঁটাগুলো ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। এইসব। বোনেরা আমার ছবিটা নিয়ে হাসতে হাসতে গিয়ে বাপীকে দেখাল। বাপী ছবিটা দেখে বললেন, "এতো অসাধারণ ছবি হয়েছে।" এবং কেন অসাধারণ হয়েছে, তাও ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "ও যা দেখেছে তা-ই এঁকেছে"। অন্যেরা সাধারণত ঝর্ণা, পাহাড় যেমন ভাবে আঁকা হয় তেমনই এঁকেছে। আমি যেভাবে এঁকেছিলাম তাতে একটা রিয়্যালিটির ব্যাপার ছিল। ঐ পাথরের উপর জল পড়ে ফোঁটাগুলির ঠিকরে ঠিকরে ওঠায় একটা ইম্প্রেশনের ব্যাপারও তাতে ধরা পড়েছিল। এটা সেদিন বাপী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই উৎসাহ নিয়েই আমার জীবনে ছবি আঁকার সূত্রপাত।

আমার শিল্পী জীবনের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা হল লেটারিং-এর জগতে প্রবেশ করা। স্কুলের এগজিবিশনের সময় বিভিন্ন ঘরে প্রদর্শনীর বিষয় অনুযায়ী

শিরোনামগুলি একজন শিক্ষকমশায় আমাকে লিখতে বললেন। আমি তখন জানি না কিভাবে লেটারিং করতে হয়। কিন্তু এ কথাটা শিক্ষকমহাশয়কে বলতেও পারছি না। তখনকার মত আমার পেট খারাপ হয়েছে বলে বাড়ি চলে এলাম। সমস্যাটা বোনকে বললাম। আমার বোন উপমা আমাকে দেখিয়ে দিল কিভাবে অক্ষরের গঠন আঁকতে হয়। এবং করেও দিল। স্কুলে গিয়ে সেগুলোই আমি নিজে করেছি বলে দিয়ে দিলাম।

বড বোন উপমার কাছে লেটারিং শেখার মত আমার কবিতার হাতেখড়ি ছোট বোন তন্দ্রিমার কাছে। ইতিপূর্বে গল্প উপন্যাস অনেক পডলেও কবিতা কোনদিন পডিনি। ছোটবোন ডায়েরীতে কবিতা লিখত। একদিন গোপনে ওর ডায়েরীতে কবিতা পড়ে ফেললাম। দেখলাম বেশ ইণ্টারেস্টিং তো। এ তো বেশ ভাল জিনিস। অল্প কথায় অনেক কথা বলা যায়। এবং তার পরেই আমাদের নাকোলের গ্রামের বাড়ি 'মোবগেহ' নিয়ে কবিতা লিখলাম। সেটা আমার মাকে পড়িয়েছিলাম। মা পড়ে বাবাকে পড়ালেন। বাবা বলেছিলেন মন্দ হয়নি।

পরবর্তীকালে আমি গদ্য ও পদ্য দুটোই লিখেছি, যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। বাবা কিন্তু আমার পদ্যের চেয়ে গদ্যকেই বেশি প্রশংসা করেছেন। এবং একদিন বুঝিয়ে বলেছিলেন, একজন কবিমনস্ক মানুষই সবচেয়ে ভাল গদ্য লিখতে পারেন। উদাহরণ দিয়েছিলেন জীবনানন্দ আব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

বাবার চলচ্চিত্র প্রচেষ্টাতেও বিভিন্ন পর্যায়ে, সেই শিশু বয়সে 'স্ত্রীর পত্র' থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে বাবাকে সাহায্য করেছি। বিশেষ করে সঙ্গীতের ব্যাপারে। একটা গীটার, একটা রেকর্ড প্লেয়ার, এ্যালার্ম ঘড়ি, তুলির ডাঁটি—এমনি সব তুচ্ছ বস্তু নিয়ে আমরা এফেক্ট মিউজিকগুলি করেছিলাম।

ছিয়াত্তর সালে যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি তখন থেকে কমার্শিয়াল আর্টের জগতে প্রবেশ। প্রথম কাজ কলেজের বার্ষিক পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকা। রঙ-টঙ দিয়ে প্রচ্ছদ তো এঁকে দিলাম। কিন্তু ছাপা হবে কেমন করে, ব্লক হবে কেমন করে, এসব কিছুই জানিনা। ব্লক তৈরির জন্যে যে 'কি ড্রয়িং' দরকার তা আমি জানতাম না। যথারীতি বাড়িতে এসে বাপীর স্মরণাপন্ন হলাম। বাপী 'কি ড্রয়িং' করে দিলেন।

ঐ বছরেই আমার সহপাঠী সমীর আইচের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ও 'গাছগাছালি' নামে একটা কাগজ বের করত। আমাকে তার সংযুক্ত সম্পাদক করে নিল এবং প্রচ্ছদ আঁকতে বলল। আমি এঁকে দিয়েছিলাম। 'গাছগাছালি'তে আমার প্রচ্ছদ ছাড়াও ছিল একটা কবিতা আর মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' ছবির রিভিউ। এই আমার প্রথম যুগের প্রকাশিত প্রচ্ছদ ও লেখা। অবশ্য এর আগে বাপী যখন আনন্দবাজারে কাজ করতেন সেই ১৯৭৪-এ 'আনন্দ মেলা'য় আমার ছোট বোনকে উদ্দেশ্য করে বাপী একটা ছড়া লেখেন, তাতে ছবি এঁকেছিলাম আমি। সাপ্তাহিক

রবিবারের আনন্দ মেলায় প্রমিথিউসকে নিয়ে একটা লেখাও ছাপা হয়েছিল।

বাঙুরে আমরা কয়েকটা বাড়ি বদল করে ছিলাম। ওখানে শেষ যে বাড়িতে ছিলাম তার একটা ঘর ছিল বাবার আঁকার ঘর। বাবার আঁকার ঘরটাই ছিল আমার পড়ার ও আঁকার ঘর। বাবা বেরিয়ে গেলেই সেখানে আমি বসে যেতাম। বাবার অনেকটা সময় দরকার হলে আমি ভিতরের ঘরে চলে যেতাম।

বিভিন্ন সময়ে প্রচ্ছদ এঁকে আমি বাবার ঘরে এমনভাবে রাখতাম যাতে বাবা ঘরে ঢুকলেই তাঁর চোখে পড়ে। বাবা সেগুলো দেখতেন, এবং কেন ঠিক হয়নি সেটুকুই বলে দিতেন। প্রশংসা সেভাবে কোনদিনই করেননি। কেবল ভুলত্রুটি-গুলোই ধরিয়ে দিতেন। প্রশংসা আসত অন্যের মুখে। যেমন কখনো অমিতাভ দাশগুপ্ত বললেন, হ্যাঁ রে তুই নাকি দারুণ একটা কাজ করেছিস। তোর বাবা বলল।—এইরকম। ততদিনে অবশ্য আমার বেশ কিছু ভাল প্রচ্ছদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'শোকপ্রস্তাব' নামে একটি কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ আমার খুব মনে পড়ে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কবির নামটা ভুলে গেছি। সেই সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর 'বিশ-একুশ', অমিতাভ দাশগুপ্তের 'বারুদ বালিকা' কিংবা চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞাপনের মেয়ে'-র মত বেশ কিছু ভাল প্রচ্ছদ প্রকাশিত হয়েছিল যা থেকে আমি নিজের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয় অনুভব করছিলাম। এ ব্যাপারে একটা মজার ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করতে পারি, যাতে বোঝা গিয়েছিল যে আমার কাজের মাধ্যমে আমি বাবার প্রশংসাও পাচ্ছিলাম যা ছিল আমার প্রেরণা।

একদিন মিনিবাসে ফেরার সময় বাবা শুনেছিলেন যে, তাঁর পিছনের সীটে বসা কয়েকটি ছেলে গল্প করছেন, এখন সবচেয়ে ভাল কভার আঁকছে পুণ্যব্রত পত্রী। তখন একজন বলল, তা কি করে হয়, ও তো পূর্ণেন্দু পত্রীর ছেলে। ও কিভাবে ওর বাবার চেয়ে ভাল আঁকবে।···ইত্যাদি। তাদের মধ্যে বেশ তর্কাতর্কি হচ্ছিল। বাবা বাড়ি ফিরে সকলকে ডেকে হাসতে হাসতে ঘটনাটা গল্প করেছিলেন।

তারপর একসময় কমার্শিয়াল আর্টের জগতেই পাকাপাকিভাবে জড়িয়ে গেলাম। প্রতিক্ষণে যোগ দিই ১৯৮৩-র মার্চে। ওখানে বাবার সঙ্গে কাজ করেছি। বাবার কাজের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই আমার কাজে উপস্থিত ছিল এবং সেবিষয়ে আমি সচেতনও ছিলাম। তবে যে সময়ে প্রচ্ছদ এবং টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে একটা উত্তরণের অভিপ্রায় নিচ্ছি—তাতে অনেকটা সফলও হয়েছি সেসময়েই (১৯৮৮র অক্টোবরে) কর্মসূত্রে আমাকে দিল্লী চলে যেতে হল। দিল্লী যাবার আগে অবশ্য ঐ বছরেই জানুয়ারীতে আসামে অসমীয়া দৈনিকে একটি নতুন কাগজে আর্ট ডাইরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। তবে বর্তমানে দিল্লীতেই পাকাপাকি থেকে গেলাম। যেজন্যে বাবার নিত্যকার সান্নিধ্য তো হারালামই, উপরন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে নিজের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে।

বাবার কাছে শেখার সুযোগও চিরকালের মত হারালাম। তবুও তিনি যেমন আমার প্রথম প্রেরণা, তেমনই আজও তাঁর স্মৃতিই আমার সহায়।

পূর্ণেন্দু পত্রীর রবীন্দ্রনাথ

মিতা মুন্সী

প্রতিভা বহুমুখী হয়ে আসে কোন কোন ব্যক্তির জীবনে। শ্রম, তিতিক্ষা, সাধনায় সেই প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে এক একটা জীবনকে আলোকময় করে দেয় সাধারণের কাছে। এমনই এক উজ্জ্বল জীবন পূর্ণেন্দু পত্রী। কি কি বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যায় তার তালিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে এরচনা নয়, তবু বিস্ময় জাগে মনে। তিনি কবি, তিনি লেখক, তিনি ইতিহাস সন্ধানী, তিনি তথাকথিত গবেষক না হয়েও নিরলস অনুসন্ধানে লিপ্ত জিজ্ঞাসু পাঠক, তিনি চিত্র পরিচালক। এ সব নিয়েই তাঁব শিল্পী জীবন। আর কোনটিতেই তিনি ব্যর্থ নন। সাফল্য তাঁকে অনাবিল সহজতায় স্পর্শ করে গেছে।

কিন্তু এ তো শুধু এমনিতেই হয়নি। মনন-কে জাগিয়ে রেখেছেন আজীবন। তাই তাঁকে ভাবতে হয়েছে 'শিল্পী ও ব্যক্তি', 'সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র', 'মোনালিসা' 'বঙ্গভঙ্গ', 'রেঁাদা', 'রূপসী বাংলার দুই কবি' 'ছবি, কবি, কবিতা' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে। তেমনি আবার এক কলকাতাকে নিয়েই তাঁর কতই না কৌতূহল! এর প্রমাণ 'কলকাতার রাজকাহিনী', 'কলকাতার গল্পসল্প', 'পুরনো কলকাতার কথা-চিত্র', 'কি করে কলকাতা হল'—কলকাতা সংক্রান্ত এ হেন নানাবিধ রচনা সমূহ। এ সবেব বাইরেও আরও অনেক রচনা—যেমন 'সাহিত্য সংক্রান্ত', 'ইল্লিবিল্লী', 'মালতী মঙ্গল', 'মহারাণী', 'ক্ষুদ্রপট রুদ্র প্রাণ', 'আসুন-বসুন', 'পন্ত পাগলের পাণ্ডুলিপি', 'জেগে আছি', 'ছেলেটি এবং মেয়েটি', 'আমিই কচ আমিই দেবযানী' ইত্যাদি। আর এ সমস্ত চিন্তাভাবনার রাজ্য থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের রচনা মনে হয় তাঁর 'আমার রবীন্দ্রনাথ' বইটি।

একজন শিল্পী আর একজন মহান শিল্পীকে কিভাবে দেখেছেন, কেমনভাবে অনুভব করেছেন তাঁর আজীবন লালিত ধ্যান-ধারণাগুলি, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ গ্রন্থটি।

লেখক পূর্ণেন্দু পত্রী রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করলেন এমন এক মানুষ হিসেবে "যিনি / দাঁড়িয়ে আছেন সমগ্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রে সময়ের সমস্তরকম অপরিপূর্ণতা, ব্যাধিগ্রস্ততা সম্পর্কে যিনি বেদনার্তরূপে সচেতন, আর সচেতন বলেই যিনি তাঁর ভাষার রূঢ়তা, যুক্তির গর্জন / এবং কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রামের কম্পনকেও স্বীকার করে নেন সত্য-উচ্চারণের অথবা উদঘাটনের জরুরি গরজে।"

আর স্বাভাবিক ভাবেই বোধ হয় লেখকেরও আত্ম উন্মোচন আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ নামক এক বিস্ময়কর পুষ্পের এক একটি পাপড়িকে ধীরে ধীরে বোধের

উষ্ণতা দিয়ে দর্শক তথা পাঠকের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবার ঐকান্তিক প্রয়াসে। পূর্ণ ইন্দু তিনি। রবির কাছে ঋণী নন শুধু, রবি-নিবেদিত।

নিবেদনের সে এক অপরূপ ভঙ্গি। নই নই করেও তিনি অনেক কিছুই। তবু প্রধানত একজন শিল্পী হিসেবে, কবি হিসেবে আর একজন শিল্পী তথা কবির দিকে 'নিজের চোখে তাকিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা সুখ-সাধটা'ই প্রবল হয়েছে তাঁর 'আমার রবীন্দ্রনাথ'-এ। আর তাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন রবীন্দ্র রচনার সেই সমস্ত অংশ যা তাঁকে সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বের অলসতম কবি' রূপে চিহ্নিত করতে। অবশ্যই কোন বিরূপতা নয়, কর্মী মানুষের জন্য যে অবকাশ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একান্ত প্রয়োজন অথচ সে অবকাশ মেলেনা সহজে জগৎ সংসারের নানা দায় দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে। আর তাই সেই 'আলস্য অথবা ক্লান্তি অথবা অক্ষমতা অথবা কুঁড়েমিতে' 'আচ্ছন্ন অথবা জীর্ণ' রবিকে তাঁর পত্রাবলীর পাতায় পাতায় খুঁজে নিয়েছেন এযুগের আর এক কবি। মন্তব্য করেছেন নির্দ্বিধায় "জীবন জুড়ে তাঁর এই যে আলস্য যাপনের অভিপ্রায় এ আসলে সেই অখণ্ড অবকাশের জন্যে আকুলতা, যা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সাহিত্য-ভাবনার পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। স্রষ্টার জন্যে চাই প্রকৃতির আড়াল, আর প্রকৃতির পক্ষে এটা খুবই গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর সার্থক সন্তানেরা তারই নিভৃত মাতৃ ক্রোড়ে মানুষ। আর প্রকৃতির বিশ্ব বিদ্যালয়ে আলসেমিটাও একটা আবশ্যিক পাঠক্রম।

যখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেন 'ভায়োলেন্সের কবি' বলে তখন এ উক্তির প্রথম ধাক্কায় চমকে যেতে হয় বইকি! কারণ আমরা তো তাঁকে জেনেছি শান্তির ললিত ক্রোড়ে লালিত সুখী সন্তান হিসেবে। অথচ পূর্ণেন্দু তাঁর স্বাভাবিক কৌতুহল ও অনুসন্ধানী মন নিয়ে আবিষ্কার করেন 'উজ্জীবনের কৈশোর থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে যোদ্ধার পিঠে যেভাবে আটা থাকে তূণীর, কোমরবন্ধে খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার, সেইভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে থেকেছে মুক্তির, প্রতিবাদের, আক্রমণের, সত্য উদঘাটনের, বিদ্রোহের, বিশ্বাসের তীব্রতা, উগ্রতা, প্রচণ্ডতা এবং হিংস্রতা।'

রবীন্দ্র রচনার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চয়ন করেছেন সেইসব উদ্ধৃতি যা তাঁর বক্তব্যের সমর্থন করছে। তাই 'রক্তকরবী'র রাজা যেমন, তেমনি 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ, 'বিসর্জ'নের রঘুপতি, 'মালঞ্চ'র নীরজা আবার 'কালান্তর'প্রবন্ধের 'সভ্যতার সংকট' এর উল্লেখ পাই।

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা' যে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন পূর্ণেন্দু, তাঁর গান ও কবিতার পরম্পরা, রূপান্তর ইত্যাদির নিরিখে তিনি নিয়ম ভাঙার কাজে ব্যস্ত ব্যাপৃত। 'সে-সব নিয়মকে তিনি পেয়েছেন উত্তরাধিকার রূপে। আর তাঁর নিজের সৃষ্টিই, যা ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে আর এক নিয়ম।' খুঁজে পেয়েছেন তাঁর গানে 'ইলাস্ট্রেশন' এবং 'অ্যাবস্ট্রাকশন'-এর অংশগুলি, শিল্পী পূর্ণেন্দু ধরতে

পেয়েছেন 'ছবি আঁকার আগ্রহ অভিজ্ঞতার চাপ থেকে গানে ঝিলিক দিয়ে উঠছে ইলাসট্রেশন [যেদিন তুমি অগ্নিবেশে / সব কিছু মোর নিলে এসে] আর কবিতায় শিথিল হয়ে গেছে যে সব কামনা-বাসনার অন্তরঙ্গ কথোপকথন, তারাই ক্রমশ সংক্ষিপ্ত এবং সংহত হয়ে রূপ নিচ্ছে 'অ্যাবস্ট্রাকশন' এর (আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে / তারই ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে)।

ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' প্রশ্নোত্তর সূত্রে এসেছে সামগ্রিক আলোচনা।

এছাড়াও দেখেছেন 'গানের রবীন্দ্রনাথ' 'গদ্যের রবীন্দ্রনাথ' ও 'ছবির রবীন্দ্রনাথ'কে নিজের চোখের আলোয়। এ দেখা আর এক শিল্পীর চোখে অভিনব দর্শন। আর এই অভিনবত্বের অনুভব পাঠকচিত্তকেও সজীব করে তোলে।
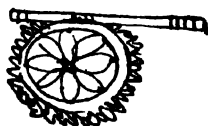
পূর্ণেন্দু পত্রী

হিমাংশু দাস

পূর্ণেন্দু পত্রীর জীবনের একেবারে গোড়ার কথা, বাল্যকালের কথা জানার জন্য আমরা গিয়েছিলাম হাওড়ার শ্যামপুর থানার নাকোল গ্রামে। রূপনারায়ণের কূলে এই গ্রাম! তাঁর বাল্যকাল কেটেছে এই নাকোল গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা, আর মাটির পুতুল গড়ার মধ্য দিয়ে। সেই থেকেই তাঁর শিল্পের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রপাত।

বাড়ির সামনে বিরাট আটচালা, শিব ঠাকুরের ঘর, শানবাঁধান ঘাট, প্রাইমারী স্কুল। পশ্চিমে একটু এগিয়ে রূপনারায়ণের রূপের হাতছানি। এখানকার গ্রাম্য জীবন কিছুটা নদীমাতৃক, কিছুটা কৃষিভিত্তিক, আবার কিছু চাকুরীজীবিও আছেন। আগাগোড়া গ্রামটিতে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজমান।

রূপনারায়ণের কূলে সারি সারি জেলেদের ঘর। বালক পূর্ণেন্দু ছিলেন তাদের আপনজন। প্রতিদিনই পূর্ণেন্দু বিকেলবেলা রূপনারায়ণের কূলে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের রক্তিম বিদায়ক্ষণ দেখতে ছুটতেন। জেলেদের জাল মেলা থাকে অশ্বত্থ গাছের তলায়, এখানেই ছিল তাঁর রূপকথার দেশ। রূপনারায়ণের পাল তোলা নৌকার সারি, আবীর রাঙান ছলাৎ ছলাৎ দিগন্ত প্রসারী অতল জলরাশি। উদাস চোখে সেদিক পানে চেয়ে চেয়ে কাটত তাঁর গোধূলি বেলা।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে পড়তে বসতেন। কিছুক্ষণ কাটতে না কাটতেই বাড়ির ছাঁচতলা পেরিয়ে আটচালায় শুরু হত লোক সমাগম। বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণের নানান পালা, আজ সেখানে কীর্তন তো কাল বাউল। বছর শেষে শীতলা পূজা, যাত্রা পালা, শিবের গাজন। মন কেমন করত বালক পূর্ণেন্দুর। বই ফেলে দৌড় দিতেন সেখানে। মায়ের কাছে বসে কাদা দিয়ে গড়তেন শিব ঠাকুর সরস্বতী আরো কত কি!

আটচালার পাশে পূর্ণেন্দু পত্রীর বাড়ির ছাঁচতলে আমরা যখন ক্যামেরা নিয়ে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ির ছবি নিচ্ছি, তখন গ্রামের অনেকেই আমাদের পাশে ভিড় করেছেন। এখানে আসার পথে আমরা দুর্গাপদ শতপথি মহাশয়কে সঙ্গে নিয়েছি। তিনি পূর্ণেন্দু পত্রী সম্বন্ধে আমাদের না-জানা অনেক কথা জানালেন। বিপ্লব চক্রবর্তী ইতিমধ্যে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে পূর্ণেন্দুর স্মৃতি ঘেরা শোওয়ার ঘর, আটচালার পাশ থেকে বাড়িটির উত্তর অংশের ছবি, সহ বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছেন। সেই সময় পূর্ণেন্দু পত্রীর বাড়ি, বাগান যারা বর্তমানে কিনেছেন তাঁদের একজন আমাদের খাওয়ার জন্য ডাব নিয়ে এলেন।

তারপর আমরা গিয়ে বসলাম দুর্গাপদ বাবুর বাড়িতে। শুরু হল গোড়ার কথা। পূর্ণেন্দুর পিতামহ সারদামোহন পত্রী মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার প্রতাপপুর থেকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেরও আগে এই নাকোল গ্রামে এক জমিদার কন্যাকে বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তার তিন ছেলে। পুলিন বিহারী, গোষ্ঠবিহারী ও নিকুঞ্জবিহারী। পুলিনবিহারী পত্রীর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে পূর্ণেন্দু পত্রী ও মেয়ে সতী। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে পূর্ণেন্দু শ্যামপুরের অনন্তপুর সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে বাগনান থানার মুগকল্যাণ গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

জমিদার বাড়ির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকার কারণেই তাঁর পূর্ব পুরুষ কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। পূর্ণেন্দু পত্রী কংগ্রেস বাড়ির ছেলে হলেও গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে মিশতেন। কাকা নিকুঞ্জবিহারী পত্রী মহাশয়ের সঙ্গে ২০৬ বিধান সরণির শ্রীমানী মার্কেটে একচিলতে বাসায় থাকা-কালীন সরাসরি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তীব্র ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই আর্ট স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে মাঠে ময়দানে, লিটল ম্যাগাজিনের মলাট আঁকায় সময় অতিবাহিত করেন। তারপর আকস্মিকভাবে কমার্শিয়াল আর্টিস্টরূপে ক্রমআত্মপ্রকাশ করেন এবং অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা পান। শ্রীমানী মার্কেটে কাকা নিকুঞ্জ বিহারী পত্রীর ব্লক তৈরার ব্যবসা ছিল। তিনি তখন 'চিত্রিতা' নামে একটি সিনেমা ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন, পূর্ণেন্দু তাতে সহ-সম্পাদনার দায়িত্ব নেন এবং নিয়মিত লিখতে থাকেন। বাগনানে কানাইপুর গ্রামে তখন বামপন্থী লোকজন নিয়ে 'জাগরণ' নামে একটি পত্রিকা বের হয়। পূর্ণেন্দু তাতে নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। সেই সময় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'এক মুঠো রোদ' প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর প্রথম উপন্যাস 'দাঁড়ের ময়না' লিখে মানিক স্মৃতি পুরস্কার পান। প্রথম প্রবন্ধের বই সমুদ্র গুপ্ত ছদ্মনামে 'শহর কলকাতার আদিপর্ব' প্রকাশিত হয়।

চলচ্চিত্রকে ভালবাসা শুরু ষাটের দশক থেকে। প্রথম ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে'। 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবি করতে গিয়ে পূর্ণেন্দু গভীর আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েন। কাকা নিকুঞ্জবিহারী তখন তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তার বেশ কিছু দিন পর দ্বিতীয় ছবি 'স্ত্রীর পত্র' তাঁর হাতে তুলে দেয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং বিপুল খ্যাতি।

তথ্যসূত্র : পূর্ণেন্দু পত্রীর কাকা : শ্রীনিকুঞ্জবিহারী পত্রী ও দুর্গাপদ শতপথি, যিনি নাকোল গ্রামের বাসিন্দা এবং পূর্ণেন্দুর কাছের লোক।

বালক পূর্ণেন্দুর খোঁজে নাকোলে একটি দিন

অচেনা সুর

গত ১লা মার্চ '৯৮ রবিবার কয়েকজন বন্ধু মিলে হাজির হয়েছিলাম হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত নাকোল গ্রামে। ঐ গ্রামেই জন্ম নিয়েছিলেন প্রখ্যাত প্রতিভাধর কবি শিল্পী ৺পূর্ণেন্দু পত্রী।

ঐ দিন সকালে বন্ধু তপন কর ও অমর হাজরা মিলে বাগনান-শ্যামপুর রুটের বাসে নাউল হাট স্টপেজে পৌছলাম বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ। ওখানে হাজির থাকার কথা ছিল 'অণ্বেষন' পত্রিকার সম্পাদক হিমাংশু দাসের। কোন কারণে ঐ সময়ে শ্রীদাস হাজির না থাকতে পারায় আমরা নাউল বাজারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাটের পশ্চিমের পথ ধরে নাকোল গ্রামে হাজির হলাম।

গ্রামে ঢুকেই চোখে পড়ল পত্রী বাড়ীর স্মৃতি সৌধগুলি। স্থানীয় লোকেদের মুখে জানলাম এগুলোই পত্রীদের বাড়ী। শান বাঁধান পুকুর এবং "ওঁ পিতৃ ধাম" নামে দক্ষিণ দুয়ারী দোতলা বাড়ী দেখিয়ে জানালেন ওটাই ৺পূর্ণেন্দু পত্রীর যৌবনের উপবন। এখন ঐ বাড়িটি যুধিষ্ঠির কর মহাশয়ের দখলে। পূর্ণেন্দুর বাবা শ্রীপুলিনবিহারী পত্রী মহাশয় ৭/৮ বছর আগে পুকুর ও বাড়ী সহ কর পরিবারকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

'ওঁ পিতৃ ধাম' বাড়ীর চুড়ায় লেখাটি চোখে পড়ছে। আমরা বাড়ীর কাছে যেতেই যুধিষ্ঠির করের ছেলে গৌর কর এগিয়ে এল। তার সঙ্গে টুকিটাকি কথা-বার্তা বলাতে বাড়ীর ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানাল। ভিতরেতে আমি ও অমর গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এলাম। এখন তো সেটি অন্যজনের বাসস্থান। অতএব একটা মৌন ও চাপা ব্যথা নিয়ে বাইরে আটচালা ও পাশে শিব মন্দিরে গিয়ে বসলাম।

ক্যামেরাম্যান অমর ততক্ষণে "ওঁ পিতৃ ধাম" সহ আটচালা ও শিব মন্দিরের ছবি তুলে নিল। ওদিকে তপনবাবু পাশে 'মোর গেহ' নামে বাড়ীটির কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন গ্রামেরই যুবক সদানন্দ প্রামানিকের সঙ্গে।

ঐ শিব মন্দিরটি যখন স্থাপিত হয়েছিল তার প্রমাণ শ্বেত পাথরের ফলকে খোদাই করা আছে। ১৩৫৪ সালের শ্রীসারদা প্রসাদ মাইতি গ্রাম সাঁইবেড়ে কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আটচালাটির প্রস্তুত কারক ছিলেন শ্রীনবনীকান্ত সা ও পূর্ণচন্দ্র সাঁতরা, সাং ওবমানপুর তারিখ ১৩৪৮ সালের ১লা চৈত্র। অর্থাৎ তৎকালীন 'ওঁ পিতৃ ধাম'-এর লাগোয়া আটচালা ও শিব মন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন পূর্ণেন্দুর বয়স ১৬-১৮ হবে। তরুণ পূর্ণেন্দুর এখানে খেলাধুলা ঘোরা ফেরা ছিল।

নিঃস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশ। চারিদিকে মাঠে বিকল্প ধানের চাষ, সবুজ প্রান্তর নারকেল আম জাম বাঁশ বনের ভেতরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম নাকোল। ৫/৭ জন তরুণ তরুণী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে সুব্রত সামন্ত ও অনসূয়া প্রামানিক-এর সঙ্গে পূর্ণেন্দু নিয়ে টুকিটাকি কথাবার্তা বলে যা জানতে পারলাম তা হল পূর্ণেন্দু পত্রী বড় মাপের শিল্পী ও কবি তা পত্র-পত্রিকা বা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ইদানীং ওরা জানতে পারছে। তাঁকে সামনাসামনি তাদের গ্রামের অনুষ্ঠানে কখনও দেখতে পায়নি। তিনি এত বড় মাপের মানুষ ছিলেন সেটা এখন অনুভব করতে পারছে। আগামী দিনে তাঁকে নিয়ে যদি আমাদের এলাকায় কোন কিছু অনুষ্ঠান হয় তাতে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করবে বলে অভিমত জানাল।

এমন সময় ওদের মধ্যে একজন জানিয়ে দিল যে নিকুঞ্জবিহারী পত্রী পূর্ণেন্দু পত্রীর কাকা এসে গেছেন। ওঁর কাছে অনেক তথ্য বা খোঁজ খবর জানতে পারবেন। এ কথা বলতে আমরা গিয়ে তাঁর সামনা সামনি হাজির হলাম। সেই সৌম্য কান্তি এক ঝাঁক সাদা পাকা ঝাঁকড়া বাবরি চুলে ভরা চোখে চশমা পরিহিত ব্যক্তিটিকে প্রণাম জানিয়ে পরিচিত হলাম। তপনদা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার একটি ছেলে, যে নিকুঞ্জবাবুর কাছের মানুষ সদানন্দ প্রামাণিককে বললেন বাড়ীর ভেতরে বসাতে। ওঁর বাড়ীটি পূর্ণেন্দুদের বাড়ীর পাশেই। বাড়ীটির নাম 'মোর গেহ'। দোতলা বাড়ীর একটি ঘরে নিকুঞ্জ বাবু বসালেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে আসার সময় তপনদার নজর পড়েছিল দেওয়ালে কয়েকটি বাঁধান ছবি টাঙান আছে। তার মধ্যে একটিতে পূর্ণেন্দু পত্রীর ছেলেবেলাকার ছবি বলে অনুমান করল।

কথায় কথায় নিকুঞ্জ পত্রীর কাছ হতে ছেলেবেলাকার খবরাখবর করার চেষ্টা চলল। এবং তিনি পূর্ণেন্দুর সম্পর্কে যা মনে পড়ে তা বর্ণনা দিতে থাকলেন। আমাদের খবর বিশেষ করে তপনদার খবর পাশের গ্রামের হিমাংশু দাস ওঁকে বলে রেখেছিলেন, তা জানালেন। সেই কারণে উনি আজ নাকোল গ্রামে থেকে গেছেন। নইলে গতকাল কলকাতার বাড়ীতে ফিরে যেতেন। ঐ কথা শুনে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ইতিমধ্যে তপনদা পূর্ণেন্দুর সাহিত্য শিল্প জীবনের কোন লেখা পাণ্ডুলিপি, আলোকচিত্র বা বই পত্তর তাঁর সংগ্রহে আছে কিনা জানতে চাইলে উত্তরে নিকুঞ্জ বাবু জানালেন তেমন কিছুই নেই। তপনদা জানালেন—সিঁড়ি দিয়ে আসার সময় দেখেছি দেওয়ালে কতকগুলি বাঁধান ছবি ঝুলছে, ওখানে একটিতে পূর্ণেন্দুর ছবি রয়েছে বলে মনে হল। তখন তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে জানালেন 'হ্যাঁ একটি ছবি আছে যেটিতে আমার সঙ্গে। ওটা যৌবনে পূর্ণেন্দু।'

'ছবিটির একটা Take up নেব' তপনদা ওঁকে বললেন।

কি ভাবে নেব তা প্রশ্ন করলে নিকুঞ্জবাবুকে বললাম ফ্রেমটি সাবধানে খুলে কাঁচটিকে আলাদা করে shot নিয়ে আবার ফ্রেমে লাগিয়ে দেব।

তখন সদানন্দ নামে ছেলেটিকে ছবিটি পেড়ে আমাদের হাতে দেবার কথা জানালেন। দোতলায় পাশাপাশি আরো দুটি বয়স্ক ভদ্রলোকের ছবি ছিল। ওগুলো কাদের তা জানতে চাওয়া হলে উনি জানালেন একটি যেটিতে হুকোয় ধূমপানরত ছবি ওটি পূর্ণেন্দুর বাবা। অপরটি যেটি গড়গড়া পান করছে মাথায় চাদর মুড়ি দেওয়া মোটা গোঁফ ওটা তার দাদু সারদাপ্রসাদ পত্রী।

ওগুলোরও Take up নেব বলে তপনদা অনুরোধ জানালে তা সাবধানে পেড়ে দিতে সদানন্দকে বললেন। সেগুলো অমর ও আমি নীচে রোদে উঠানে জড়ো করলাম! ধুলো ময়লায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবিগুলির ফ্রেম হতে কাঁচ সরিয়ে আলাদা করে রাখলাম।

এরপর তপনদা নিকুঞ্জবাবুকে পূর্ণেন্দুর লেখা ছবি বা প্রচ্ছদ কোন পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তা সংগ্রহে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উনি পাশের ঘরে এলেন। পিছনে পিছনে আমরা হাজির হলাম। অন্ধকার ঘরে ধুলো ময়লা মাকড়সার জালিতে ভরা দেওয়াল-আলমারি খুললেন। তা দেখে মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল। বিভিন্ন রচনাবলির সংস্করণ পোকায় কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। নিচের তাক্ হতে 'চিত্রিতা' নামে মোটা সোটা সিনেমা পত্রিকা, ৫/৬টা কপি তপনদা টেনে বের করলেন। ওগুলো রোদে দিতে বললে তা নীচে নামিয়ে আনলাম।

যত্ন নেবার লোকের অভাবে ঐ সমস্ত বই পত্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিকুঞ্জবাবু-র সম্পাদনা ও প্রকাশনায় কলকাতা হতে প্রকাশিত সিনেমা পত্রিকা 'চিত্রিতা' যার মূল্য তখনকার বাজারে ২॥ টাকা দেখা গেল। ঐ সংখ্যাগুলির অধিকাংশতে পূর্ণেন্দু প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বা পরিকল্পনা রয়েছে। তাতে পূর্ণেন্দুর কবিতাও ছাপা আছে।

'চিত্রিতা' পত্রিকা হতে বিভিন্ন সময়ের সংখ্যাতে পূর্ণেন্দুর কবিতা বের হয়েছিল সেগুলোর কপি করতে বসে গেলাম। কবিতাগুলো হল ১৩৮৩ সালের শারদীয়া সংখ্যাতে প্রকাশিত 'দুঃখের ভিতরে ফুলের বাগান' শারদীয়া' ১৩৮৮ সালে প্রকাশিত কবিতা 'মূলতঃ সে' এবং ১৩৯০ খ্রীঃ শারদীয়া সংখ্যায় 'তুমি মুখ ফেরাবে কি করে' কবিতা।

ওদিকে তপনদা অনিল সিং এবং সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য' ১ম বর্ষ কয়েকটি সংখ্যার বাইণ্ডিং সেট এর সন্ধান করে নীচে উঠানে নিয়ে এসেছেন। তা হতে পূর্ণেন্দুর লেখা চার পৃষ্ঠা ব্যাপী ১০৫ লাইনের কবিতা নকল করতে বসে গেছেন। কবিতার নাম 'রবীন্দ্রনাথের স্মরণার্থে' যার ১ম ছত্রটি হল 'আমার সমগ্র সত্তার আকাশে তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক' ওটি ১৩৫৭ সালে ভাদ্র সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সময় অভাবে পুরোটি নকল করা সম্ভব হল না। আর একটি দীর্ঘ কবিতা

৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ১৯৬ পংক্তি যার প্রথম লাইন 'একবার বিদায় দে মা।' সেটিও ঐ সালের অষ্টম সংখ্যাতে প্রকাশ লাভ করেছিল। ঐ পত্রিকার কার্যালয় ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট কলিকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত হত।

খোলা আকাশের নীচে 'মোর গেহ' বাড়ীর উঠানে রোদে ঝলমল পরিবেশে একটা মেলা বসে গেছে। বই পত্তর ছবি-ছাবার বাহার ও তা অপরিষ্কার ও ধুলি বালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তা পরিষ্কার করে আবার সেই দেওয়াল আলমারিতে সাজিয়ে রাখলাম। যদি আরো কিছু দিন যত্নে থাকে। নিকুঞ্জবাবুর শারীরিক অবস্থা যা, কখন কি ঘটে যায়। তবে ৮৬/৮৭ বছরের বয়স্ক মানুষটি এখনও মানসিক দিক হতে যুবার মত আমাদের সাহায্য করতে দেখে বড়ই আনন্দিত হলাম।

এদিকে সদানন্দ আমাদেরকে গাছের ডাব খাওয়াল। যেগুলি পূর্ণেন্দুবাবুর কাকা নিকুঞ্জবাবুর বাগানের, ওগুলো আগে থেকেই পাড়িয়ে রেখেছিলেন। সেই সঙ্গে চা জলপানেরও আয়োজন। সেদ্ধ ডিম বিস্কুট ও চা দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়নে আমরা আনন্দিত। আমরা এমন বিশেষ অতিথি নই, কেবলই সাহিত্য সংস্কৃতি রস পিপাসুর দল। তাই ওঁর দিক থেকে এতটা করা আমাদের কাছে পরম প্রাপ্তি।

বেলা তখন ১টা। বন্ধু অমর হাজরা জরুরী কাজে ফিরে যেতে হবে বলে ছটপট করছে। তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা দু'জনে (তপনদা ও আমি) ঐ সমস্ত ছড়ান ছিটান বই-পত্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রোদ থেকে তুলে রাখলাম, আলমারিতে ভরে দিলাম।

ইতিমধ্যে নিকুঞ্জবাবু পাশের বাড়ীতে স্নান করে খেতে গেলেন। সদানন্দকে দেখা শোনার জন্য বলে গেলেন।

এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে সাইকেল নিয়ে প্রবেশ করলেন হিমাংশু দাস বাবু। তাঁর বিলম্বের কারণ জানালেন, আমাদের দুপুরের আহারাদির জন্য নিজের পুকুরে মাছ ধরতে ও খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতেই ঐ নাউল হাটে অপেক্ষা করতে পারেন নি। তার জন্য একজনকে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের সংবাদ দেবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউই ওখানে ছিল না। তবে এখানে পৌঁছাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি।

থাক্‌গে ফেরার পথে···দাসবাবুর বাড়ী হয়ে আবার নিজ নিজ বাড়ীর পথে পাড়ি দেব এই আশ্বাস দিলাম। নিকুঞ্জবাবু খেয়ে ফিরে এলেই কয়েকটি ছবি তুলে নিয়ে আমাদের আজকের অভিযান সমাপ্ত হবে।

পারিবারিক কয়েকটি বাঁধান ছবি হতে Take up নিলেন তপনদা। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকারও কিছু কিছু ছবি তুলে নিলেন।

এমন সময় দুর্গাপদ শতপতি বাবু এলেন। তাঁকে আগেই 'অন্বেষণ' পত্রিকার

সম্পাদক শ্রী দাস বলে রেখেছিলেন এখানে আসার জন্য। সেই মত উনি এসে সরাসরি তপনদার নাম শুনে পরিচিত হলেন। উনি তপনদার বাবা শিশির ওরফে পঞ্চানন করের সঙ্গে অনেক আগে চাকুরী সূত্রে পরিচিত, অথচ তপন কর জানে না। তাই তপনদা একটু অবাক হলেন।

উনি পূর্ণেন্দুর সমসাময়িক। তাই তিনি পূর্ণেন্দু পত্রীর ছেলেবেলাকার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানালেন। অনেক অভিযোগের কথাও বললেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করে মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। এই ফাঁকে নিকুঞ্জবাবু ও শ্রীশতপথিবাবুকে এক করে ধরে রাখতে একটি ফটো নিয়ে নিল তপনদা। তাঁদের কাছে যৌথভাবে বিদায় নিলাম হিমাংশু দাসের বাড়ীর পথে কুলানন্দপুর।

এখন বেলা সাড়ে তিনটে। হাটতে হাঁটতে নাউল হাটে। তারপর সাড়ে চারটে নাগাদ শ্রীদাসের বাড়ী ওখানে দুপুরের খাওয়াটি বৈকালিক আহারে পরিণত হল। খেতে খেতে পাঁচটার উপর হয়ে গেল।

কুলানন্দপুর গ্রাম হতে সন্ধ্যা ছয়টার পর রওনা দিলাম। পুবের দিক হতে সবুজ ধান ক্ষেত দেখে গেছলাম, এখন নিঃস্তব্ধ নিঝুম সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ পোকা আর জোনাকী পোকার আলোর ফুলকির মধ্য দিয়ে ফিরে আসছি তপন কর ও আমি। সঙ্গে দাসও রয়েছেন, তিনি বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চলতি ট্রেকার গাড়িতে চেপে সাড়ে আটটা নাগাদ বাগনান ফিরে যে যার বাড়ীর পথে চলে গেলাম।

জীবনের একটি দিন স্মরণীয় হয়ে রইল।

স্মৃতিচারণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

নিমাই শূর

পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার পরিচয় গ্রামে। হাওড়া জেলার বাগনানে। আমার জন্ম ওখানে। পূর্ণেন্দুর বাড়ি বাগনান স্টেশন থেকে দক্ষিণে প্রায় বার মাইল দূরে। 'নাকোল' গ্রামের নাম।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। কংগ্রেস সরকার দেশে। বাগনান কেন্দ্রেও কংগ্রেস জিতেছে। নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধিতা করায় আমাকে 'টার্গেট' করেছে তখন স্থানীয় কংগ্রেস। আমিও আমার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক [ঐ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন বামফ্রন্ট সমর্থিত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত সতীশ পাঁজা]—কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম, বাঁচার তাগিদে। 'স্বাধীনতা' ও অন্যান্য পত্র পত্রিকা দেখে দেশের রাজনৈতিক গতিপথ বোঝার চেষ্টা করছিলাম। [তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'স্বাধীনতা'] একটা অদৃশ্য আকর্ষণ বোধ করতাম কমিউনিস্ট পার্টির লড়াকু কাজকর্মের প্রতি। গরীব কৃষকদের নিয়ে তেভাগা আন্দোলনের নানা ঘটনাবলী পড়ে খুবই রোমাঞ্চিত হতাম।

একদিন হঠাৎ দুজন যুবক এল বাড়িতে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে। তাঁদের প্রস্তাব গণনাট্য সংঘের একটি শাখা গঠনের। নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে আমি যুক্ত এ কথা এ অঞ্চলের প্রায় সবাই জানত। প্রাথমিক আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঁদের বাড়ির ভিতরে দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। একটু পরে আরও দুজন উপস্থিত হলেন। বুঝতে পারলাম ওঁরা কমিউনিস্ট পার্টির লোক। এই চারজন জ্ঞান চক্রবর্তী [প্রয়াত], শচীন ঘোষ, আলি আনসার ও পূর্ণেন্দু পত্রী।

পূর্ণেন্দুর নামটা শুনে বেশ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ 'পরিচয়' পত্রিকায় তার কবিতা ইতিমধ্যেই পড়েছি এবং তার একটি কবিতার বই 'এক মুঠো রোদ' আমার কাছে ছিল। বেশ উৎসাহ বোধ করেছিলাম।

দীর্ঘ আলোচনার পর গণনাট্য সংঘের একটি শাখা গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু গণনাট্য সংঘ নামের বদলে অন্য নামকরণের প্রস্তাব দিলাম। পূর্ণেন্দু সর্বাগ্রে এ প্রস্তাব মেনে নিল। সে ওই অঞ্চলের লোক। ঐ সময়ে এতদঞ্চলের মানুষের মনোভাব তার জানা। তারই প্রস্তাব মত নাম দেওয়া হল 'সংস্কৃতি পরিষদ'। গণনাট্য সংঘের গঠনতন্ত্রে এ বিষয়ে কোন বাধা ছিল না। একটা

অস্থায়ী প্রাথমিক কমিটিও গড়া হল। সভাপতি পূর্ণেন্দু, সহ সভাপতি অমিতাভ দাশগুপ্ত ও শচীন ঘোষ। কবি অমিতাভ তখন পাণিত্রাস স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ঐ অঞ্চলের বিরামপুর গ্রামের সতীশ পাঁজার বাড়িতে তিনি থাকতেন। আমি সম্পাদক। বাগনান শুধু নয়, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ইতিহাসে 'সংস্কৃতি পরিষদ' এর তৎকালে বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আমাদের বাড়ির রেওয়াজ মত আমার মা লুকিয়ে মাথা গুণে নিয়ে গিয়ে পাঁচজনের জন্যে কিছু খাবার এনে হাজির। মাকে বললাম এঁদের পরিচয়। মা'র আমাকে নিয়ে খুবই ভাবনা। আমার তখন চারিদিকে অনেক শত্রু। আমার পাশে বেশি বেশি লোক এলে মা'র সাহস বাড়ে। পূর্ণেন্দুকে দেখিয়ে বলেছিলাম—'মা, এ একজন বড় কবি'। মা লেখাপড়া না জানলেও আমার মুখে কবিতা শুনতে খুব ভালবাসত। মা খুশি হল। 'আজ থেকে আপনি আমাদেরও মা,—বলে পূর্ণেন্দু মাকে প্রণাম করল। আর সবাইও। সেই আমার জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ণেন্দু পত্রীর একসঙ্গে অনুপ্রবেশ।

অনেকদিন পূর্ণেন্দু বাড়িতে না এলে মা'র মন খারাপ হত। বাড়িতে পিঠে-পায়েস হলে পূর্ণেন্দুর জন্যে মা দুঃখ করত। পূর্ণেন্দুও কলকাতা থেকে বাড়ি যাওয়া ও ফেরার সময় আমাদের এখানে আসতই। 'সংস্কৃতি পরিষদে'র কাজ থাকলে তো বেশ কয়েকদিন বাড়িতে থেকে যেত। সেই সময় থেকেই পূর্ণেন্দুর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম। পূর্ণেন্দুর গঠন, 'হিউমার' দিয়ে কথা বলার ধরন, হাসি, চাউনি সব মিলিয়ে প্রথম দিন থেকেই ওকে স্বতন্ত্র বলে মনে হত। পূর্ণেন্দুর উদ্দেশ্যে সদ্য প্রকাশিত একটি 'স্মারকগ্রন্থে' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন —"ব্যক্তি পূর্ণেন্দু মানুষটাও অনেকের থেকেই ব্যতিক্রমী"। যত আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল ততই মুগ্ধ হয়ে ওর অলক্ষ্যে ওর দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ওকে আমার কেমন যেন অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হত। ওর মৃত্যুর আগের দিন হাসপাতালের বিছানায় দেখেও ঐ একই প্রতিক্রিয়া আমার হয়েছিল। কয়েকটা অন্য ঘটনা বলি।

বাগনানে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বাড়তে থাকে। পঃ বঃ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বাগনানে। এ ব্যাপারে আহুত পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের যুক্ত সভায় সম্মেলনকে সফল করার জন্য একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি, কয়েকটা উপ-সমিতি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অমল গাঙ্গুলি [প্রয়াত গত ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ রবিবার সকাল ৫-২৫ মিনিটে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।] সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী, [প্রয়াত] সহ-সম্পাদক আমি কোষাধ্যক্ষ নিতাই আদক। সাংস্কৃতিক উপসমিতির চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হয় পূর্ণেন্দু। কৃষকদের সংগ্রাম কাহিনী—মূলতঃ তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় নানা ঘটনা সম্বলিত চিত্র নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপে একটি প্রদর্শনী করার সিদ্ধান্ত নেয়

পূর্ণেন্দু। যতদূর মনে পড়ে ঐ কমিটিতে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ছিল স্থানীয় নিতাই দাস, দিগেন মুখোপাধ্যায়, রবি ধাড়া প্রমুখ। তাছাড়াও সম্মেলনের প্রচার বিভাগের দায়িত্বও ছিল এদের। পোস্টার, ব্যানার, গেট প্রভৃতি দিয়ে সম্মেলনকে নান্দনিক ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পূর্ণেন্দুর নেতৃত্বে এই টিম দিন রাত পরিশ্রমে সারা বাগনানকে রঙে মুড়ে দিয়েছিল। শুধু লাল রঙ নয়, বিচিত্র সব রঙের বাহারের আকর্ষণে পথ চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে পোস্টার-হোর্ডিং ব্যানার দেখত। এখনকার মত তখন অর্থের প্রাচুর্য ছিল না। অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজ, রঙ দিয়ে সম্মেলনের মণ্ডপের প্রদর্শনীকে পূর্ণেন্দু দলবল নিয়ে এমন আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছিল, যার জন্যে প্রদর্শনী দেখতে দলে দলে মানুষ মণ্ডপে হাজির হত। নানা কবিতার 'লাইন', শ্লোগান সম্বলিত আঁকা বড়া কমলাপুরের সংগ্রামের ঘটনা, কাকদ্বীপের কৃষকদের মরণপণ লড়াইয়ের কাহিনীভিত্তিক ছবিগুলো সেদিন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে। সম্মেলনের পরেও এই সিরিজ নিয়ে 'সংস্কৃতি পরিষদে'র উদ্যোগে অনেক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও আঞ্চলিকভাবে প্রদর্শনী করা হয়েছিল। একটা 'ক্যাম্পেনের' মত। এই চিত্রগুলির আকর্ষণে সে সময়ে স্থানীয় অনেক গোঁড়া কংগ্রেস বাড়ির ছেলে মেয়েরাও 'সংস্কৃতি পরিষদের' সদস্য হয়েছিল।

ঐ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জ্ঞানদা মণ্ডপের একটি হোগলার ঘরে স্থায়ী আসন গাড়েন। স্থানীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ সম্মেলন ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য অনেকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। চটে ঘেরা বিশাল মণ্ডপের বাইরে প্রতি রাতে পাহারা দিত স্বেচ্ছাসেবকরা, যাতে কোন অবাঞ্ছিত বিপজ্জনক ঘটনা না ঘটে। প্রতি রাতে মিটিং থেকে ঠিক হত কারা পাহারা দেবে।

সেদিন, যতদূর মনে পড়ে, সম্মেলনের চতুর্থ দিন। ক্লান্ত শ্রান্ত কমরেডদের উদ্দীপ্ত করতে জ্ঞানদা সে রাত্রে পাহারা দেবার তালিকায় নিজের নামটা দেন। সর্দি কাশিতে ক'দিন ধরেই জ্ঞানদা ভুগছিলেন। আমরা সবাই আপত্তি করলাম। কিন্তু জ্ঞানদার যুক্তির কাছে আমাদের আপত্তি ধোপে টিকল না। হঠাৎ সকলকে চমকে পূর্ণেন্দু বলল, "ঠিক আছে, আমি তো রোজ রাতেই ঘুমোচ্ছি। আজ জ্ঞানদার সঙ্গে আমিও থাকব, হারুদা তুমিও আজ থাক।" হারুদা—হারাধন চট্টোপাধ্যায় [প্রয়াত] অমলদা [গাঙ্গুলি] স্বভাব সুলভ স্নিগ্ধ অথচ পরিহাসের সুরে বললেন, "হ্যাঁ, সারা রাত ধরে কবিতা শোনাবে পূর্ণেন্দু ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু জ্ঞানবাবু তো কানে ছোট—সারারাত চেঁচাতে পারবে তো পূর্ণেন্দু। অবশ্য হারুর বাজখাই গলার শ্যামাকেত্তন শুনতে পাবে।"

পরের দিন সকাল। জ্ঞানদা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বিষ্ণুদা [মণ্ডল, প্রয়াত] এসে দেখে ওষুধ দেন। কিছুক্ষণ পরে মণ্ডপের মধ্যে হোগলার

উপর জ্ঞানদা মারা যান।

দাবানলের মত এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক এসে মণ্ডপে ভিড় করতে লাগল। সবাই শোকস্তব্ধ। শোকাহত পূর্ণেন্দু নিজেকে অপরাধী ভেবে কেঁদে ভেঙে পড়ল। বাগনান সেদিন জ্ঞানদাকে নিয়ে যে বিশাল মিছিল পরিক্রমা করেছিল—সে ইতিহাস আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে। এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে তুলি দিয়ে জ্ঞানদার একটা আবক্ষ ছবি এঁকেছিল পূর্ণেন্দু। সেটা সে নিজে বুকে চেপে ধরে মিছিলের সামনে হেঁটেছিল।

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের প্রাক্কালে সারা দেশে ব্যাপক ধরপাকড় করে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস সরকার। আমাকে ও আনসারকে সিকিউরিটি এ্যাক্টে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। দমদম সেন্ট্রাল জেলে। এটাই ছিল আমার প্রথম কারাবরণ। এতে মা খুবই শোকাহত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। পূর্ণেন্দু কাগজে সংবাদ দেখে সেদিনই কলকাতা থেকে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল। কয়েকদিন মায়ের কাছে সে ছিল। ঐ খাদ্য আন্দোলনের সময় দেউলটিতে পুলিশের গুলিতে একজন নিরীহ কৃষক মারা যায়। পূর্ণেন্দু তৎকালীন ঘটনাবলী নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছিল, আমাদের বাড়িতে থেকে। জেল থেকে ফিরে আসার পর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমায় শোনায়। তখনও সে নামকরণ করেনি।

বেশ কিছুদিন পর পূর্ণেন্দু একদিন এসে কাগজের মোড়ক খুলে একটা বই আমাকে দিল। 'দাঁড়ের ময়না'। সুন্দর নাম। ও বলল "খুলে দেখ"। খুলে চমকে উঠলাম। আনন্দে দিশেহারা হয়ে চীৎকার করে মাকে ডাকলাম। বললাম "মা, পূর্ণেন্দুর প্রথম উপন্যাস 'দাঁড়ের ময়না'—আমাকে উৎসর্গ করেছে। এই দ্যাখ।" পাতাটা মায়ের চোখের সামনে খুলে ধরলাম। পূর্ণেন্দুর মুখে সেই রহস্যময় ভুবন ভোলান হাসি।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। বাগনানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে অমলদা জিতেছেন। জয়োল্লাসে সারা অঞ্চল মুখরিত। পূর্ণেন্দুর এলাকা থেকেও ফরওয়ার্ড ব্লকের শশবিন্দু বেরা জিতেছেন। যুক্তভাবে একটা মিছিল বাগনান পরিক্রমা করেছিল। ঐ মিছিলে পাশাপাশি হেঁটেছিলাম দুজনে পূর্ণেন্দু ও আমি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অমলদার সঙ্গে পার্টির নানা বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষ করে ব্যক্তি ও পার্টির অবস্থান নিয়ে। ক্রমে ক্রমে তা চরমে ওঠে। অমলদা পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পার্টিও তাঁকে বহিষ্কার করে ও আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগ করার দাবি জানায়। পার্টির দাবি মেনে অমলদা আইন-সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

সমগ্র বাগনান অঞ্চল জুড়ে প্রচণ্ড সোরগোল দেখা দেয়। বাগনানে তখন

অমলদার প্রচণ্ড প্রভাব। অসংখ্য মানুষ তাঁকে বুক দিয়ে ভালবাসে। পার্টিকে রক্ষা করতে জ্যোতিবাবু বাগনানে গিয়ে সভা করেন। লোকাল কমিটির সম্পাদক সত্যেন ব্যানার্জি, কৃষক নেতা তারাপদ সাঁতরা প্রমুখ পার্টি থেকে সরে গিয়ে অমলদার পাশে দাঁড়ায়। অমলদার প্রতি অবিচার করা হয়েছে এ অভিযোগ অসংখ্য মানুষের মত সেদিন পূর্ণেন্দুরও ছিল। সেই সময়ে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য অনেকের সঙ্গে আমিও যুক্ত হয়ে পার্টির পেছনে শক্তভাবে দাঁড়াই। ঐ সময়ে পার্টি আমাকে লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করে। দুজনের এই পৃথক অবস্থানের কারণে দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধান স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। পার্টি ভেঙে দু-ভাগ হয়ে যাওয়ায় আমাদের মত সাধারণ কর্মীরা বিভ্রান্ত। নানা বিষয়ে খাপ খাওয়াতে না পেরে পার্টি থেকে আমিও পদত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপন করতে থাকি। বাবা মারা যাওয়ার জন্য সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়ি। মাঝে মধ্যে কলকাতায় যাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায় পূর্ণেন্দুর কাছে গিয়ে দেশ ও বিদেশের অবস্থা জানার বোঝার চেষ্টা করি। কফি হাউসে গিয়ে আড্ডাও দিই কোন কোন দিন।

এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরান বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার তা ভাঙতে থাকে। পূর্ণেন্দু ক্যামেরা নিয়ে দিনের পর দিন পুরান সেই ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে ফেলার চিত্র ক্যামেরাবন্দী করার কাজে নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন রাত ওখানেই পড়ে থাকত। বাগনান থেকে গিয়ে আমিও তখন ওর ক্যামেরা ব্যাগ ইত্যাদি সরঞ্জাম বইতাম সারা দিন ধরে। আবার রাতের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে আসতাম।

মৃত্যুর পূর্বে বাবা একটি পেল্লায় নতুন বাডি বানাচ্ছিলেন। বাড়ি তৈরির মাঝখানেই তিনি হঠাৎ মারা যান। ফলে বাধ্য হয়েই ঐ অসমাপ্ত বাড়ি শেষ করার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল আমার কাছে। পূর্ণেন্দুর চিঠি। চিঠিতে লেখা —"পত্রপাঠ চলে আয়। 'স্বপ্ন নিয়ে'র জন্য তোকে দরকার। দেরি করিস না।"

জানতাম ও ফিল্ম করছে। কাগজেও দেখেছিলাম। কিন্তু আমি কি করব? গাঁয়ের লোক। ফিল্মের কিছুই বুঝিনা। কিন্তু পূর্ণেন্দুর ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার ছিলনা। বাড়ি তৈরির অর্দ্ধ সমাপ্ত কাজ অসমাপ্ত রেখে কলকাতা অভিমুখে রওনা দিলাম। চলে এলাম পূর্ণেন্দুর নতুন ডেরা বাঙুর এ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে। সব ঘটনা জানলাম। আগের 'টেকনিসিয়ানরা' নানা কারণে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। সমস্ত প্রোডাকসনের দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। খুবই দুরুদুরু বুকে কাজে নেমে পড়লাম। C. T. W. U-র সদস্য না হলে কাজ করা যাবে না। বন্ধু অজিত লাহিড়ির সহযোগিতায় সদস্য পদ পেয়েও গেলাম। কিছুই জানিনা।

হাতে কলমে কাজ করতে করতে শিখতে লাগলাম সব। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় গোবিন্দ চ্যাটার্জীর কথা। 'স্বপ্ন নিয়ে'র এডিটর। আমাকে বলা চলে তিনিই হাত ধরে নানা কাজ শিখিয়েছেন, আর ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শুরু হল নতুন জীবন। শুরু হল—লড়াই—কঠিন লড়াই।

এই 'স্বপ্ন নিয়ে' নিয়ে অনেক ইতিহাস। সেসব সবিস্তারে বলার ক্ষেত্র এটা নয়। যা বলার তা হল পূর্ণেন্দুকে এ কাজে যেন নতুন করে অবিষ্কার করলাম। পূর্ণেন্দুকে যত দেখতাম ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম। কি নিষ্ঠা, কি চেষ্টা, কি অদম্য উৎসাহ! প্রচণ্ড অর্থ সংকট। টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পূর্ণেন্দুর পাগলামি (?) দেখে অনেকেই পাশ থেকে সরে চলে গেছে। কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর যোগান দেওয়া অর্থভাণ্ডারও শেষ। তার মধ্যেও পূর্ণেন্দুর স্বপ্ন দেখার কোন বিরাম নেই। চিত্রনাট্য লিখেই পরম আগ্রহে, দৃশ্যটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে যেত। কবে চিত্রায়িত হবে, টাকা কোথা থেকে আসবে এ সবের চেয়ে সব বিষয়ে 'পারফেকশন' এর চিন্তায় মশগুল, খুঁটিনাটি বিষয়ে (Details) প্রখর দৃষ্টি। এসব দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম দিনের পর দিন।

সেই চরম লড়াইয়ের কথা মনে হলে—যার কথা পূর্ণেন্দুর পাশাপাশি মনে পড়ে সে উমা। পূর্ণেন্দুর স্ত্রী। সংসারে প্রচণ্ড অভাব। সংসারটাকে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত বয়ে চলেছে উমা একা। কোন সমস্যা প্রকট হলে দুজনে পরামর্শ করেছি। দুজনেই সজাগ থাকতাম, পূর্ণেন্দু যেন কিছু বুঝতে না পারে।

পূর্ণেন্দুর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অরোরা তখন খুব কম বাজেটে ফিল্মটা শেষ করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। সেইভাবেই ফিল্মটা একদিন শেষ হয়। পূর্ণেন্দুর 'স্বপ্ন নিয়ে'র স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

'স্বপ্ন নিয়ে' ছবি শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন আমরা আবার বিচ্ছিন্ন ছিলাম। একটা ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল দুজনের মধ্যে। অবশ্য তার অবসান হয়ে আবার আমাদের পুনর্মিলন ঘটেছিল—বেশ কিছুদিন আগে।

মাত্র কয়েকদিন আগে নন্দনে পূর্ণেন্দুর বাৎসরিক প্রয়াণ তিথিতে অনুষ্ঠিত 'স্বপ্ন নিয়ে' ফিল্মটি দেখলাম দীর্ঘদিন পর। পূর্ণেন্দুর প্রথম উপন্যাস 'দাঁড়ের ময়না' ও প্রথম ফিল্ম 'স্বপ্ন নিয়ে' এই দুই মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে আমায় যে সম্মান সে দিয়েছে—এ তার মহত্ত্বেরই পরিচয়। যার জন্যে আমার আনন্দ ও গর্বের শেষ নেই!
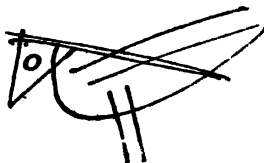
পূর্ণেন্দু

পুলিনবিহারী পত্রী

আজ আমি যার জীবনী লিখছি সে আমার একমাত্র পুত্র পূর্ণেন্দু পত্রী। যার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি প্রায় দৃষ্টিহীন, শ্রবণশক্তি-হীন ও চলৎ শক্তিহীন বিরানব্বই বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতা।

লোকে আত্মজীবনী লেখে অথবা পুত্র পিতার জীবনী লিখে থাকে। পিতা পুত্রের জীবনী লেখে বা লিখেছে কিনা আমার জানা নাই। যদি কেউ লিখে থাকেন আমি তাঁর দলভুক্ত হলাম।

তার জীবনী লিখছি বটে তবে কতদূর কৃতকার্য হব তা বুঝতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি অনেক কমে গেছে। সাল তারিখ প্রায় মনে নাই বলা চলে। ঘটনাবলীও সব মনে নাই। যা মনে আছে তা-ও ঠিক ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারব কি না ঠিক করতে পারছি না। আগের ঘটনা পরে পরের ঘটনা আগে এসে যেতে পারে। আর তার বাল্যের বা কর্মজীবনের অনেক ঘটনাই আমার অজানা, কারণ তার বাল্যে আমি ছিলাম কলিকাতায় চাকরিস্থলে। সে থাকত দেশে। আবার তার কর্মজীবনে সে থাকত কলিকাতায়, আমি অবসর নিয়ে থাকতাম দেশে। তবুও আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তার জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার তুলে ধরতে।

আমাদের বংশে কেউ সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান লেখক বা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। তা সত্বেও পূর্ণেন্দু এমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও লেখক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল নিজের অমানবিক পরিশ্রমে, অধ্যবসায় ও তার কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর ভালবাসা ও সাহায্যে।

কারও জীবনী লিখতে হলে তার পিতৃ পরিচয় ও পারিপার্শ্বিক বিষয় জানান দরকার। তাই তার জন্মস্থান বংশ পরিচয় ও পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়েই লেখার সূত্রপাত করছি।

১

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার শ্যামপুর থানার 'নাকোল' নামে এক গণ্ড গ্রামে তার জন্ম হয়, বাংলা ১৩৩৭ সালের মাঘী পূর্ণিমার মধ্য রাত্রে, ইংরাজি ১৯৩১ সাল ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার।

পিতা পুলিনবিহারী পত্রী। পিতামহ ৺সারদাপ্রসন্ন পত্রী। মাতা নির্মলা পত্রী। পূর্ণেন্দুর জন্মকালে তার পিতামহ ও পিতামহী জীবিত ছিলেন। আমরা তিন ভাই। সকলেই বিবাহিত, কিন্তু তখনো কারও কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। পূর্ণেন্দুই বংশের প্রথম সন্তান।

আমার বিবাহ হয়েছিল বাংলা ১৩৩১ সালে। পূর্ণেন্দু জন্মেছিল ১৩৩৭ সালে। এই সময়ের মধ্যে কোন ছেলে-পুলে না হওয়ায় পল্লীগ্রামের অন্ধ সংস্কারে বহু ঠাকুরের কাছে মানত ও নানা প্রকার তাগা ও মাদুলি ধারণ করবার পর পূর্ণেন্দু জন্ম গ্রহণ করে। এই বিষয়ে পূর্ণেন্দু তার 'আমার ছেলেবেলা' নামে এক পুস্তকে যা লিখেছিল তার কিছু অংশ লিখে জানালাম।

হে ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি / বেটা এনে দে কাঁখে করি / সাত বছরের ডাকাডাকি / দেবতা দামী দামী / আট বছরের মাথায় মায়ের / কোলে এলাম আমি।

বাংলা ১৪০০ সালে বৃদ্ধ বয়সে আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি। আর বাংলা ১৪০৩ সালের ৫ চৈত্র, ইংরাজি ১৯৯৭ সালের ১৯ মার্চ বুধবার রাত্রি দুটো চল্লিশ মিনিটে পি জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে হারালাম একমাত্র পুত্র পূর্ণেন্দুকে, যে ছিল একাধারে শিল্পী সাহিত্যিক, কবি, চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক ও প্রচ্ছদ অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী।

সূর্য উদিত হয়ে ধীরে ধীরে তার আলোক রশ্মি ছড়াতে ছড়াতে মধ্যাহ্নে মধ্য গগনে গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। পূর্ণেন্দুও সেইরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হতে যখন পূর্ণতার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে ঠিক সেই সময়ে কাল ব্যাধি তাকে কেড়ে নিয়ে গেল অকালে, মাত্র ৬৬ বৎসর বয়সে। আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে তার তুলি ও কলমে এমন সব ছবি ও লেখা বেরিয়ে আসত যা উচ্চ প্রশংসিত হতই, উত্তরসূরিদের কাছেও তা হত শিক্ষনীয়।

বৃদ্ধ বয়সে পত্নী ও উপযুক্ত পুত্রকে হারান যে কি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না।

পূর্ণেন্দু জন্মেছিল মাঘী পূর্ণিমার দিন মধ্য রাত্রে আমাদের নাকোলের বাড়িতে। মাঘী পূর্ণিমার দিন হিন্দুদের কাছে এক মহা পুণ্যের দিন। তার জন্ম সময় একটা কাগজে লেখা ছিল আমার কাছে। সেই কাগজটা কয়েক বছর আগে সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। আমায় আর ফেরৎ দেয় নাই। আমিও অনাবশ্যক বোধে আর ফেরৎ চাই নাই।

মাঘী পূর্ণিমায় জন্ম বলে আমার বাবা তার নাম রাখলেন পূর্ণেন্দু, আর আমার মা নাম রাখলেন দুলাল। মাঘী পূর্ণিমায় জন্ম। একটা বিশিষ্ট দিন। ওই দিন তার জন্মদিন ধরা হত, ফলে বার তিথি ইত্যাদির প্রয়োজন হত না। তার মা আজ বেঁচে থাকলে তার ছেলে বেলার অনেক কথা বলতে পারত, যা আমার জানা নাই। আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বার্তা হত না। মা ছিল তার কথার একমাত্র প্রিয় সঙ্গী।

পূর্ণেন্দু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমি নাকোলে ছিলাম না। ছিলাম কলিকাতায় কর্মস্থলে। আমার কাছে পত্র গেল। পূর্ণিমার রাত্রে তোমার একটা

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতক খুব রোগা ও কৃষ্ণ বর্ণ। শুনে আমার খুব রাগ হয়ে গেল। বাড়িতেও গেলাম না, পত্রের উত্তরও দিলাম না। বাড়ি থেকে উপর্যুপরি পত্র আসতে লাগল। সহকর্মীরা বোঝাতে লাগল। অবশেষে প্রায় মাস দুই পরে বাড়ি গেলাম। সহকর্মীরা বললেন প্রথম সন্তান সোনা দিয়ে মুখ দেখতে হয়। আমি ৭'০০ টাকা দিয়ে একটি হাফ গিনি নিয়ে গেলাম ছেলেব মুখ দেখার জন্যে। ছেলে দেখে সন্তুষ্ট হলাম না।

পূর্ণেন্দুর নামের মিলে আমাদের ভাইয়ের ছেলেদের নামকরণ হল অর্দ্ধেন্দু, দিব্যেন্দু, শীর্ষেন্দু, অলকেন্দু ও অমৃতেন্দু। সকলের নামের সঙ্গে শেখর যুক্ত ছিল।

পূর্ণেন্দু হল দাদুর নয়নের মণি। দিদার আদরের নিধি। কাকা কাকীমাদের —সকলেরই আদরের, বিশেষতঃ ছোট কাকা নিকুঞ্জবিহারীর। আনন্দের আতিশয্যে কাকা আমাদেব পাড়ার প্রায় ৫০ ঘর বাসিন্দাদের বাড়িতে ৪টি করে রসগোল্লা বিতবণ করেছিল।

মাস তিন-চার পরে দেখি ছেলের আর সে চেহারাও নেই আর সেই কাল রূপও নেই। রঙ হয়েছে খুব গৌরবর্ণ না হলেও বেশ সুন্দর। চেহারা হয়েছে মোটাসোটা গোলগাল। হাতে গলায় খাঁজ পড়েছে। দেখতে হয়েছে যেন নাড়ুগোপাল। মনের রাগ দুঃখ কেটে গেল। মনে স্নেহের ভাব জেগে উঠল। পুত্রমুখ দেখবার জন্য মনে ঔৎসুক্য জেগে উঠত। আবাব সপ্তাহান্তে বাড়ি যেতে আরম্ভ করলাম।

মা ও ঠাকুরমার কোন কাজ থাকলে পূর্ণেন্দুকে দাদুর কাছে শুইয়ে দিয়ে কাজ করতে যেত। ছেলে দাদুর কাছে শুয়ে শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করত।

আমাদের পল্লীগ্রামে এক প্রকার দড়ির দোলনা পাওয়া যায়। প্রতি বাড়িতেই এমন দু'একটি দোলনা থাকে। তাতে বয়স্ক লোকেরাও বসে আবার ছোট ছেলেদের কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে ঘুম পাড়ানও হতে পারত।

একদিন সকালে সেই রকম একটা দোলায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন বাবা। পূর্ণেন্দুব বয়স তখন দেড বছরের মত। পল্লীগ্রামে মেয়েদের কাজের অন্ত থাকেনা। তাই আমার স্ত্রী তাকে বাবার কোলে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ছোট ছেলে চুপ শুয়ে থাকতে পারে না। হাত পা ছুঁড়তেছিল। কলকে থেকে এক টুকরো কাঠের আগুন পড়ে গিয়ে তার গলার খাঁজে আটকে গেল। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলে চিল-চীৎকার আরম্ভ করতে লেগেছে আগুন যে পডে গেছে, বাবা তা জানতে পারেন নি। খিদে পেয়েছে মনে করেছেন। তাই তাকে হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে থামাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খিদের চীৎকার আর যন্ত্রণার চিৎকার একরকম নয়। তাঁর মায়ের কানে গেছে ছেলের চীৎকারের শব্দ আমার মায়ের কানেও গেছে শব্দ। তারা দুজনেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। ছেলেকে বাবার কোল থেকে তুলে নিয়ে দাঁড় করাতে আগুনের টুকরোটা মাটিতে পড়ে গেল ছেলের চীৎকার থামে না। পাড়া প্রতিবেশীদের একটা ছেলেকে ডেকে ডাক্তার

আনিয়ে ওষুধ দিতে তবে, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, শান্ত হয় ছেলে। শান্ত হল বটে কিন্তু ঘা সারতে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। তার গলায় ঘায়ের সেই চিহ্ন আমৃত্যু লেগে ছিল।

মা বাবাকে তামাক খাবার জন্য বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন আর একটু হলে তুমি ছেলেটাকে শেষ করে দিতে। বাবা কোন কথাই বললেন না। তিনি খুব মর্মাহত হয়েছিলেন।

পূর্ণেন্দু তার লেখা 'আমার ছেলেবেলা' বইতে এ কথা লিখেছিল। তার কিছুটা তুলে দিলাম। "খুঁজতে খুঁজতে মিলল গলার গোল ভাঙ্গে টুকরো আগুন হুকোর / সেই পোড়া দাগ আজও গলায় চিত্রিত আমি মুখপোড়ার।"

বাবা পূর্ণেন্দুকে খুব ভাল বাসতেন। একটু বড হতেই সে বাবার কাছে শয়ন করত। বাবার সঙ্গে খেত। মোট কথা সে বাবার কাছেই থাকত।

পাঁচ বৎসরে তার হাতে খড়ি হল। গ্রামের পাঠশালায় সূর্য পণ্ডিতের কাছে প্রথমে শিক্ষা লাভ করে। পরে গ্রামের মাইনার স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশুনা করে। গ্রামে হাই স্কুল ছিল না। মাইনার পর্যন্তই ছিল শেষ কেন্দ্র। পরে জুনিয়ার হাই হয়েছিল, অনেক পরে। জুনিয়ার হাই হয়ে রয়ে গেছে। হাই স্কুল আর হয় নাই। হাই স্কুল ছিল উত্তরে তিন মাইল দূরে মুগকল্যাণ গ্রামে, আর দক্ষিণেও তিন মাইল দূরে সসাটি নামক গ্রামে।

পূর্ণেন্দু বাল্যকালে মানে পাঁচ-ছয় বৎসর পর্যন্ত বেশ মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান ছেলে ছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিল। অত দূরে হেঁটে গিয়ে পড়াশুনা করা পূর্ণেন্দুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোথায় পড়ান যাবে, যখন এই বিষয়ে আমরা বেশ চিন্তান্বিত তখন মান্না মণ্ডল কোম্পানীর ম্যানেজার আমাকে বললেন, আমরা অনন্তপুরে একটা হাই স্কুল করেছি, আপনারা আপনাদের গ্রাম থেকে কিছু ছেলে দিন। অনন্তপুর দক্ষিণে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। এখান থেকে ছোট ছোট ছেলেরা কি ভাবে যাতায়াত করবে বলাতে তিনি বললেন, আমাদের বোর্ডিং আছে। সেখানে মাত্র দশ সের করে চাল দিতে হবে। আর অন্য কোন খরচ নেই। মাইনেও দিতে হবে না।

সেইখানে পড়তে পাঠানই ঠিক হল। আর দুই জন ছেলে সহ পূর্ণেন্দুকে সেখানে পাঠান হল। সেখানে পড়তে পড়তেই তার উপনয়ন দেওয়া হল। সেখানে পড়াশুনা হতে লাগল না বলে, পরে তাকে সেখান থেকে এনে মুগকল্যাণ হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। যাওয়া আসার জন্য সাইকেল করে দেওয়া হল। কে তাকে সাইকেল দিয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছিনা। বোধ হয় ছোটকাকা নিকুঞ্জ দিয়েছিল।

২

এবার আমাদের গ্রামের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। পূর্বেই লিখেছি, হাওড়া

জেলার 'নাকোল' গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। গ্রামটি খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয়। তিনটি পাড়া নিয়ে গ্রাম। উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া ও মাঝের পাড়া। এর মধ্যে দক্ষিণ পাড়াটা ছিল বেশ বড়, মাহিষ্য প্রধান। শীতলা মায়ের পূজারি এক ব্রাহ্মণ ছাড়া চাষবাসই তাদের পেশা বা জীবিকা। তখন লেখা পড়ার ধারে কাছে কেউ যায়নি বলা চলে।

মাঝের পাড়ায় অন্যান্য জাতির সঙ্গে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। বেশ অবস্থাপন্ন। লেখাপড়া করা কয়েক জন আছেন বটে তবে তারা কেউই সংস্কৃতির ধার ধারে না। তার মধ্যে দু-এক জন কলিকাতায় চাকুরি করতেন। শনিবার বাড়ি আসতেন, আবার সোমবার চলে যেতেন। দু'জন বি. এ পাশ ও একজন এম. এ পাশও ছিলেন। তাঁরা শিক্ষকতা করতেন। উত্তর পাড়ায় সকল জাতির লোক বাস করত।

গ্রামে একটি পোস্ট অফিস ছিল। তাতে শুধু চিঠি পত্র যাওয়া আসা করত। আর মনি অর্ডার কবা হত। সেভিংস ব্যাঙ্ক বা অন্য রকমের টাকা জমাবার স্কীম ছিল না।

রাস্তা ঘাট ছিল সংকীর্ণ। বর্ষায় চলা ছিল দুষ্কর। এক হাঁটু কাদায় যাওয়া আসা করতে হত। দোকান হাট বাজার ছিল না বলা চলে। পাশের গ্রাম থেকে হাট বাজার করে আনতে হত। কোনও ক্লাব বা লাইব্রেরি ছিল না। ছিল লোকের উন্নতিতে হিংসা, পরচর্চা, দলাদলি। মামলা মোকদ্দমা, লোকের বাগানের ফল-মূল চুরি করা, ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি। শিক্ষার আগ্রহ ছিল না। কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল না।

পূর্ণেন্দু মুগকল্যাণ স্কুলে তিন বৎসর পড়েছিল। মুগকল্যাণ, চন্দ্রভাগ, লোকে বলত চাঁদভাগ, কানাইপুর, বাঁটুল প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বেশ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল। অধিকাংশ লোকে কলিকাতায় চাকরি করত। তবে কলকাতার কাছে বলে সকলেই ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে ক্লাবে একত্র হয়ে নানারূপ আলাপ আলোচনা, গান বাজনা, থিয়েটার রিহার্সাল ইত্যাদি নানারকম ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকত। পূজায় বা অন্য সময়ে থিয়েটার ইত্যাদিও করত। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করত।

মুগকল্যাণে পড়বার সময় ওখানকার তিনটি ছেলের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের নাম শঙ্কর ও বিষাদবন্ধু। এরা মিলেমিশে একটা হাতে লেখা কাগজ বার করেছিল। আর কানাইপুরে গণনাট্যের সঙ্গেও ওরা মিলত মিশত। পূর্ণেন্দু এই বন্ধু তিনজন ও কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর সহযোগিতায় রবীন্দ্র জয়ন্তী করবার উদ্যোগ করে আমাদের গ্রামে।

তার আগে পূর্ণেন্দুর সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলে নেওয়ার আছে। ছেলেবেলা থেকেই পূর্ণেন্দু অন্য এক ধরণের ছেলে ছিল। পাড়ার ছেলেরা হাডুডু বা বল ইত্যাদি খেলত, কিন্তু সে বড় একটা তাতে যোগ দিত না। সে আমাদের বাগানে

বসে পুতুল গড়ত।

গ্রামে গাজন ইত্যাদি উৎসবে যাত্রা গান হত। তখনকার দিনে সন্ধ্যা ৮/৯টা থেকে যাত্রা আরম্ভ হত, চলত ভোর পর্যন্ত। আর যাত্রাগুলি বেশির ভাগ ছিল পৌরাণিক। কিছু কিছু ছিল ঐতিহাসিক। পালাগুলি বেশীর ভাগই রামায়ণ মহাভারত, থেকেই রচিত হত। যেমন রাবণ বধ, মেঘনাদ বধ, লক্ষণের শক্তিশেল, কর্ণ বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। এই সব পালাতে পোষাক পরিচ্ছদের দরকার হত বেশ দামী দামী। রাজা রাজড়ার ব্যাপার। আর যুদ্ধও হত ভীষণ আকারে। সেই সময় জামা থেকে চুমকি ২/৪টে পড়ে যেত আসরে। আর যাত্রা শেষে পূর্ণেন্দু ভাইদের নিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করত। তাই দিয়ে পুতুলগুলিকে সাজিয়ে ভাই বোনদের নিয়ে আম বাগানে পুতুল নাচ করত, এ কথাগুলি সে তার আমার ছেলেবেলা বইয়ে লিখে গেছে পদ্যের আকারে।

পূর্ণেন্দুর মায়ের কথাও একটু বলা দরকার। কারণ সে তার মা'র কাছ থেকে প্রেরণা উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছে। তার জীবনে মায়ের অবদান ও কাকার সাহায্য তাকে এত বড় কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক চিত্র পরিচালক, প্রাবন্ধিক ও প্রচ্ছদ শিল্পী করে তুলেছিল।

মা নির্মলা পত্রী ছিল এক ধনী, ভদ্র আর উদার-প্রকৃতি পিতার কন্যা। তাঁর বাড়ি ছিল খিদিরপুরে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি তমলুকে শ্বশুর বাড়িতে চলে যান। তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। গান গাইতেন, তবে গানের চেয়ে বাজনায় তাঁর ছিল উৎসাহ, বিশেষতঃ পাখোয়াজে।

তখনকার দিনে বাপ মা বা অভিভাবকেরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন না, সেই কারণে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পেত না। সেইজন্য নির্মলাও ভাল লেখাপড়া জানত না। তবে রামায়ণ, মহাভারত, বা গল্প উপন্যাস পড়তে পারত। তেমন ভাল লিখতে পারত না।

লেখাপড়া না জানলেও মুখে মুখে ছড়া রচনা, মাটির বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করা, আল্পনা দেওয়া, ইত্যাদি কাজ জানত মোটামুটি। সেলাইয়ে খুব দক্ষ ছিল। নানারকম ছোট বড় অনেক কাঁথা তৈরি করে গেছে।

উত্তরকালে পূর্ণেন্দু মায়ের এই সব কাজের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, এবং ভবিষ্যৎ জীবন সে হয়ে উঠেছিল প্রথিতযশা। এ কথা অর্থাৎ তার মায়ের অবদানের কথা সে অনেক জায়গায় লিখে গেছে। পূর্ণেন্দু প্রথম যে প্রচ্ছদ এঁকেছিল সেটাও সে তার মায়ের হাতের কাজের ছবি নিয়ে গিয়ে এঁকেছিল। সেটা ছিল কাপড়ের উপর নানা রংয়ের সূচের কাজ। সে কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ সে পেয়েছিল একশত টাকা। সমস্ত টাকা সে তার মাকে দিয়েছিল।

এল ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তীর কাজে লেগে গেল পূর্ণেন্দু তিন বন্ধু ও কাকাকে নিয়ে। আগে গ্রামে কোনদিন এরকম কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়নি।

তারা এদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নানা রকম টিকা-টিপ্পনি করতে লাগল। তবে কতকগুলি ছেলে এদের সঙ্গে যোগ দিল।

স্টেজের মত একটা করতে হবে। বাঁশ চাই, কাপড় চাই। কোথায় পাওয়া যাবে এই সব চিন্তা। যাই হোক বাঁশ যোগাড় হল। বাড়ির মেয়েদের কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি দিয়ে যা হোক করে একটা কাঠাম তৈরি হল। এক জনকে সভাপতি করতে হবে। একজন শিক্ষক হলে ভাল হয়। তাঁকে গিয়ে ধরা হল। তিনি শিক্ষিত লোক। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। প্রধান অতিথি করা হল গ্রামের একজন শিক্ষককে। তিনিও শিক্ষক, নাম শ্রীজাহ্নবী শেখর শতপথী। সভাপতির নামটা ভুলে গেছি। দুচারটে চাটা মাদুর সপ যোগাড় করে বসবার জায়গা করা হল। পঞ্চাশ-ষাট জন লোক উপস্থিত হল।

সভাপতির গলায় মালা পরাবে কে? নিকুঞ্জ আমার মেয়েকে দিয়ে মালা পরাবার মহড়া দিতে লাগল। আর তাকে শিখিয়ে দিল, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবি শকুন্তলা পত্রী। ছেলেমানুষ, তখনো ভালরকম কথা বলতে পারেনি।

সভাপতি, প্রধান অতিথি এলেন। সে সভাপতি ও প্রধান অতিথির গলায় মালা পরিয়ে দিতে গেল। গলায় মালা পরাবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি মা? উত্তরে মেয়ে বলল, শকুন্তলা পাততাড়ি। সকলে হেসে উঠল। সে কি বুঝল জানি না, মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে রইল। সভাপতি মহাশয় তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি মুখ চুণ করে আছ কেন? তোমার মালা পরান দেখে ওদের খুব ভাল লেগেছে।

সভাপতির ভাষণ আরম্ভ হতেই এক এক করে লোক উঠে যেতে লাগল। তারা নিরক্ষর। রবীন্দ্রনাথ কে, তিনি কি করতেন, তাদের জানা নেই। গান বাজনা বা অন্য কিছু হবে মনে করে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের গুণপনা শুনতে আসেনি। তাই আধ ঘণ্টার মধ্যে আসর প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেল। কিছু লোক রইল। প্রধান অতিথি উঠে বলতে আরম্ভ করলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলা দু-এক ঘণ্টায় শেষ করা যায় না। তাছাড়া সভাপতি মহাশয়তো বললেন অনেক কিছু, আমার আর বেশী কিছু বলার নাই। এই ভাবে তা না না করে শেষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব প্রথম বৎসরের মত সব শেষ হল।

এরপর আরো কয়েক বছর রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছিল। কলিকাতায় যাবার পরও দু-এক বছর রবীন্দ্র জয়ন্তী করেছিল, পঁচিশে বৈশাখের দু-তিন দিন আগে বাড়ি এসে। পরে এই উৎসব ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছিল। প্রথম বারের চেয়ে লোক সংখ্যা বেড়েছে। বিষয় সূচিও বেড়েছে। দর্শকেরা যাতে ভাল ভাবে শুনতে পায় তার জন্যে মাইকের ব্যবস্থা হয়েছে। কানাইপুরের গণনাট্য সংস্থাকে আনা হয়েছে। গান বাজনারও ব্যবস্থা হয়েছে। সব শেষে নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটক দেখে ও শুনে দর্শকবৃন্দ তৃপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকবারই নুতন নুতন ভাবে রবীন্দ্র

জয়ন্তী পালন করেছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী বন্ধ হয়ে যাবার পর পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দু-এক বার থিয়েটার করেছিল। আমাদের বাড়ির সামনে। তখন মুগকল্যাণ থেকে বাসন্তী ঘোষ নামে গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত একজন গায়িকাকে আনত। গান গেয়ে সে সবাইকে মাতিয়ে দিত। নিশীথ কবিতা আবৃত্তি করত। শংকর কমিক দেখিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করত। বিষাদবন্ধু ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দিত। পরে অভিনয় হত।

এর অনেক পরে গ্রামের ছেলেরা টিপুসুলতান অভিনয় করেছিল। তাতে পূর্ণেন্দু এক মারাঠি ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

' যখন আনন্দবাজারে চাকরি করত। তখন সব সাংবাদিকেরা মিলিত হয়ে 'বুধসন্ধ্যা' নামেই বোধ হয় একটা সংঘ সংগঠন করে অভিনয় করেছিল। তাতেও পূর্ণেন্দু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু, শীর্ষেন্দু ও তাদের স্ত্রীদের সঙ্গেও অভিনয় করেছিল।

মুগকল্যাণে পড়বার সময় সে একটা ছোটখাটো বাগানের মত করেছিল। তাতে সে কিছু ফুলের চারা লাগাল। গাঁদা, দোপাটি, বেল, চটা, টগর ইত্যাদি। দু-একটা গাছে ফুলও হচ্ছিল। স্কুল থেকে এসে কিছু খেয়ে নিয়েই বাগানের পরিচর্যায় লেগে যেত। সেই সময় গাছে জল দেওয়া গাছের গোড়ায় সার দেওয়া ইত্যাদি করত। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখল, গরুতে বেড়া ভেঙ্গে গাছ পালা খেয়ে ভেঙ্গে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছে। বাগানের সখ মিটে গেল বটে তবে তার মনের সুপ্ত বাসনা রয়েই গিয়েছিল। মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যখন সে সল্টলেকে নিজে বাড়ি তৈরি করল, তখন বাড়ির বাগানে, ছাতে, সি ড়িতে, হল ঘরের কোণে, বারান্দায় প্রায় ৪০০/৫০০ রকমের নানা জাতের গাছ লাগিয়ে বাল্যের মনের বাসনা পূর্ণ করেছিল। তবে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ ছিল তার প্রিয়। ভগীরথ মিশ্র মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে কিছু এনে দিয়েছিল। প্যারিস থেকেও ক্যাকটাস এনে সে বাড়িতে লাগিয়েছিল। তবে দুঃখের কথা প্যারিসের গাছটি বাঁচেনি। পরে ক্যাকটাস ও নারী নাম দিয়ে বিড়লা একাডেমিতে সে একটা ছবির প্রদর্শনী করেছিল।

৩

পূর্ণেন্দু মুগকল্যাণ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করল। ছোট কাকা নিকুঞ্জ পত্রী 'দীপালি' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে চাকরি করত। থাকত নন্দরাম সেন স্ট্রীটে।

নিকুঞ্জ ভাইপোকে তার বাসায় নিয়ে গেল তার কাছে। সেখানে তার শিল্পী বন্ধু সুনীল পালের সাহায্যে তাকে ধর্মতলায় ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দিল। দুবছর পড়ার পর সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্ররা তাদের আর্ট স্কুলকে কলেজ করতে

হবে, এবং আরও কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে থাকে। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সমর্থন পাবার জন্য কতিপয় ছাত্র পূর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করে। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের কতিপয় ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পূর্ণেন্দু সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্রদের দাবী-দাওয়ার সপক্ষে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে মিটিং মিছিলে থেকেছে। সাধ্যমত সহযোগিতা করেছিল। পূর্ণেন্দু কিন্তু আর আর্ট স্কুলে যায়নি।

তারা অতি সাধারণ ভাবে থাকত। পূর্ণেন্দু ঘরে বসে আঁকাজোকা করত। নিকুঞ্জ রান্না করত। কাকা-ভাইপো খাওয়া দাওয়া করে যে যার কাজে যেত। এই ভাবে বহু কষ্টে দিন যাপন করত।

কাকা একটা প্রেস করল শোভাবাজারে। নন্দরাম সেনের বাসায় উঠে গেল। 'চিত্রিতা' নামে একটা কাগজ বার করল। মাসিক পত্র। ভোলানাথ পালের দোকান থেকে ধারে কাগজ নিত। অনেক টাকা ধার পড়ে গেছল, তার উপর প্রেসের অনেক টাইপ চুরি হয়ে গেল। ভোলানাথ নালিশ করে প্রেস নিলাম করে দিল। শেষে তারা শ্রীমানি মার্কেটে এসে স্থিতু হয়ে বসল।

শ্রীমানি মার্কেটে আসার পর পূর্ণেন্দুর খুব অসুখ করে। সেসময়ে নিকুঞ্জর আর্থিক অনটন চলছে। তখন এক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার প্রমোদ ঘোষকে দিয়ে বোম্বের ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির ফ্রন্ট কভার করে তখনকার দিনে ৩০০ টাকা পেয়ে পূর্ণেন্দুর চিকিৎসা করিয়ে তাকে আরোগ্য করিয়েছিল। তার অসুখের কথা আমাদের জানায়নি। পরে নিকুঞ্জর কাছ থেকে এ কথা জানতে পারি।

রোগ আরোগ্য হল বটে কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছল। শরীর সারাবার জন্যে তাকে কিছু দিন দেশের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল।

সেই সময় উল্টোরথ মাসিক পত্রিকা একটা সাহিত্য প্রতিযোগিতা করেছিল। সেটা করেছিল ১৯৫৮ সালে। পূর্ণেন্দু 'দাঁড়ের ময়না' নামে একটা উপন্যাস লিখে দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হয়। মতি নন্দী পায় প্রথম পুরস্কার এবং অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পায় তৃতীয় পুরস্কার। দাঁড়ের ময়না উপন্যাসটি বেশ ভাল হয়েছিল।

পূর্ণেন্দুর প্রথম কবিতার গ্রন্থ 'একমুঠো রোদ' এর অনেক আগে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পূর্ণেন্দু যখন বাড়িতে শরীর সারাতে এসেছিল তখন সে নিজে একটি সরস্বতী ঠাকুর গড়েছিল বাড়িতে। মনে মনে ঠিক করল ঠাকুর যখন গড়েছি তখন তা কি পড়ে থাকবে। পূজা করতে হবে। পড়ে থাকাটা ঠিক হবে না। বাড়ির ভাই বোনদের নিয়ে, ও কিছু পাড়ার ছেলেদের নিয়ে পূজা হয়ে গেল।

পূজার পর সবার সঙ্গে যুক্তি করে ঠিক করল থিয়েটার করবে। পুজোটা বড় ফাড়া ফাড়া হয়ে গেল। বাজনা বাদ্যি হল না, আমোদ প্রমোদ হল না, এ যেন পুতুল খেলা হল। কিছু একটা না করলে ভাল দেখায় না।

সকলে থিয়েটার করব বললেই তো থিয়েটার করা যায় না। বই ঠিক করতে হবে। রিহার্সাল দিতে হবে। বইয়ের জন্য কাকে কি পার্ট দেওয়া হবে তা ঠিক করতে হবে। দু-পাঁচ দিনে কি থিয়েটার হয়। অন্ততঃ একমাস না রিহার্সাল দিলে থিয়েটার করা যায় না।

পূর্ণেন্দু বলল, সময় কিছু লাগবে ঠিক। তার জন্য বিসর্জন পিছিয়ে দিলেই হবে। আর বই। সে আমি একদিনে লিখে ফেলব। আর এমন বই লিখব, তাতে অন্য কোন লোকের দরকার হবে না। আমরাই অভিনয় করব। আমিই সকলকে নিয়ে রিহার্সাল করব ও শিক্ষা দেব।

বই লেখা হয়ে গেল। রিহার্সাল তিন-চার দিন ধরে দেওয়া হল। পাঁচ দিনের মধ্যে সব হয়ে গেল। ছোট বই। মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেল পত্রী-বাড়িতে থিয়েটার হবে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে থিয়েটার হয়েছিল। গ্রামের লোক দেখেছিল। ভাল লেগেছিল। তাই থিয়েটারের দিন সন্ধ্যা থেকেই লোক আসতে লাগল। বাড়ির ছেলেমেয়েরা করবে এ কথা শুনে সবার দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। মন্দ লোক হল না।

থিয়েটার শুরু হল। প্রথম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে স্কুলের সরস্বতী পূজা হবে, পণ্ডিত মশায় ছাত্রদের নাম লিখে চাঁদার অঙ্ক বসিয়ে দিচ্ছেন। সকলের চাঁদা দেওয়া হয়ে গেল। বিপিন বলে একটা ছেলে চাঁদা না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। নাম বিপিন। নমঃশূদ্রের ছেলে। খুব গরীব, বাপ নাই।

পণ্ডিতমশায় বললেন, কিরে বিপনে, দাঁড়িয়ে আছিস, চাঁদা কৈ ?

বিপিন বলল, পণ্ডিতমশায়, মাকে চাঁদার কথা বললাম। মা বলল, হেই বাবা কেমনে চাঁদা দেব বাপ। খেতেই পাইনি।

পণ্ডিতমশায় রেগে মেগে বললেন, কোত্থেকে দিব বাপ! চাঁদা না দিলে পুজোটা কেমনে হবে সোনার চাঁদ। খাওয়া দাওয়াই বা হবে কেমন করে ?

বিপিন বলল, আমি খাব না, শুধু পুষ্পাঞ্জলি দেব।

পণ্ডিতমশায় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বেটা চাঁড়ালের পো-র আস্পর্দ্ধা দেখ। বেটা বলে কিনা পুষ্পাঞ্জলি দেব। খাব না। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। বিপিন কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল সেখান থেকে।

পরের দৃশ্য।

পাঠশালায় পূজা হচ্ছে। অঞ্জলি দেওয়া হল। কিছু পরে খাওয়া দাওয়া হল। এই দৃশ্য দেখান হল। সন্ধ্যা বেলা থিয়েটার হবে, যে যার বাড়ি চলে গেল।

পরের দৃশ্য।

সন্ধ্যায় থিয়েটার আরম্ভ হল। সিরাজ আলিবর্দীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সেনাপতি ও আমলাবৃন্দের অসহযোগিতার কথা বলে দুঃখ জানাচ্ছে, এমন সময় কার ঘরে আগুন লেগে গেল। সকলেই ছুটল সেই দিকে। থিয়েটার ভেঙ্গে গেল।

দেখল পণ্ডিতের ঘরে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফাল্গুন মাস। খড়ের চাল। অনেকদিন বৃষ্টি হয় নাই। আগুনের কাছে যায় কার সাধ্য।

থিয়েটার দেখতে পণ্ডিতের বাড়ির সবাই এসেছিল একটা ছ মাসের ছেলেকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাড়িতে চাবি দিয়ে। ভেবেছিল এক ঘণ্টার মত থিয়েটার হবে। এই ভেবে সকলে থিয়েটার দেখতে এসেছিল। আগুনের কথা শুনে পণ্ডিত পাগলের মত বাডির পানে ছুটল। ছেলের মা ও ঠাকুরমা মাথায় ও বুকে হাত চাপড়াতে চাপড়তে ছুটল। গিয়ে দেখে আগুন চালের মটকায় উঠে গেছে কাছে যায় কার সাধ্য। ছেলের মা ঠাকুরমা আলুথালু বেশে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কয়েকজন লোকের বাড়ি থেকে কলসী বালতি ইত্যাদি যোগাড় করে জল ঢালছে চালে। আগুন তাতে নেবার চেয়ে প্রবল আকার ধারণ করছে। সামনের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল। দরজা পুডতে পুড়তে পড়ে গেল। এমন সময় সকলে অবাক হয়ে দেখল কে একজন একটা ভিজে কাঁথায় আপাদ মস্তক জড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সকলে হায় হায় করে উঠল। অবাক হয়ে প্রতীক্ষা করে রইল লোকটার আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার।

কিছু পরে লোকটা বেরিয়ে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার কাঁথায় জায়গায় জায়গায় একটু আধটু আগুন লেগেছে। সকলে ছুটে গিয়ে কাঁথাটা টেনেটুনে দূরে ফেলে দিল। দেখল তার হাতে একটা পুঁটলির মত কি আছে। সেটা নিয়ে খুলে দেখল পণ্ডিতের ছেলেটি অক্ষত শরীরে তার মধ্যে চেয়ে আছে। আরও সকলে অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেটি আর কেউ নয়, বিধবার একমাত্র সন্তান নমঃশূদ্র জাতের পণ্ডিতের দ্বারা লাঞ্ছিত বিপিন। অজ্ঞান, অচৈতন্য।

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বিপিনের মাথা নিজের কোলে নিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বললেন। আমি শিক্ষক। ছেলেদের বিদ্যাদান করা আমার পেশা। আমি এতদিন কি শিক্ষা দিয়ে এসেছি। শিক্ষা দিয়ে এসেছি জাত বিচার করা। কিন্তু বিপিন নিজের জীবন বিপন্ন করে শিক্ষা দিল। জাত বড় নয়। মানুষ বড়। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জাত সৃষ্টি করেননি। মানুষ সবাই এক। কেউ ছোটও নয়। বড়ও নয়। কাজের যোগ্যতা হিসাবে মানুষ ছোট বড়।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। সবাই অভিনয়ের প্রশংসা করে গেল। বিশেষ করে পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনেতা পূর্ণেন্দু পত্রীর ও বিপিনের ভূমিকায় অভিনেতা আমার ভাগিনেয় রবি রায়ের প্রশংসা করে গেল।

পূর্ণেন্দু এই ছোট নাটকটি লিখেছিল এবং অভিনয় করেছিল। এটা শুধু অভিনয়ই ছিল না। পরবর্তী জীবনে সে হাতেনাতে এবং তার কাজেও এর দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। অন্ধ কুসংস্কারের সে ছিল বিরোধী। এর দু-একটা দৃষ্টান্ত পরে অর্থাৎ যথাসময়ে লিখব।

পূর্ণেন্দু যখন মুগকল্যাণ স্কুলে পড়ত তখন একটা সেবাদল তৈয়ারি করেছিল। এবং তাদের নিয়ে রোগীদের সেবা করত। এবং প্রয়োজনে পথ্য ইত্যাদিও দিত। দুইজন কলেরার রোগীকে ডাক্তার দেখিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। সেই দুজনের একজন কোথায় চলে গিয়েছে। সে মেয়ে ছেলে। জাতিতে কেওরা। অন্যজন ধোপা। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। তবে ১৩৭৬ সালে আমি যখন গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় আসি, তখন সে আমাদের বলেছিল, আপনারাও দেশ ছেড়ে চললেন ? দুলালবাবু কি আসবেন ?

নিকুঞ্জ পূর্ণেন্দুকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। নিজে রান্না করে ভাইপোকে খাইয়ে দাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে নিজের অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই। কিন্তু শিক্ষা তাকে দেয় নাই নিকুঞ্জ। কিছুটা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল হয়ত, কিন্তু তা সে কতটুকু। তবে পূর্ণেন্দু এত সব শিখল কোথা থেকে। কে তার গুরু ছিল। তা কেউ জানে না। তবে সে কি মহাভারতের একলব্যের মত গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে নিজের সাধনা ও অধ্যবসায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ?

রামায়ণে বর্ণিত আছে রাবণের কুড়িটি হাত ছিল। এটা সম্ভবপর নয়। হতে পারে না। এটা কবির কল্পনা। কুড়িটা হাত নিয়ে মানুষ চলবে ফিরবে শয়ন করবে কি করে। তবে এটা হতে পারে রাবণ মস্ত বড একজন বীর ছিল। সে দু হাত দিয়ে কুড়িটা হাতের কাজ করতে পারত।

পূর্ণেন্দু কি তেমনি তার দুই হাত দিয়ে কুড়িটা হাতের কাজ করে গেল। এক হাত দিয়ে সাহিত্য, অন্য হাত দিয়ে কবিতা, এই ভাবে এক এক হাত দিয়ে চিত্র কলা, চিত্র পরিচালনা, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, প্রচ্ছদ অঙ্কন ইত্যাদি সৃষ্টি করে গেল। তাই হবে হয়ত।

তার বাল্য জীবনের আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। সে বড় জেদী ছিল। এক সময় আমি আমার স্ত্রী ও পুত্র সহ কলিকাতায় হেদুয়ার কাছে একটা বাসা ভাড়া করে তিন-চার মাস ছিলাম। পূর্ণেন্দুর বয়স তখন সাত-আট বৎসর হবে। সে বিকালে হেদুয়ায় বেড়াতে যেত। সেখানে সে এক ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ভাব করেছিল। একথা সে তার মার কাছে এসে গল্প করত। ট্যাক্সিওয়ালা নাকি তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে আনত।

এক দিন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, দেখ খোকা একটা ট্যাক্সিওলার সঙ্গে ভাব করেছে। সে নাকি তার ট্যাক্সি করে ওকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আনে। শুনতে পাই এইভাবে নাকি ছেলে চুরি করে বিক্রী করে দেয়। তুমি ওকে একটু বকে দিও।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চুরি করলে কবেই নিয়ে যেতে পারত। তা নয়, সুন্দর ছেলেটা একলা ঘোরে, তাই দেখে ভাল লেগেছে। তাই ওকে গাড়ি করে একটু ঘুরিয়ে আনে। আচ্ছা আমি ওকে বকে দেব।

আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম। কলিকাতায় নানারকমের বদমাইস লোক

আছে, তাদের সঙ্গে মিশবে না। কলিকাতা বড ভাল জায়গা নয়। আর আমি কোন খোঁজ নিইনি। তারপর স্ত্রী পুত্রকে বাড়িতে রেখে এলাম।

পূর্ণেন্দু শ্রীমানী মার্কেটের ঘরে নিজের কাজ করত। সেই সময় অনিল সিংহের নূতন সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। নূতন সাহিত্য থেকে বেশ কিছু বইও ছাপা হয়েছিল। সেই সব বই আর পত্রিকাটি ছিল তার শিল্প চর্চার ক্ষেত্র। আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নকশা নূতন সাহিত্য থেকে ছাপা হয়। বইগুলির অঙ্গসজ্জা করেছিল পূর্ণেন্দু। পরিচয় পত্রিকা গোষ্ঠীর অনেকেই নূতন সাহিত্যে যেতেন।

নূতন সাহিত্য ভবনের 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' বিদেশী গল্পের অনুবাদ সংকলন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সরস গল্প, হাজার বছরের প্রেমের কবিতা, এইসব বই ছিল পূর্ণেন্দুর চিত্রিত। সেই সময় থেকে লিপিকে ব্যবহার করে এক যে ধারা সে প্রবর্তন করে, নিজে তা অনুসরণ করেছে এবং বহু প্রকাশক পরবর্তীকালে গ্রন্থ প্রকাশক ও সচিত্রকরণে দৃষ্টিপাত করেন, যা ইদানিংকালে বেড়েছে। হাতে আঁকা ছবি বা ক্যামেরার ছবিকে প্রচ্ছদে না এনে, লিপিকে চিত্ররূপে কত অসাধারণ করে তোলা যায় সে তারই পরীক্ষা শুরু করেছিল।

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' ও 'অন্ধকার বারান্দা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'রক্তাক্ত ঝরোখা', পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি', এ রকম অনেক কাব্যের নাম করা যায় যেখানে লিপিকে ভেঙে বিমূর্ত ফর্ম তৈরি করেছে। লিপির বিন্যাস এসেছে চোখকে তৃপ্তি দিয়ে অসাধারণ শিল্পরূপে। প্রচ্ছদ অঙ্কনে এক নিজস্বতাকেই অবলম্বন করে গেছে। সত্যজিত রায়, রঘুনাথ গোস্বামী, ও. সি. গাঙ্গুলী, অন্নদা মুন্সী, খালেদ চৌধুরী, সমীর সরকার, কারো মত ছিল না পূর্ণেন্দু। কারো ছাপ নাই তার শিল্পে। পূর্ণেন্দু এখানে এক এবং অনন্য।

এই সময় নতুন সাহিত্য-তে 'সমুদ্রগুপ্ত' ছদ্মনামে 'শহর কলিকাতার অদ্দিপর্ব' নামে একখানি পুস্তক রচনা করে ১৯৫৫ সালে। সেই বইখানি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে একখানি চিঠি লেখে, "বাবা আপনি কলকাতা সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলে আমাকে অচেনা লোকের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন। আপনার সেই ছেলে কলকাতার ইতিহাস লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি"—এই বলে সে এক মধুর প্রতিশোধ নিয়েছিল।

তার বাল্যকালের অনেক ঘটনা ছিল যা আমার অজানা, কিন্তু তার মা জীবিত থাকলে তা জানতে পারা যেত। আমাকে সে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করত। তাই সে আমার কাছে কোন কথা জানায় নি। সব কথা বলত সে তার মায়ের কাছে। মাকে সে খুব ভালবাসত, তার মাও তাকে ভালবাসত।

বাল্যজীবনের কথা যা জানতুম যতটুকু মনে করতে পেরেছি সবই লিখলাম। কর্ম জীবনের কথা বলছি, যা আমি অন্যান্য সংগ্রহ থেকে জানতে পেরেছি।

৪

পূর্ণেন্দু যখন শ্রীমানী মার্কেটে থাকত তখন তারা খুব কষ্টের মধ্যেই থাকত। একটা সতরঞ্চিতে বসে সে আঁকাজোকা করত। চারি পাশে ছড়ান থাকত কালি কলম তুলি রং ইত্যাদি সব কাজের জিনিস। সেই সময় তার অনেক বন্ধু বান্ধব তার কাছে আসত। তাদের সকলের নাম করতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে সিনেট হল ছিল। ঐতিহাসিক এই হলটির স্থাপত্য ছিল গ্রীক স্থাপত্যের অনুরূপ। বিশাল বিশাল থামের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই হলটির অবস্থান ছিল দেখবার মত। এই হলটা ভেঙ্গে ফেলা হল। এক সময় ওই হলে কবিরা কবিসম্মেলন করত, বহু কবি ওই হলে বসে নিজের নিজের কবিতা পাঠ করত।

সিনেট হল ভাঙ্গার সময় কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে কোন জনমত গড়ে তোলেনি। পূর্ণেন্দু তার চারিত্রিক ভূমিকাটি পালন করেছিল। সেই বিশাল ভগ্ন স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলার বা ভেঙ্গে পড়ার প্রতিটি মুহূর্তের দৃশ্যগুলিকে ক্যামেরায় বন্দী করে রেখেছিল। আজ সেই সব ছবির মূল্য অপরিসীম। এই ছবিগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

পূর্ণেন্দু অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারত। বেলা ৯টায় উঠে কাজে বসত। একটা দেড়টায় উঠে স্নান আহার করে সামান্য একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার রাত্রি এগারটা পর্যন্ত লেখায় ও ছবি আঁকায় বসত। কত লোক যে তার কাছে আসত তার লেখাজোখা ছিল না।

পূর্ণেন্দুর সংগ্রহ ছিল। বই ছিল অজস্র। শুধু গল্প উপন্যাস নয়। বিলাতি সব ছবি আঁকার বই। ইংরাজি ফার্সি প্রভৃতি অনেক বই ছিল। নানা রকম সংগ্রহ ছিল প্রচুর। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক জিনিস পত্র, পোড়ামাটির কাজ, খেলনা প্রভৃতি যা তার নজরে পড়ত তা সে সংগ্রহ করত।

কলিকাতা শহরের পত্তনের ৩০০ বছর পূর্তিতে কলিকাতার রবীন্দ্র সদনের বিপরীত দিকের মাঠে এক বিরাট মেলা এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর সংগঠক ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। এই বিভাগের পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি হয়েছিল। এই কমিটিতে এবং প্রদর্শনীর 'থীম' ও মূল পাভেলিয়ানের দায়িত্বে ছিল পূর্ণেন্দু, প্রভাস সেন ও বিজন চৌধুরী।

কলিকাতার জন্মলগ্ন থেকে এ শহরের পত্তনের ইতিহাস, এর হর্মরাজি, রাস্তা ঘাটের অতীত ইতিহাস, বিদেশী শিক্ষার প্রসার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মকাণ্ড বাবু সংস্কৃতি, বটতলার প্রকাশনী, গরানহাটার কাঠ খোদাই এসব সম্পর্কে তথ্য ও লেখা এবং প্রামাণ্য রেফারেন্স ও ছবির কাটিং-এর সংগ্রহ অপরিহার্য ছিল।

ডঃ নিশীথরঞ্জন রায় মূল ভূমিকায় অবশ্যই ছিলেন, তবুও পূর্ণেন্দুর সংগ্রহ, তথ্য ও নিদর্শন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন মিটিয়েছিল সেই সময়ে। ল্যামবার্ট ভাইয়েদের থেকে টমাস হিকি, টমাস ড্যানিয়েল প্রভৃতি শিল্পীর দুষ্প্রাপ্য ছবির প্রিন্ট, গরানহাটার বিভিন্ন ছাপান কাঠ খোদাই-এর নমুনা পূর্ণেন্দুর সংগ্রহ থেকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া কলিকাতার বাবু সংস্কৃতির ওপর তার পরিচালনায় বিশেষ একটি প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়েছিল, তার লিখিত ইতিহাস ও আঁকা ছবিগুলি পূর্ণেন্দুর নিজের সৃষ্টি কর্ম দিয়েই সজ্জিত হয়েছিল। এ প্রদর্শনীটি এক উচ্চ মাত্রা পেয়েছিল সেই সময়ে ও শহরে প্রশংসা পেয়েছিল।

আগেই বলেছি পূর্ণেন্দু মুগকল্যাণে পড়বার সময়ে কানাইপুরে গণনাট্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, পরে কলিকাতায় গিয়ে নিমাই শূরের সঙ্গে মিলিত হয়। নিমাই শূর তখন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি'র বাগনান আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক। পূর্ণেন্দু তখন বাগনান কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সময়টা ১৯৫৬ সাল। তার বেশ কয়েক বছর আগে যখন স্কুলের শেষ ধাপে, সেই সময়ে পূর্ণেন্দুকে কৃষক আন্দোলনের কাজে বড়াকমলাপুরে পাঠান হয়েছিল। সবাই জানেন অঞ্চলটা ছিল তেভাগা আন্দোলনের একটি ঝটিকা কেন্দ্র। এইখানেই সে সংগ্রামী কৃষকদের আন্দোলনের উপর বেশ কিছু ছবি আঁকে ও বেশ কিছু কবিতাও লেখে। সেইগুলি পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয়।

এরপর কয়েক দশকের কাছাকাছি ব্যবধানে, বাগনানে তখন সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হচ্ছে। বড় রকমের তোড়জোড় চলছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে হাটে বাজারে প্রচার করতে হচ্ছে। সংগঠন তৈরি করতে হচ্ছে। চাঁদা আদায় করতে হচ্ছে একটা বড় যজ্ঞের কাজ। তাতে পূর্ণেন্দুর একটা অংশ ছিল বেশ বড় গোছের। পূর্ণেন্দু বেশ সুষ্ঠুভাবে তার দায়িত্ব পালন করে গেছে।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল, তার পর থেকে সে আর কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কোন কাজে অংশ গ্রহণ করেনি। তবে সে আজীবন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিল এবং সি. পি. এম.-এর গণশক্তি কাগজে মাঝে মাঝে লেখা দিত।

৫

পূর্ণেন্দু যখন শ্রীমানী মার্কেটে থাকত তখন তার কাছে তার অনেক বন্ধু বান্ধব আসত। কেউ আড্ডা দিতে। কেউ কভার আঁকিয়ে নিতে। আবার তারাও সকলে মিলে কফি হাউসে গিয়ে এক কাপ চা তিন জনে ভাগ করে খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত।

এইসময় তরুণ সান্যাল আর যুগান্তরের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। তরুণ আর যুগান্তর দুজনেই কবিতা লিখত। তরুণ ভবিষ্যৎ জীবনে স্কটিশ চার্চ

কলেজ-এ প্রফেসার ও বোর্ডিং সুপারিণ্টেনডেণ্ট হয়েছিল। আর যুগান্তর স্কুল মাস্টার হয়েছিল। যুগান্তর ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা।

তরুণ সান্যাল তার দাদার বিবাহে পূর্ণেন্দু ও যুগান্তরকে তাদের বর্দ্ধমানের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তরুণের বন্ধু কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর আলাপ পরিচয় হয় এবং সে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কামাখ্যাও কবিভাবাপন্ন ছিল। স্কুল মাস্টারি করত।

তখন কামাখ্যার মা বাবা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন। তারা চার বোন ও কামাখ্যা এক মায়ের সন্তান ছিলেন। তার একজন বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। তার নাম ছিল শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়। তার সঙ্গে এদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। কামাখ্যার দুই বোনের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। বাকী দুই বোন ছিল অবিবাহিতা। এই দুই বোনের নাম ছিল উমা আর সন্ধ্যা। তবে সন্ধ্যাকে সকলেই বুড়ি বলে ডাকত। সন্ধ্যাকে আমার স্ত্রী বুড়িমা বলে ডাকত। আর সন্ধ্যা আমার স্ত্রীকে মা বলে ডাকত, পূর্ণেন্দুর বিবাহের সময় যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিল বা পরবর্তী জীবনে যখন আমাদের বাড়িতে আসত বা যখন আমরা পূর্ণেন্দুর ওখানে যেতাম।

কামাখ্যার সঙ্গে মেলামেশা হওয়ার পর যে কদিন বর্দ্ধমানে ছিল, কামাখ্যার বাড়িতে যেত আসত, সেই সময় তার দুই বোনের সঙ্গেও পূর্ণেন্দুর একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। এবং উমার সঙ্গে পূর্ণেন্দুর বিবাহ প্রস্তাবও উঠল।

কামাখ্যা তরুণ আর যুগল নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে আসে। এবং ঘর বাড়ি দেখে আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহে মত দেয়।

সন ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন মাসে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে উমার বিবাহ হয়। পূর্ণেন্দু তার কাকা নিকুঞ্জর সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করে বিবাহকার্য সম্পন্ন করে।

আমি বিবাহে তাকে কোন সাহায্য করতে পারিনি। তবে আমার মত ছিল। সাহায্য না করার কারণ আমি তখন রিটায়ার্ড জীবন কাটাচ্ছি।

বিবাহের পর উমা কিছুদিন দেশের বাড়িতে ছিল। সেখানেই পুণ্যব্রত (ডাক নাম টুটুল) জন্ম গ্রহণ করে। পুণ্যব্রতর জন্মের পর, কিছুদিন পরে, পূর্ণেন্দু বেলগাছিয়ায় ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে ঘর ভাড়া করে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে যায়। এবং বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তার প্রথমা কন্যা হওয়ার সময় নার্সিংহোমে গেলে পুণ্যব্রতকে দেখাশুনা করার কেউ না থাকাতে আমি এসে তাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাই। এবারে পূর্ণেন্দুর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দেশে সে আমাদের কাছে

বেশ কিছু দিন ছিল। পড়াশুনার জন্য পূর্ণেন্দু তাকে দেশ থেকে নিয়ে আসে। এরপর পূর্ণেন্দুর ২টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বড় মেয়ের নাম উপমা ডাক নাম অপু, মেজ মেয়ের নাম রূপমা (ডাক নাম রূপু) এবং ছোট মেয়ের নাম তন্দ্রিমা (বাবলি)। আমি ও আমার স্ত্রী দেশের বাড়িতেই থাকতাম। মাঝে মাঝে ছেলের কাছে যেতাম এবং কিছুদিন থাকতাম।

ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে অল্প পরিসর জায়গায় তার কাজ কর্মের অসুবিধা হচ্ছিল। সেই জন্য সে ঐ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে টালায় এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে যায়। সেখানে থাকার পর দেখা যায় নীচের তলা ড্যাম্প থাকায় উই পোকায় অনেক কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। তখন আবার বাসা পরিবর্তন করে। বাঙ্গুরে ৩৮৯-এ ব্লকে মডার্ন বুক এজেন্সীর মালিকের বাড়ি ভাড়া নেয়। এবং ৮ বছর সেখানে থাকে। সেখানে বাড়িওয়ালার প্রয়োজনে বাড়ি ছেড়ে এ ব্লকের ২০৪ নং নম্বরে বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠে আসে এবং দুই বছর বসবাসের পর ১৯৭২ সালে অতি বৃষ্টিতে বাঙ্গুর প্লাবিত হলে সেই বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়ার সঙ্গে নৌকাযোগে কৃষ্ণনগর চলে যায়। এবং সেখানে কয়েক দিন থেকে ফিরে এসে কলিকাতায় একটি হোটেলে থাকে এবং সে বাড়ি ছেড়ে দেয়।

জল কমে গেলে বাঙ্গুরেই ১৩৯ নং 'বি' ব্লকে হরিনারান দে-র বাড়িতে উঠে এল। সেখানে প্রায় ১০ বছর ছিল। শেষের দিকে তাঁরা দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন জল নিয়ে। এরপর আবার ১৯৭৮ সালের বৃষ্টি ও বন্যায় বাঙ্গুরে নীচের তলা ডুবে গেল। ছেলেমেয়ে নিয়ে বহু কষ্টে অনেক জিনিসপত্র খাটের উপর তুলে বাড়িওয়ালার ওপর এবং সিঁড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে ছিল। বৃষ্টির ক্ষতিতে ও দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ণেন্দু বাড়ি তৈয়ারি করিবার সংকল্প করল। সল্টলেকে জমি কিনল।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে ভিত গাঁথা হল। সোমনাথ সান্যালের তদারকিতে বাড়ি উঠতে লাগল। সোমনাথ টাকাই নিচ্ছে কাজ এগোচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে তাকে ছাড়াবে মনস্থ করল। তাকে ছাড়াতে পারল না। উল্টে তাকে কিছু টাকা দিয়ে ছাড়াতে হল! এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টাকা ফুরিয়ে গেল। বাড়ি বন্ধ হয়ে যাবার সামিল হল। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কে লোন পাওয়া যায় বটে তবে গ্যারান্টির দরকার। তার এক বন্ধু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ৯০ হাজার টাকা লোন পাওয়া গেল। সেই টাকা নিয়ে নিজের তদারকিতে বাড়ি উঠতে থাকে। এদিকে হরিনারান দে তাড়া দিচ্ছে তার বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য, ছেলের বিবাহ হবে এই অজুহাতে।

পূর্ণেন্দু একদিন বৃষ্টি বাদলের মধ্যে অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়িতে এসে কোন রকমে মাথা গুঁজে বসবাস করতে করতে বাড়ির কাজ সমাপ্ত করল।

পূর্ণেন্দু নিজের বাড়ি মনের মত করে গড়ে তুলল। নীচে একটা ঘর বেশ বড়

করে তৈরি করেছিল নিজের আঁকার ও লেখার জন্য। সে ঘরে তার কাজের জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল লেখার ও আঁকার। লোক জন এলে তাদের ব্যবস্থাও ছিল সেই ঘরে। তার বইয়ের সংগ্রহ ছিল প্রচুর। দেশী বিলাতি নানান বই, আঁকার জন্য যে সব বই দরকার সে সব বই থাকত দেওয়াল ভর্তি র‍্যাকে।

৬

পূর্ণেন্দু যখন মডার্ন বুক এজেন্সীর মালিকের বাড়িতে বাস করছিল তখন এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল তাতে জানা যাবে তার মন কত উদার আর সংস্কার মুক্ত ছিল।

পূর্বে লিখেছি কামাখ্যার ছোট বোন পূর্ণেন্দুর বিবাহের পর অবিবাহিতা ছিল। কিছুদিন পরে তার বিবাহ হল যার সঙ্গে, তার শরীরে রোগ ছিল। রোগ গোপন করে তার বিধবা মা ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে ছেলেটি মারা গেল। সন্ধ্যা (ডাকনাম বুড়ি) বিধবা হল। কিন্তু তাকে বাপের বাড়ি পাঠাল না শাশুড়ি। সে শ্বশুর বাড়িতেই পড়ে রইল।

দৈবের ঘটনা, একদিন বুড়িমাকে নিয়ে তার শাশুড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় যেতে অসুবিধা হবে বিবেচনায় তারা সেই রাত্রি পূর্ণেন্দুর বাড়িতে রয়ে গেল।

পরদিন সকালে তারা যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন পূর্ণেন্দু শাশুড়িকে বলল, বুড়ি এখন আমার কাছে থাক। আপনি যখন বাড়ি ফিরে যাবেন তখন বুড়িকে নিয়ে যাবেন।

শাশুড়ি একটু অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না বউকে আর নিয়ে যেতে এলেন না। বুড়ি পূর্ণেন্দুর বাড়িতেই রয়ে গেল।

বুড়ি কিছু লেখা পড়া করছিল। পূর্ণেন্দু তাকে অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাশ করাবার জন্যে পড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পড়বার দিকে তার আগ্রহ ছিল না। তার গান শিখবার ইচ্ছা হল এবং গান শিখতে লাগল। মোটামুটি কিছু গানও শিখেছিল।

পূর্ণেন্দুর বাড়ির তিন-চার খানা বাড়ি পরে ঊষানাথ নামে এক যুবক বাস করত। মা আর এক ছোট বোন নিয়ে সংসার। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত। অবস্থা বেশ ভালই। ছেলেটি শিক্ষিত এবং ভদ্র। স্বাস্থ্যবান। ২৪ পরগণার জাগুলিয়ায় তাদের বাড়ি। বিস্তর বাগান, আম জাম কাঁঠাল গাছের। জমা দিয়ে দিত বছর বছর। যারা বাগান জমা নিত তারা মালিককে খাওয়ার যথেষ্ট আম কাঁঠাল দিয়ে যেত। ঊষানাথ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসত। ছেলেদের সঙ্গে গল্প করত। মাঝে মাঝে পড়াও বলে দিত টুটুলকে। ছেলেটিকে পূর্ণেন্দুর বেশ মনে লাগল। বুড়ির সঙ্গে বিবাহ দিবার সংকল্প করল। কিন্তু বুড়ি বিধবা। ছেলেটি কি

বিধবা বিবাহ করতে রাজী হবে ?

দোনোমোনা করে একদিন উষানাথের কাছে প্রস্তাব করল এবং সে যে বিধবা একথাও তাকে জানাল। উষানাথ রাজী হয়ে গেল। বর্দ্ধমান থেকে কামাখ্যাকে ডেকে আনা হল। কামাখ্যাও কোন অমত করল না। বিবাহে উষানাথ কোন টাকা পয়সার দাবি করল না।

বিবাহের পর উষানাথের আর্থিক উন্নতি হতে লাগল। ফুলে ফেঁপে উঠল। একতলা বাড়ি তিনতলা হল। ব্যবসার উন্নতি হল। তাদের একটি মেয়ে হল, নাম মধুশ্রী, পরে পুত্র হল। নাম যদু। মধুশ্রী শান্তিনিকেতন থেকে বি. এ. পাশ করে এবং পরে বিশ্বভারতী থেকে এম. এ পাশ করে। কিছুদিন আগে তার বিবাহ হয়ে গেছে এবং সম্প্রতি একটি মেয়েও হয়েছে। পূর্ণেন্দু পণপ্রথার বিরোধী। এ বিবাহে সে কোন পণ দেয় নাই। আর ছেলে দেরাদুনে সামরিক স্কুলে পড়াশুনা করছে। এতে জানা যায় পূর্ণেন্দু কত সংস্কারমুক্ত। নিজের ছেলে ও মেয়ের বিবাহেও কোনও পণ নেয়নি বা দেয়নি।

প্রথম জীবনে পূর্ণেন্দু প্রচ্ছদ আঁকত। প্রচুর আঁকার জন্য সে প্রচুর বই পেত। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের বই ও অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও তার সংগ্রহে ছিল।

নীচে দুটা শয়ন কক্ষ একটা বড় হল-ঘর ছিল। হলঘরে নানা রকম ছবি মূর্তি খেলনা ইত্যাদি, দেওয়াল ভর্তি ছিল। বাইরে কোথাও গেলে কোন সুন্দর জিনিস দেখতে পেলে সে কিনে এনে ঘরে সাজিয়ে রাখত। বিষ্ণুপুরের ঘোড়া হাতী ইত্যাদিও সে হল-ঘরে সাজিয়ে রেখেছিল। নানান রকম জিনিস ছিল তার সংগ্রহতালিকায়। এ যেন তার একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল।

হল-ঘরে সোফা-সেটি এবং নানা রকম বসবার জায়গা ছিল। বসবার চেয়ার সে পছন্দ করত না। আর হলঘরে ছিল টিভি রেকর্ড প্লেয়ার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও টেলিফোন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আঁকা শেখাবার জন্য সে একটা স্কুল করেছিল। প্রতি শনিবার ও রবিবার স্কুল হত। পরে তার কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় শুধু রবিবারই ক্লাস করত।

ছেলে বেলায় গরুতে বাগান নষ্ট করে দিয়েছিল, সে দুঃখ বোধ হয় তার মনের গোপন কোণে সুপ্ত ছিল। নিজ বাড়ি করার পর সেই দুঃখ বোধ হয় জেগে উঠেছিল। তাই বাড়িতে বাগান করবার নেশায় মেতে উঠল। টবে টবে গাছ ভর্তি হয়ে গেল! বাগানে ছাতে সিঁড়িতে। কত রকমের গাছ সেসব। ফুলের গাছের চেয়ে ক্যাকটাসের উপর তার ঝোঁক ছিল বেশী। এই ক্যাকটাস সে মেদিনীপুর থেকে সংগ্রহ করত তার এক গুণমুগ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে। এমন কি ফ্রান্স থেকে এনেছিল একটা ক্যাকটাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চারাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্যাকটাস তার এত প্রিয় ছিল যে ক্যাকটাসকে নিয়ে একটা প্রদর্শনী

করেছিল বিড়লা একাডেমিতে। পুস্তক আর ছবির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় আর রাখবার জায়গা ছিল না বলা চলে। পূর্ণেন্দুর নামডাক ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় অনেক সভা সমিতিতে তার ডাক পড়ত। সভাপতি বা প্রধান অতিথি হবার জন্ম। পূর্ণেন্দু সেই সভাতে বলে আসত, আপনারা লাইব্রেরি করুন আমি আপনাদের শতখানেক বই দেব এবং অনেক যায়গায় বইও দিয়েছিল।

আমাকে দেশের বাড়িতেও অনেক দিয়েছিল। যখন আমি দেশ ত্যাগ করে সল্টলেকে চলে আসি তখন আমার প্রিয় কিছু বই সঙ্গে এনেছিলাম। বাকি বই পাড়ার ছেলেদের দু-চার খান করে দিয়েছিলাম। বাকী প্রায় দুই শত বই একটা লাইব্রেরিকে দিয়ে এসেছিলাম। তাকে ছবি আঁকার ও বই রাখার জন্য তিনতলায় একটা ঘর তৈয়ারি করতে হয়েছিল।

নিজের বাড়িতে এসে পূর্ণেন্দু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মন প্রাণ খুলে লিখতে ও ছবি অাঁকতে শুরু করেছিল। লেখার পর কত রকমের লেখা। কবিতা উপন্যাস, গল্প। প্রবন্ধ কত কি। তার উপর অন্য দিকে ছবি অাঁকা, নানা রকমের প্রচ্ছদ অাঁকা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, যেন দশ হাতে কাজ করতে লাগল। শুধ্ কি অাঁকা আর লেখা। পড়ারও শেষ ছিল না তার। লেখার জন্য ইংরাজি বাংলা কত বই যে তাকে পড়তে হত। 'বঙ্কিম যুগ' রচনা করবে স্থির করল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বই পড়তে হবে। প্রচুর বই পড়ার দরকার বই সংগ্রহ করতে লাগল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত নামে তার এক বন্ধু পানিত্রাস স্কুলে মাস্টারি করত। কি ভাবে জানল তাদের লাইব্রেরিতে বঙ্কিম সম্বন্ধে লেখা অনেক বই আছে। পানিত্রাসে চলে গেল। তাকে বলল, তোদের লাইব্রেরিতে বঙ্কিমের সম্বন্ধে লেখা অনেক বই আছে শুনলাম। আমার দরকার, তোকে দিতে হবে।

অনেক উপরে র‍্যাকে সব বই ছিল। সে বলল, দাঁড়া পেড়ে দিচ্ছি। পূর্ণেন্দুর সবুর সইল না। মই ছিল তরতর করে উঠে গিয়ে তেরখানা বই পেড়ে নিয়ে বলল, এই বইগুলো তোর নামে খাতায় লিখে রাখিস, বলে বইগুলো নিয়ে এল।

৭

'ভেলেনাপোতা আবিষ্কার' এই বইখানির চিত্র রূপ 'স্বপ্ন নিয়ে' নামে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে শেষ করে। এবং ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬৬ সালে। জ্ঞানী গুণী লোকেদের খুব প্রশংসা পেয়েছিল ছবিটি। পুরস্কারও পেয়েছিল। কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে তেমন সাফল্য পায়নি। বইখানি বেশী দিন চলেনি। এই ছবির নায়ক ছিল অরুণ মুখোপাধ্যায়। নায়িকা মাধবী মুখার্জী।

এরপর দ্বিতীয় ছবি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' আরম্ভ করে ১৯৭২ সালে। এই ছবিরও চিত্রনাট্য রচনা করে পূর্ণেন্দু। এই ছবির বিন্দু-র অভিনয় করার জন্য সে

একটি মেয়ে খুঁজছিল। কিন্তু মনের মত মেয়ে পাচ্ছিল না।

রেডিও অফিসের বিনয় ঘোষের মুখে শুনল কবিতা-বিমলের একটি মেয়ে আছে, তাকে আপনার পছন্দ হতে পারে। রেডিও অফিসে কবিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। বললে, চল তোর বাড়িতে যাব। তাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে বলল, তোর মেয়ে কই। সে স্কুলে গেছে। কখন ফিরবে। চারটায় ফিরবে। রাজু এল। ক্লাস এইটে পড়ে। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। তাকে এক গেলাস জল আনতে বলল। রাজু জল আনতে গেল।

আমি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির ছবি করছি। রাজুকে বিন্দুর রোলটা দিতে চাই। দিবি ? কবিতা বলল, দিতে পারি এক শর্তে।

কি শর্ত, প্রযোজক ভালো টাকা দেবে। কবিতা বলল, না, রাজুকে কোন টাকা দিবে না। বাজু কোন টাকা নেয় নাই। প্রযোজক উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ড্রেস মেকার ম্যাডামেব মালিক। রাজেশ্বরীকে সাদা লেসের একটি পোশাক উপহার দিয়েছিলেন।

এই বইটির প্রথম দিকের শ্যুটিং হয় আমার গ্রাম নাকোলে। এই ছবিতে ছিলেন মাধবী মুখার্জী, নিমু ভৌমিক, সীতা দেবী ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীরা। এই সময আমার নাতনীরাও গিয়েছিল দেশের বাড়িতে। প্রযোজক ধীরেন বায় তার ভাগনী সিতু ও রাজেশ্বরীর বাবাও মেয়েব সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং এরা আমার বাড়িতেই থাকতেন।

বাড়ির সামনে একটা আটচালা ছিল। অন্যান্য লোকজন সেখানে থাকত। সীতা দেবী থাকতেন আমার ভাইয়ের বাড়িতে। রান্নাবান্নাও হ'ত আমার ছোট ভাইয়ের উঠানে। শ্যুটিং আরম্ভ হল আমার বাড়ির একটি পুকুরের ধারে। আমাকে দিয়ে ক্ল্যাপস্টিক দেওয়ান হল। পরে আমাদের মামার বাড়ি, নদীর ধারে মাঠে শ্যুটিং হয়েছিল।

ছবির বেশীর ভাগ অন্য দৃশ্যগুলি বেলগাছিয়ার ধূর্জটি ভবনে। এই ছবিতে মাধবী মুখার্জী পূর্ণেন্দুকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। নিজের পারিশ্রমিক না নিয়েও। পূর্ণেন্দু তাকে একটি কবিতা উপহার দিয়েছিল 'মাধবীর জন্যে'।

কবিতাটি খুব সুন্দর হয়েছিল এবং কোন এক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।* ছবিটি রিলিজ হয় ১৯৭৩ সালে। এই ছবিটি খুবই ভাল হয়েছিল। এবং অনেক পুরস্কারও পেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে Regional Best, Government of India, Film Fair এবং BFJA West Bengal বাংলা ছবি, তাসখণ্ড Film Festival Award.

১৯৭৪ সালে 'ছেঁড়া তমসুক' নিয়ে শ্যুটিং শুরু হল। বইখানি সমরেশ বসুর লেখা। পূর্ণেন্দু এই বইটির চিত্রনাট্য রচনা করেছিল। এতে মাধবী ছিল না।

* 'মাধবীর জন্যে' কবিতাটি পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

সুমিত্রা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। রঞ্জিত মল্লিক, নিমু ভৌমিকও এই বইয়ে অভিনয় করেছিল। এই ছবিতে একটি কবি সম্মিলনীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন অংশ নিয়েছিলেন। এই ছবি ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিতে B.F.J.A. পুরস্কার এবং West Bengal দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য।

চতুর্থ ছবি 'মালঞ্চ'। রবীন্দ্রনাথের লেখা। চিত্রনাট্য পূর্ণেন্দুর। এই ছবিতেও নায়িকা মাধবী।

ছবি শুরু হল ১৯৮০তে। বহু লোকের অর্থ সাহায্যে ছবিটি শেষ হল। এবং মুক্তি পেল ১৯৮২তে। এই ছবিতে সুরকার ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবং আমার যেন মনে হচ্ছে ছবিটির শেষে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন 'মধুর তোমার—'। ছবিটি দেখে আমার মনে হয়েছিল এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। জানি না কেন এই ছবিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পূর্ণেন্দুর চারটি ছবির মধ্যে তিনটি ছবির নায়িকা ছিল মাধবী। শুধু ছেঁড়া তমসুকে ছিল না। সুমিত্রা ছেঁড়া তমসুকে নায়িকার ভূমিকায় করেছিল।

এরপর পূর্ণেন্দু একটি দুঃসাহসের কাজে হাত দিতে চেয়েছিল। অনেক দিন থেকে এই ছবিটি নির্মাণ করবার তার খুব ইচ্ছা ছিল। চিত্রনাট্য রচনা করেছিল।

প্রখ্যাত প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী এই কথা জানতে পেরে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করে চিত্রনাট্যটি দেখতে চায়। চিত্রনাট্য দেখে হেমেন গাঙ্গুলীর খুব ভাল লাগে এবং পূর্ণেন্দুকে দিয়েই এই ছবিটি করাতে রাজী হন। বইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। তবে তাঁর ইচ্ছা ছিল নায়িকা হবে সুচিত্রা সেন, জ্যাঠামশায় হবেন রাধা-মোহন ভট্টাচার্য ও গুরুদেবের ভূমিকায় বাসুদেব ভট্টাচার্য। সুচিত্রা ও রাধামোহন রাজী হল। কিন্তু বাসুদেব থাকেন বোম্বাইয়ে। ফোনে কথা হল। তিনি বললেন চিত্রনাট্য না দেখে আমি রাজী হতে পারব না।

হেমেন গাঙ্গুলী চিত্রনাট্য ও পূর্ণেন্দুকে নিয়ে প্লেনে বোম্বাই গেলেন। চিত্রনাট্য পড়ে বাসু ভট্টাচার্য সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হলেন। কথাবার্তা পাকা করে দুজনে ফিরে এল কলিকাতায়। সুটিংয়ের দিন ও স্থান ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সুটিং আরম্ভের আগের দিন রাত্রে হেমেন গাঙ্গুলী তাঁর রাঁচির বাড়িতে পাতকুয়ায় পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। ছবি আর হল না। পূর্ণেন্দুর মনের ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল।

চারখানি কাহিনী চিত্র ছাড়াও পূর্ণেন্দু কয়েকটি তথ্যচিত্রও করেছিল। ১৯৭৬ সালে 'অবনীন্দ্রনাথ'। ১৯৭৮ সালে 'বাংলার পট'। ১৯৮০ সালে 'কালিঘাটের পট'। ১৯৮১ সালে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। ১৯৮০ সালে 'গীত গোবিন্দম'। ১৯৮২ সালে 'ক্ষীরের পুতুল'। 'খরা' ও 'গুহাচিত্র' অসমাপ্ত।

৮

পূর্ণেন্দু আনন্দবাজারে শিল্প নির্দেশক হিসাবে চাকরি করে বেশ কয়েক বছর। সেখানে শিল্প নির্দেশনার অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল। আনন্দবাজার আনন্দলোক, সানন্দা প্রভৃতি কাগজের শিরোলিখন তারই হাতের কাজ।

আনন্দবাজার বাংলাদেশের যুদ্ধের উপর একটা বই সম্পাদনা করতে মনস্থ করে এবং পূর্ণেন্দু ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর এই কার্যের ভার দেয়। শ্যামল লিখে পূর্ণেন্দুকে দেয়, পূর্ণেন্দু পড়ে ছবি আঁকে। এইভাবে প্রায় দুমাস কাজ করে বইটি শেষ করে।

মুজিব ইন্দিরার মিটিং প্যারেড গ্রাউণ্ডে। সেই সময় ওদের দুজনের হাতে 'বাংলা নামে এক দেশ' নামে ওই বইখানি তুলে দেওয়া হয়। আনন্দবাজারে ধর্মঘট হয়। এর পর পূর্ণেন্দু আনন্দবাজারের কাজ ছেড়ে দেয়। কারণ আমি কানঘুষায় যা শুনেছিলাম তাই লিখছি। সত্য কিনা তা ঠিক বলতে পারব না। অশোক সরকার মারা গেছেন, অভীক মালিক। পূর্ণেন্দু শিল্প নির্দেশক। কাকে কি করতে হবে তার নির্দেশ দেবে পূর্ণেন্দু।

কিন্তু অভীক পূর্ণেন্দুকে এড়িয়ে বিপুল গুহ নামে এক জুনিয়ারকে কাজ দিতে আরম্ভ করায় পূর্ণেন্দু নিজেকে অপমানিত বোধ করে এবং চাকরি ছেড়ে দেয়।

প্রিয়ব্রত দেব ও স্বপ্না দেব 'প্রতিক্ষণ' নামে একটি কাগজ বার করে। আর একজন দক্ষ শিল্প নির্দেশক খুঁজছিলেন। ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বোধ হয় প্রিয়ব্রত বাবুদের কোনরূপ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি শুনে প্রিয়ব্রতবাবু ও স্বপ্না দেবকে সঙ্গে এনে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে দেন এবং তার মাধ্যমে পূর্ণেন্দু 'প্রতিক্ষণে' যোগ দেয়। প্রতিক্ষণ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক তার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই। পূর্ণেন্দু শুধু প্রতিক্ষণের শিল্প নির্দেশক বা গুরুত্ব পূর্ণ লেখকই ছিল না। অন্যতম প্রধান সংগঠক পরিচালকও ছিল। প্রতিক্ষণ প্রকাশনায় তার ছিল এক প্রধান ভূমিকা। দেবেশ রায়ও প্রতিক্ষণ পত্রিকায় যোগদান করে এবং পূর্ণেন্দু ও দেবেশ রায়ের মারফত অনেক শিল্পী প্রতিক্ষণে চাকরি পেয়ে যায়।

পূর্ণেন্দু প্রতিক্ষণে সুধানাথ চক্রবর্তী নামে অনেক লেখা লিখেছে। প্রতিক্ষণ ছাড়ার পর আর সুধানাথ চক্রবর্তী নামে কোন লেখালেখি করেনি। পূর্ণেন্দু কেন প্রতিক্ষণ ছাড়ল তা আমি বলতে পারব না। অথচ আজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। আমাদের বাড়িতে এখনও স্বপ্না দেব আসেন।

পরে আজকালে যোগদান করে। সেখানেও পূর্ণেন্দু ছিল শিল্প নির্দেশক। আজকাল 'সকাল' নামে শিশুদের একটি পত্রিকা বাহির করে। পূর্ণেন্দু ছিল সকাল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। কত বিষয়ে যে সেই পত্রিকায় লেখা থাকত তা বলবার নয়। সে আজকাল কেন ছাড়ল তাও বলতে পারলাম না। পূর্ণেন্দু আর কোথাও চাকরি করেনি। প্রতিদিনের ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হয়ে গাড়ি নিয়ে গ্রামে গ্রামে

ঘুরে তাদের অভাব অভিযোগ কাগজে লিখেছে। শেষে সে কাজও ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে বসে ছবি আর বই পড়া ও লেখালেখি করে গেছে।

৯

এবার আমি মানুষ পূর্ণেন্দুর কিছু কথা আমার যেটুকু জানা আছে তা লিখছি। পূর্ণেন্দু ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং গম্ভীর প্রকৃতির। তবে বন্ধুদের সঙ্গে সে হাস্য পরিচয় করত। কিন্তু সে ছিল সরল উদার ও স্নেহময় বন্ধু বৎসল। তার বন্ধু বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের সংখ্যা অগণিত। তার অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ ছিল যেমন তীব্র, তেমনি স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা ছিল অফুরন্ত।

পূর্ণেন্দু অনেককে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেছে। কাউকে আশ্রয় দিয়েছে, কাউকে আর্থিক সাহায্য করেছে। কাউকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে। এর মধ্যে একজনের নাম দিগেন মুখোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দু স্কুল জীবন থেকে সি. পি. এমের সঙ্গে যুক্ত, নিমাই শূরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে বাগনানে পূর্ণেন্দু প্রায়ই যেত। সেখানে সে ছেলেটিকে দেখে। ছেলেটি কলেজে পড়ত। কিছু লেখালেখি করত। ছেলেটির বাবা মারা যাবার পরে অসহায় হয়ে পড়ে। বাবার জীবিতকালে অনেকেই তার কাছে সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পাছে কোন সাহায্য চেয়ে বসে এই ভেবে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিধবা মা ও অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে। ছেলেটি কিন্তু খুব মেধাবী ছিল। শিল্পী হবার তার খুব ইচ্ছা।

তার এই অধ্যবসায় পূর্ণেন্দুকে মুগ্ধ করেছিল। এবং তাকে সাহায্য করবার একটা প্রবল ইচ্ছা তার মনে জেগে উঠল। নিমাই শূরকে জানাল দিগেনকে সে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। দিগেন তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

পূর্ণেন্দু তাকে বলল তুমি যদি আমার বাড়ি থাক ও এখান থেকে কলেজ কর তাতে কি তোমার অমত বা কোন অসুবিধা হবে।

পূর্ণেন্দুর কথা শুনে দিগেন হতচকিত হয়ে গেল। আবেগ পূর্ণ স্বরে বলল, দাদা আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন এ তো আমার সৌভাগ্য। আমি অমত বা অসুবিধা বোধ করব কেন? আমি তো বেঁচে যাব।

দিগেন আশ্রয় পেল পূর্ণেন্দুর বাড়িতে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করল। খুব উঁচু দরের চাকরি পেয়ে গেল। বাড়ি তৈরি করল। বোনের বিবাহ দিল, নিজে বিবাহ করল। ছেলে হল একটি। তারও বিবাহ দিল।

দিগেন পূর্ণেন্দুর কাছে যে উপকার পেয়েছিল সেকথা কিন্তু একটুও ভুলে যায়নি। সে এখন আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে পূর্ণেন্দুকে নিজের দাদার মতই ভালোবেসে গেছে।

পূর্ণেন্দু আমাদের খুব ভালবাসত এবং ভক্তি করত। আমরা ছিলাম

একান্নবর্তী পরিবার। মা বাবা ভাইবোন ছেলে মেয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নি করে লোক সংখ্যা ছিল আঠার-উনিশ জন।

আমি ছিলাম সবার বড। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ঘাডে। একান্নবর্তী সংসার চালনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজকার দিনে শিক্ষিত লোকেদের কাছে এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় বলে মনে হবে। কিন্তু তা নয়। অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হবে। অনেক সহিষ্ণু হতে হবে। সকলের মন রাখতে হবে। পরিবারের সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তা না করতে পারলে পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। আমি সেজন্যে নিজ স্ত্রীপুত্রের জন্য আলাদা কিছু করতে পারি নাই। সকলের জন্য করে গেছি একই রকম ব্যবস্থা, আমার যাট বৎসর বয়স পর্যন্ত।

যখন পরিবার ভেঙ্গে আলাদা আলাদা হয়ে গেছি, তখন আমি চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে বসেছিলাম। বিশেষ কোন আয় ছিল না আমার। পূর্ণেন্দু তখনও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি আমি তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারিনি বা করিনি। সে কিন্তু সেদিন থেকে আমাকে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে আমাদের ভরণ পোষণ করে এসেছে এবং পরে সন্টলেকে এনে আমাদের সুখ সুবিধার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রেখে পরম আদরে আমাদের রেখেছিল তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। এখনও আমার নাতি নাতনীরা আমাকে সমাদরের সঙ্গে দেখাশুনা করছে। অভাব অভিযোগ পূরণ করতে সদাই ব্যস্ত। এমন পুত্র কজনের ভাগ্যে জোটে।

এ জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

আমি স্ত্রী পুত্রের জন্য কিছু করিনি বলে আমি স্ত্রীপুত্র কন্যাকে কিছু কম ভালবাসতাম না। ছেলে মেয়ে আমার প্রাণের তুল্য প্রিয় ছিল। আমি ছেলে মেয়েদের কোনদিন প্রহার করিনি। মেয়েকে তো কোনদিন মেরেছি বলে মনে হয়না। তবে ছেলেকে একদিন মেরে ছিলাম। ছেলে যে কেমন জেদি ছিল তা জানাবার জন্য আমার এত কথার অবতারণা।

পূর্ণেন্দু কি একটা অন্যায় কাজ করেছিল। শনিবার বাড়ি গেছি। রবিবার আমার স্ত্রী সেই কথা জানাল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন এ কাজ করেছিলি। সে কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর করল না। উত্তর না পেয়ে আমি তাকে দুএকটা চড় মারলাম আস্তে করে। ভাবলাম এই মার খেয়ে সে বলবে আর কোনদিন করব না। কিন্তু সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, উত্তর দেওয়া দূরের কথা নড়ল না চড়ল না পর্যন্ত, আমার রাগ বেড়ে গেল। হাতের কাছে একটা পাখা ছিল, তাই দিয়ে মারতে লাগলাম। সে কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগল। কোনও কথা বলল না। কেবল তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি তখন বললুম, এমন অবাধ্য ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, যা আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

সত্যি-সত্যি সে চলে গেল বাড়ির বাইরে। আমার মনটা কেমন করে উঠল। সামান্য কারণে ছেলেটাকে আমার মারা উচিত হল না। ও বাইরে চলে গেল। কোথায় যাবে কি করবে, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা বেদনা বোধ অনুভব করলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি সোজা চলে যাচ্ছে। ছুটলাম তাকে ধরবার জন্য খানিকটা দূর গিয়ে তাকে ধরলাম। কোলে করে নিয়ে বাড়িতে এলাম। তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর আমার চোখ দিয়েও জল পড়ছে। তাকে এনে তার মার কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার চোখে জল দেখে আমার স্ত্রী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। আর জীবনে কোন দিন ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তুলিনি।

আমার অসুখের সংবাদ শুনে পূর্ণেন্দু দেশে গিয়ে আমাদের সল্টলেকে নিয়ে এল। সেই থেকে আমি সল্টলেকে আছি। বাংলা ১৩৯৬ সালে আমাদের এনেছিল।

পূর্ণেন্দু মাকে যেমন ভালবাসত তার মাও তাকে সেই রকম ভালবাসত। তার মায়ের স্ট্রোক হল। পূর্ণেন্দু তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেনি। একটু ভাল হতে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। নার্স রাখল। আমার স্ত্রী তখন অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। চলতে ফিরতে পারত না। কথাবার্তা স্পষ্ট নয়। জড়ান জড়ান।

তার মা কি খেতে ভালবাসত তা তার জানা ছিল। যখন সে ফাঁক পেত নিজে বাজার গিয়ে দু-তিন রকমের মাছ এনে মায়ের কাছে এসে বলত মা তোমার জন্য দু-তিন রকমের মাছ এনেছি। ছেলের কথা শুনে রোগশয্যায় শুয়ে মায়ের চোখে হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠত।

পূর্ণেন্দু অনেক সভা সমিতিতে আমন্ত্রণ পেত বা অন্য কার্যে বাইরে গেলে সে সেন মহাশয়ের দোকান হতে রসমালাই আনত যা সুগারের রোগীও খেতে পারত। এনে মাকে বলত, মা তোমার জন্যে রসমালাই এনেছি। বলে মাকে খাওয়াত। মা আজ রাবড়ি এনেছি। তোমার তো খাওয়া বারণ, তা হোক উমাকে বলব, তোমাকে অল্প করে দেবার জন্য। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ছেলের প্রতি কি অগাধ স্নেহ ছিল তার।

পূর্ণেন্দুর কাছে লোকজনের দিন রাত অবিরাম আনাগোনা ছিল। কাজকর্ম চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে পরিচারিকাকে ডেকে বলছে সীতা ক কাপ চা। অন্তরঙ্গ লোক এলে মিষ্টি চানাচুর ভালমুট আনার কথা বলত। বেলা একটা বেজে গেছে। তখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি।

পাশের ঘরে শুয়ে আছে তার মা। তখন তার কথা একটু জড়িয়ে যেত। সেই অবস্থাতেই কাঁপা কাঁপা গলায় বলত, দুলালরে কখন নাইবি খাবি বাবা। বেলা যে গড়িয়ে গেল। এবার উঠে পড়। খেয়ে দেয়ে নে। এই ডাক এমন মধুর ভাবে ডাকত যা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। এমন স্নেহপূর্ণ ডাক আমি অন্য কারও মুখে শুনিনি। ছেলেও ঘর থেকে উত্তর দিত, এই যে যাচ্ছি মা। কাজ হয়ে

গেছে। এবার নাইব খাব।

পূর্ণেন্দু যদি কিছু কর্মের প্রেরণা পেয়ে থাকে, পেয়েছে সে তার মায়ের কাছ থেকে, আমার কাছ থেকে সে কিছুই পায় নাই।

পূর্ণেন্দু আমাকেও কম ভালবাসত না, ভাল তো বাসতই, শ্রদ্ধা ভক্তি করত অনেক বেশী। আমার মুখ থেকে কথা বেরন মাত্র তা করে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দিত। বাড়িব সবাইকে বলা ছিল বাবার যেন কোন রকম অনাদর না হয়।

বহু ভাগ্য না হলে এখন পুত্র পাওয়া যায় না।

পূর্ণেন্দু ছেলে মেয়েদেরও কি কম ভাল বাসত? ছেলে মেয়েরাও ছিল তার গলার হাব। বুকের পাঁজব। ছেলে মেয়েদের সে দিয়েছিল অবাধ স্বাধীনতা। কোনদিন তাদের শাসন করেনি বা করতে দেখিনি। দেখেছি তাদের সঙ্গে গল্প করতে। হাসি ঠাট্টা কৌতুক কবতে। খেলা করতে, তর্ক বিতর্ক করতে।

এত আদর পেয়েও ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হয়নি, ববং সকলেই সুশিক্ষিত হয়েছে। মেয়েবা সকলেই এম এ পাশ। ছেলে দিল্লীতে ভাল চাকরি করে। বড মেয়ে ও ছোট মেয়ে চাকবি কবে। বড মেয়ে ডানলপে। ছোট মেয়ে শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপিকা চীনা ভাষাব। আর মেজ মেয়ে চাকরি করে না। বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে আরব দেশে চলে গেছে। ছেলে মেয়েরা বাপেব গর্বে গর্বিত।

পুত্র টুটুল, পুত্রবধূ মধুমিতা, জ্যেষ্ঠা কন্যা উপমা, কনিষ্ঠা কন্যা তন্দ্রিমা পিতার অসুখে যেভাবে সেবা কবেছে তা না দেখলে মুখে বলে বোঝান যাবে না। দুই বেলা হাসপাতালে যাওয়া, তাকে খাওয়ান তার হাত পায়ে গায়ে হাত বুলান ইত্যাদি করেছে।

ভিজিটিং আওয়ারের ছাড় ছিল কিছুটা তার জন্য। সেই সুযোগে তারা পিতার জন্যে যা করেছে তা দেখবাব মত। শিখবার মত ছিল।

পূর্ণেন্দুর হৃদয় যে কেমন স্নেহময় ছিল তার বিষয়ে আরও একটু জানাচ্ছি। কিছু দিন আগে তার মধ্যমা কন্যা রূপমার বিবাহ হয়েছিল। জামাতা আরব রাজ্যে মসকট নামে একস্থানে চাকরি করত। বিবাহের পর কন্যা স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থানে চলে যায়। কিছুদিন আগে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। পিতার অসুখের সংবাদ শুনে কন্যা স্বামী পুত্র সহ সল্টলেকের বাড়িতে চলে আসে।

পূর্ণেন্দুর শরীরে সপ্তাহে পাঁচদিন রে দিচ্ছে ডাক্তারেরা। রে করবার পর ভীষণ যন্ত্রণা হয় শরীরে। সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে দৌহিত্রকে দেখবার জন্য ডাক্তারদের কাছ থেকে চার ঘণ্টা ছুটি নিয়ে সে বাড়ি চলে আসে। এবং দৌহিত্রকে নিয়ে কি রকম আদর করে গেল, দেখে অবাক হয়ে যেতে হল।

সেই অবস্থায় তাকে কোলে নিয়ে গান করে তার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে নাচিয়ে খেলিয়ে আবার হাসপাতালে চলে গেল। সেই মধুর দৃশ্যকে ক্যাসেটে ধরে রাখা আছে।

তার জীবনের কয়েকটি ঘটনা লিখতে ভুল হয়ে গেছে সেটা নিয়ে দিচ্ছি পরে, পূর্ণেন্দুর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ছিল প্রবল। কেউ তাকে তার সত্য নিষ্ঠা থেকে বিরত করতে পারত না।

পল্লীগ্রামে এক প্রথা ছিল ছেলে বিয়ে করতে যাবার আগে বাপ মা ও অন্যান্য গুরুজনদের বলত, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। এসব আজ আর কেউ মানে না। পূর্ণেন্দু বিবাহ করতে যাবার সময় বাবা মা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করল। সকলে তাকে বলল, মাকে বল তোমার দাসী আনতে যাছি। সবাই তাকে বলল, আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এই প্রথা, তুই তা মানবি না? পূর্ণেন্দু বলল, আবহমানকাল থেকে একটা ভুল প্রথা চলে আসছে বলে সেটাই মানতে হবে? আমি কি দাসী আনতে যাচ্ছি? যে বলব দাসী আনতে যাচ্ছি। আমি তো যাচ্ছি বাড়ির বৌ আনতে। শুধু শুধু সত্যকে ছাপিয়ে মিথ্যা বলতে যাব কেন? এই হচ্ছে পূর্ণেন্দু।

তার আর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সে নিজেই নিজের চুল কাটত আর ছেলে মেয়েদেরও চুল কেটে দিত। আর তার হাতে টাকা এলে ফুলের টব আর কাঠ কিনত। বই রাখবার জন্য র‍্যাক ও গাছ লাগবার জন্য টব। আলমারিতে বই রাখলে নাকি পোকায় বই কাটে, তাই সে র‍্যাকে বই রাখত। তাই তার ঘরের দেওয়াল ছিল র‍্যাকে ভর্তি। আর ছোট বড মাঝারি টবে সে গাছ লাগাত, নানা জাতের গাছ। এই ছিল তার হবি।

পূর্ণেন্দু ক্রিকেট খেলা দেখত। আমিও ক্রিকেট খেলা দেখতে ভাল বাসতাম, এখনও ভালবাসি। ক্রিকেট খেলা থাকলে পূর্ণন্দু T. V. খুলে, আমাকে ডাকত, বাবা খেলা আরম্ভ হয়েছে, আসুন। আর দিন রাতের খেলা হলে রাত্রি একটা হয়ে গেলেও, খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে খেলা দেখত।

আর টেপে তে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মৃদু সুর শুনতে শুনতে কাজ করতে ভালবাসত।

পূর্ণেন্দু শুধু উপযুক্ত সন্তান সন্ততিই পায়নি। যোগ্য সহধর্মিণীও পেয়েছিল। আমার মনে হয় এমন সহধর্মিনী না পেলে পূর্ণেন্দু বোধ হয় এত বড় হবার সুযোগ পেত না। নিজের কাজ ছাড়া তাকে সংসারের অন্য কাজের দায়িত্ব বহন করতে হত না। সংসারের সব দায়িত্ব ছিল পত্নী উমার উপর। পূর্ণেন্দু টাকা দিয়েই খালাস।

পত্নী উমা সুষ্ঠুভাবে সব দিকে লক্ষ্য রেখে সংসার চালিয়ে গিয়েছিল বলেই পূর্ণেন্দু তার নিজ কার্যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। এবং উন্নতির উচ্চশিখরে উঠতে পেরেছিল।

পূর্ণেন্দু শুধু ভাই বোন স্ত্রী পুত্র বাপ মাকেই ভালবাসত না, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই ভালবাসত আর সকলেও তাকে ভালোবাসত। তার কোন

শত্রু ছিল না। কারও সঙ্গে বিবাদ ছিল না। তাকে এক কথায় অজাতশত্রু বলা যেতে পারে।

পূর্ণেন্দুর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অনেক বড় বড় লোককেও সে যুক্তি তর্কের দ্বারা পরাস্ত করেছে এবং নিজের মতকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে, এমন দৃষ্টান্ত বহুবার দেখা গেছে তার জীবনে। আমরাও অনেক ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।

ছোট ভাই নিকুঞ্জর জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেন্দু হঠাৎ ললিতা কুণ্ডু নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করে বসল। ব্রাহ্মণ সন্তান এক কুণ্ডুর মেয়েকে বিবাহ করল, এটা বাপ মানতে পারল না, বিশেষতঃ তখনও পল্লী অঞ্চলে অসবর্ণ বিবাহ চালু হয়নি। বাপ রেগে আগুন, এ বিবাহ মেনে নেবে না। পুত্রকে বাড়িতে স্থান দেবে না। মেয়েটি কিন্তু উচ্চ শিক্ষিতা। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপিকা।

অলকেন্দু দাদা পূর্ণেন্দুর কাছে উপস্থিত হয়ে সকল বিষয় জানাল। পূর্ণেন্দু কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনেক যুক্তি তর্ক করে অসবর্ণ যে অবৈধ নয় এ যুগে, তা প্রমাণ করিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করল। এবং তার ফলে কাকা ছেলে-বউকে ঘরে নিল। আনুষ্ঠানিক বিবাহ বৌভাত ইত্যাদি যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হল।

পূর্ণেন্দু জাতপাত মানত না। সে জানত মানুষকে। তার ভগিনীর বড় মেয়ে বিবাহ করল এক মুসলমানের ছেলেকে। বাপ মা কিছুতেই মেয়েকে ঘরে নেবে না। পূর্ণেন্দু ভগিনীকে ডেকে বোঝাল, এতে দোষ কি হল। সে তো একজন মানুষকে বিবাহ করেছে। ভূত প্রেত বা জন্তু জানোয়ারকে বিবাহ করেনি ও। ঠাকুর বাড়ির মেয়ে শর্মিলা বিবাহ করল পাতৌদিকে, নজরুল মুসলমান হয়েও এক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাকে বোঝাল। তাছাড়া মেয়ে বিয়ে করেছে তার পছন্দ মতন ছেলেকে। বিয়ে করে যদি সুখী হয় তবে সে অন্যায় কি করেছে। তোমাদের তো তাকে নিয়ে ঘর সংসার করতে হবে না, তবে তোমরা এত রেগে যাচ্ছ কেন? এইভাবে বুঝিয়ে সব মিটমাট করে দিয়েছিল।

পূর্ণেন্দু বলত ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জাত সৃষ্টি করেননি। বা তার গায়ে এ ব্রাহ্মণ, এ শূদ্র, এ মুসলমান ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠাননি। তবে এসব নিয়ে এত গণ্ডগোলের কারণ কি? সত্য যা তা হচ্ছে মানুষ। জাত নয়।

১০

১৯৮৯ সালে বাংলা দেশ সরকার তাকে তাঁদের কোন কাজে এক মাসের জন্য বাংলা দেশে নিয়ে যান। সেখানে এক সম্রান্ত মুসলমানের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে পূর্ণেন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা সেই অসুখে তার সেবা যত্ন ও চিকিৎসাদি করিয়েছিল। নিজের বাড়িতেও বোধ হয় এমন যত্ন আদর বা ভালবাসা পেত না। বাড়িতে ফিরে সে পঞ্চমুখে তাদের প্রশংসা করেছিল।

বাংলাদেশে তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা অগণিত। ঢাকায় সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেখানে অনেক কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পীর সঙ্গেও বেশ পরিচয় হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকে প্রবাসী। তারা লণ্ডন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। উত্তরকালে যখন পূর্ণেন্দু ওই সব স্থানে গিয়েছে তারা তাকে সমাদরের সঙ্গে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাড়িতে বসবাস করিয়েছে।

তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, খাল নদী নালা, গাছ পালা, বিভিন্ন রকমের নৌকা তাকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে, সেইসব দৃশ্য নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছিল। এবং মনে হয় বাড়িটাও ১৪ নং হবে, সেই বাড়িতে এক প্রদর্শনী করেছিল। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিল বাংলাদেশের হাই কমিশনার।

পূর্ণেন্দু তার ছবির প্রদর্শনী করেছিল কয়েকবার। প্রথম প্রদর্শনী বৃটিশ কাউনসিল, কলিকাতায়। দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়েছিল লণ্ডন, উডগ্রীব গ্যালারিতে। তৃতীয় প্রদর্শনী হয়েছিল বি. এফ ১৪ নং, বাংলাদেশের ছবি নিয়ে। চতুর্থ প্রদর্শনী বোম্বের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে। পঞ্চম প্রদর্শনী বিড়লা একাডেমিতে, ক্যাকটাস নিয়ে।

পূর্ণেন্দু বইয়ের বা অন্য কোন জিনিসের নাম করেছিল অদ্ভুত ধরনের। বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেদের আঁকা শেখাবার জন্য রবিবার রবিবার একটা স্কুল করেছিল। তার নাম দিয়েছিল 'আঁকড়ুম', প্রথম কবিতার বইয়ের নাম 'একমুঠো রোদ'। তার লেখা বই, যা সে ছোট ছেলেদের জন্য লিখেছিল, তার নাম করেছিল 'আলটুং ফালটুং', 'ম্যাকের বাবা খ্যাক', 'বাবুরাম সাপুড়ে' ইত্যাদি নামে।

পূর্ণেন্দুর শারিরীক অবস্থা বেশ ভাল ছিল না। শীতকাল এলেই হাঁপানিতে বেশ কষ্ট পেত। তাছাড়া তার অর্শ ছিল। তাতেও মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট পেত।

পূর্ণেন্দু এসব কষ্টকে গ্রাহ্যই করত না। এসব কষ্ট সহ্য করে সে সমানে কাজ করেছে, লিখেছে, এঁকেছে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছে। সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছে, এবং সাংবাদিক রূপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার অধিবাসীদের খবর সংগ্রহ করেছে এবং তা কাগজে লিখে জানিয়েছে।

পূর্ণেন্দুর কর্মজীবন আমার জানা ছিল না। জানবার উপায়ও ছিল না। আমি থাকতাম দেশে, সে ছিল সল্টলেকে। মাঝে মাঝে দু-এক মাসের জন্য আসতুম মাত্র। তাই তার কর্মজীবন আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। কাগজ পড়ে বা তার মৃত্যুর পর বন্ধুবর্গের তার সম্বন্ধে লেখা পড়ে যা জেনেছি তাই লিখলাম। তার লেখা পড়ে জানলাম সে একজন লেখক, তার চিত্রকলা দেখে জেনেছি সে একজন চিত্রকর, তার কবিতা পড়ে জেনেছি সে একজন কবি, তার প্রবন্ধ পড়ে জেনেছি সে একজন প্রাবন্ধিক। তার নির্মিত সিনেমার ছবি দেখে জেনেছি সে একজন চিত্র পরিচালক। বইয়ের কভার আঁকা দেখে বুঝেছি সে একজন প্রচ্ছদ আঁকিয়ে।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে সে যে এত বড হয়ে উঠেছে তা জানতে পারিনি।

তার মৃত্যুর পর প্রতিক্ষণের স্বপ্না দেব, দে'জ পাবলিশিংয়ের সুধাংশুমোহন দে, আজকাল পত্রিকা, প্রতিদিন পত্রিকা, গণশক্তি পত্রিকা তার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। তার বন্ধুবর্গ ও সহকর্মীরাও তার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছে স্মরণিকা রচনায়, তাঁদের নামগুলিও লিখে দিলাম।

বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, অরুণ মিত্র, বুদ্ধদেব গুহ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রকাশ কর্মকার, তারাপদ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর বল, কিন্নর রায়, সুধাংশু দে, কমল চৌধুরী প্রমুখ স্মরণিকা পুস্তকে তার কার্য বিবরণী ও বহুমুখী প্রতিভার বিষয় বিশদভাবে লিখে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখে গেছেন পূর্ণেন্দুর মৃত্যুতে শিল্প ও সাহিত্য জগতের অনেক ক্ষতি হল ইত্যাদি।

তার বাল্য জীবন ও কর্মজীবন আমি যেটুকু জানি তা জানালাম। তার মা জীবিত থাকলে আরও অনেক কিছু জানা যেত।

সামান্য কিছুদিন আগে পূর্ণেন্দু বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছিল শিশু সাহিত্যের জন্য। পুরস্কাব পেয়ে পূর্ণেন্দু তার বন্ধুদের ফোনে বলেছিল, তোদের সরকার আমাকে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়েছে। যা হোক অনেকগুলো টাকা হাতে এসেছে, মনে করেছি তোদের নিয়ে এই রবিবার সন্ধ্যায় গল্পগুজব সাহিত্য আলোচনা করব, আর খাওয়া দাওয়া করার ইচ্ছা করেছি। তোরা সব সস্ত্রীক আসিস। বেশ খানিকটা আনন্দে কাটান যাবে। তারা সব এসেছিল এবং খাওয়া দাওয়া করে গল্প গুজব ও হৈহল্লা করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল।

পূর্ণেন্দুর শেষ গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রথম খণ্ড ১৯৯৭-এর মেলায় বেরিয়েছিল। তখন সে দারুণভাবে রোগপীড়িত। 'বঙ্কিম যুগ' আরও কয়েক খণ্ড হত, আর প্রকাশিত হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ সব লিখে যেতে পারে নি।

১১

কিছুদিন থেকে পূর্ণেন্দুর শরীর বেশ ভাল যাচ্ছিল না। কোমর ও পায়ে যন্ত্রণা হতে আরম্ভ হল। চলবার বা দাঁড়াবার শক্তিটুকুও আর রইল না।

১২ই ফেব্রুয়ারি পূর্ণেন্দুকে ডাঃ বড়ুয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, কিছু তো বুঝতে পারছি না। কতকগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন।

ডাক্তারের কথা মত পরদিনই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। চার-পাঁচ দিন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাকে পি. জি হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজ্য সরকার তার চিকিৎসার ভার নেন।

প্রায় দীর্ঘ এক মাস পূর্ণেন্দু হাসপাতালে ছিল। এই সময় তাকে সপ্তাহে পাঁচদিন 'রে' দেওয়া হত। রে দেওয়ার পর ভীষণ যন্ত্রণা হত। সারাদিন সেই যন্ত্রণা সহ্য করে সে অগণিত দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে হেসে কথা বলেছে। কবিতা লিখেছে। ছবি এঁকেছে।

অসুখটা হয়েছিল ক্যানসার। আমি অনেকদিন জানতে পারিনি এই অসুখের কথা। উমা বা ছেলেমেয়েরা সবাই জানত। তারা আমাকে জানায় নি। পাছে আমি কাতর হয়ে পড়ি। ডাক্তারেরা জানিয়েছিলেন আরোগ্য হবে না। শেষ হয়ে এসেছে। যেকোনদিন জীবন দীপ নিভে যাবে। তাই হল।

প্রতিদিন সে হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্টকে একটা করে ছবি এঁকে দিয়েছে। প্রতিদিন কবিতা লিখেছে। বন্ধুবান্ধবদের সে কবিতা পড়ে শুনিয়েছে, হাসি ঠাট্টা গল্প করেছে, এতই ছিল তার সহ্য করার ক্ষমতা।

অবশেষে ১৯ মার্চ বুধবার রাত্রি দুটো চল্লিশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এক অজানা পথের উদ্দেশে চলে গেল। সব শেষ হয়ে গেল।

পরদিন ২০ মার্চ বেলা ৯টায় তার মরদেহ বাড়িতে আনা হল। বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী ইত্যাদি অগণিত লোক এসে ফুলের মালা দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। ১২টার পর তার মরদেহ হিমঘরে নিয়ে রাখা হল।

২১ মার্চ তাকে রবীন্দ্র সদনে এনে রাখা হল বেলা ৯টায়। সেখানেও অগণিত লোক তার মৃতদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। এই সময় সেখানে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, বহু সাহিত্যিক বন্ধু, বহু অভিনেতা অভিনেত্রী, আত্মীয় স্বজন মালা দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বেলা ১২টার পর তার মৃতদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় ও ইলেকট্রিক চুল্লিতে তার মৃতদেহ দাহ করা হয়।

২৯ মার্চ শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হল। অর্থমন্ত্রী প্রমুখ অনেকে শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে স্মরণ সভায়ও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

পরে ৫ এপ্রিল নন্দনে একটি স্মরণ সভা হয়। সেখানেও অনেক গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, মৃণাল সেন, প্রভৃতি তার ছবিতে মাল্যদান করেন। সাহিত্যিক দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মকার প্রভৃতি অনেকে তার সৃষ্টির বিষয় জানালেন। প্রতিক্ষণের পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব ও স্বপ্না দেব শেষ স্তবক নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে পূর্ণেন্দুর বিষয় অনেক আলোকপাত করেছেন। তাতে আছে উডবার্ন ওয়ার্ডে পূর্ণেন্দু প্রতিদিন একটি করে ছবি এঁকে হাসপাতালের অধ্যক্ষ বিধান সান্যালকে উপহার দিতেন। তার ছবির কয়েকটি ছিল, আর প্রতিক্ষণ থেকে তার যে সব বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিকা। আর রোগ শয্যায় যে কবিতাগুলি লিখেছিল

সেই সব কবিতাগুলি, আর প্রতিদিন ও দে'জ পাবলিশিং শ্রদ্ধাগুলি জানিয়েছিল, তার সব বন্ধুরা তার সঙ্গে কিভাবে তার জীবন যাত্রা কেটেছে—এই সব নিয়ে, জনে জনে।

পূর্ণেন্দু এক গ্রাম্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিল। দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর আপনার প্রচেষ্টায় ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল। সে যে এত বড হয়ে উঠেছিল তা আমি জানতে পারিনি। আর স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে এত বড় হবে। যখন জানলাম তখন সে আর ইহলোকে নাই।

শিল্পীর, কবির মরণ নাই। তারা চির অমর তাদের সাহিত্যে কবিতায়, চিত্রে আর শিল্পকর্মে। পুত্র তুমি বহু পরিশ্রম করেছ তুমি ক্লান্ত। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই বিশ্বপিতা তাঁর প্রিয় সন্তানকে বিশ্রামের জন্য নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। যদিও আমরা শোকগ্রস্ত তবুও তোমার গৌরবে আমরা গর্বিত। গৌরবান্বিত। অশ্রুজল শান্তিজলে রূপান্তরিত।

সঙ্গ নিঃসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী
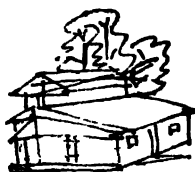
সোমনাথ ঘোষ

১৯৭৭ সাল। আনন্দবাজারে প্রথম দেখা পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে। সিনেমার প্রচারের কাজ করাতে গিয়েছিলাম। আসল উদ্দেশ্য পূর্ণেন্দু পত্রী নামক এক ব্যক্তিকে সামনাসামনি দেখা, কথা বলা। কাজের দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলাম যেচে। তখন তাঁর বেশকিছু কবিতা পড়া হয়ে গেছে, তাঁর তৈরি সিনেমা আর অসাধারণ সব বই-এর প্রচ্ছদ দেখে মনে মনে তাঁকেই গুরু মেনে নিয়েছি। তাঁকে দেখার, আলাপ করার জন্য উৎসুক হয়ে ছিলাম।

প্রথমদিন সিনেমার প্রচার সচিবের অনুরোধ পৌঁছে দিয়েছিলাম। তার দুদিন পর যখন গেছি আমায় দেখেই মাথা নিচু করে কাজ করতে করতে বলে-ছিলেন "সামনের চেয়ারে বসতে পার। কি কর?" বললাম "ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে পড়ি।" কিছুক্ষণ পরে বললেন "কলেজটা এখনও খোলা আছে?" কোন উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন "ওই কলেজে কিছু হবে না। সময় নষ্ট। অন্য রাস্তা দেখ। সিনেমা লাইনে বেয়ারার কাজ কর কেন? নিজে ডিজাইন করতে পারনা?" এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু থামলেন। একটু পরে চা এল ওঁর কাছে। বললেন "চা খাবে?" উত্তর দেওয়ার আগেই চা-এর ছেলেটিকে বললেন আমায় চা দিতে। আর আমায় বললেন "চা খেয়ে চলে যাও। দু-তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন পরে এস।" কয়েকদিন পরে ফোন করে কাজটা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়াতে উচ্চস্বরে বললেন "কবে কাজটা হয়ে গেছে। তোমাদের নেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। henceforth আমার কাছে কোন কাজ আনবে না।" কিছুক্ষণ পরে আনন্দ-বাজারে ওঁর ঘরের সামনে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াতেই নরম সুরে "আয় আয় বোস। তোর জন্যে কখন থেকে বসে আছি। চা খাবি? এই ওকে চা দে। কতদূর থেকে আসছে। তারপর তোর কলেজ কেমন চলছে?" আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। এমন খোসমেজাজ এ-কদিন একবারও দেখিনি। কিছুক্ষণ আগেই ফোনে আমাকে 'এ যুগের ছেলে' 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ইত্যাদি বলে ধমকেছেন এবং আজ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে 'তুই' করে কথা বলছেন। আর চা-এর ছেলেটি ধারে কাছে ছিল না, অথচ চা দেওয়ার হুকুম করলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর চা এল। তাকে বললেন "ইনি এখানে দুতিন ঘণ্টা থাকবেন। এঁকে মাঝে মাঝে চা দিয়ে যাবি।" তারপর আবার আমাকে বললেন "বোস। হাতে সময় আছে তো? কাজটা করতে হবে এখন। তুই থাকলে সুবিধা। আমাকে একটু সাহায্য করবি। দুজনে মিলে কাজটা করব। তোরও কিছু হবে। বেয়ারা হয়ে থাকলে হবে?

কিছু পয়সাও তো দরকার।" ওঁর পারিশ্রমিক থেকে কিছু টাকা আমাকে দিয়েছিলেন। আর সেদিনের সেই সম্পর্ক—ধমক দেওয়া, বকা, আবার স্নেহ, শেষদিন পর্যন্ত ছিল। এইভাবেই পূর্ণেন্দু পত্রী আমাব পূর্ণেন্দুদা হয়েগেছেন। তার শুরুটা এবকম ছিল।

তারপর থেকে মাঝে মধ্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন। বই-এর প্রচ্ছদ করবেন—তার art work করে দেওয়া, সিনেমার poster design করবেন, তার আর্ট বোর্ড এনে দেওয়া, ছবি print করে আনা। 'মালঞ্চ' সিনেমা করবেন তার জন্য টাকা তুলতে হবে। একেকদিন কোন কাজ নেই। কলকাতা নিয়ে কাজ করছেন, তার কি কি ছবি যোগাড করেছেন সেসব গল্প করার জন্যও ডেকে এনেছেন। সেই সময় আলাপ করিয়ে দিয়েছেন ওঁর কাকাবাবু নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে। তিনিও আমার পিতৃতুল্য। কেন জানিনা আমি তাঁকেও নিকুঞ্জদা বলে ডাকতাম। পূর্ণেন্দুদা বলতেন "আমাকেও দাদা বলিস, কাকাবাবুকেও দাদা বলিস—তুই একটা জ্যাঠা ছেলে।" পূর্ণেন্দু পত্রীর বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের পিছনে সবচেয়ে বড অবদান এই নিকুঞ্জদার।

নিকুঞ্জদা আমায় কিছু কিছু কাজ দিতেন। কখনও কখনও পারিশ্রমিক আগেই দিয়ে দিতেন। এমন মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। ওঁর ঝাঁকাভর্তি ব্লক নিয়ে মুটে চম্পট দিল। তারপরেই ওঁর সঙ্গে দেখা হতেই ঘটনাটা বললেন। আক্ষেপ করলেন, যাঁদের আজ ব্লক দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের দিতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করলেন। কথার খেলাপ করতেন না। আগের দিনের মানুষ তো। ওঁর দেওয়া পারিশ্রমিক আমার বেকার জীবনে অনেক কাজে লেগেছিল। পরে জেনেছি পূর্ণেন্দুদা নিকুঞ্জদাকে বলেছিলেন কোথাও কিছু কাজ থাকলে আমায় দিতে। 'চিত্রিতা' নামে নিকুঞ্জদার একটা পত্রিকা ছিল। একবার পুজো সংখ্যার প্রচ্ছদ আমায় করতে বললেন। আমি তো হতবাক। যেখানে ভাইপো অতবড শিল্পী। উনিই প্রতিবছর প্রচ্ছদ করেন। সেখানে আমি কি করে করি। সেকথা ওঁকে বলাতে উনি বললেন "পূর্ণেন্দু এখন অনেক বড শিল্পী। আমার ছোট কাগজ। ছোট শিল্পী দিয়েই হবে। ওর এখন অনেক দর। তুই করলে কম পয়সায় হবে।" সে প্রচ্ছদ আমি করে দিয়েছিলাম। তার পারিশ্রমিক নিতে আপত্তি করায় বলেছিলেন, "পুজোর আগে কিছু টাকা হাতে থাকা ভাল। নাহলে সিগারেট খাবে কার পয়সায়?" সেই প্রচ্ছদ করার পর পূর্ণেন্দুদা বলেছিলেন। "চিত্রিতার প্রচ্ছদ তুই করেছিস—ঠিক আছে। ওটা পত্রীবাডির কাগজ। কাকাবাবুকে বলিস ওটা যেন আজেবাজে লোককে দিয়ে না করান।"

এইভাবে ক্রমশঃ তাঁর ভালবাসা স্নেহ পেয়েছি। কখন রেগে ওঠেন আবার কখন হাসতে হাসতে মজার সব কথা বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। কিন্তু সবসময় নানা রকম কাজ করতেন, কাজের কথা ভাবতেন। নানা পরিকল্পনা মাথায়

ঘুরত। কতটা বাস্তবে রূপ পাবে সে নিয়ে সবসময় ভাবতেন না। হঠাৎ অন্যদের সামনে চেঁচিয়ে ওঠা ওঁর স্বভাব ছিল। একেকসময় বেশ দৃষ্টিকটু লাগত। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আপনার High না Low pressure ?" উত্তরে বলেছিলেন "লোক বুঝে। তবে সবাইকে বলিস না।"

'বারবধূ' সিনেমার poster হবে। ওঁকে design করতে বলা হল। উনি প্রচার সচিব স্বপন ঘোষকে বললেন "সোমনাথ যদি সাহায্য করে তাহলে হবে, না হলে নয়।" তারপর ওঁর কথামত বাঙুর এভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। কিছুটা কাজ হওয়ার পর পাশে বসিয়ে দুপুরের খাওয়া। বৌদিকে বললেন "উমা সোমনাথকে ভাল করে খাওয়াও"। পরে যখন ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে গেছি সপরিবারে তখনও একই রকম আদর আপ্যায়ণ। আর কাজের জায়গায় যখন তখন যা ইচ্ছে তাই বলতেন।

Film publicity-র কাজ করি। দিল্লীতে International Film Festival হচ্ছে। আমি, ডাক্তার অখিল বাগচী, স্বপন কুমার ঘোষ দিল্লীতে। পূর্ণেন্দুদাও দিল্লী গেছেন। একদিন সন্ধ্যায় Oberoi Hotel-এ ধীরেশ চক্রবর্তী সবাইকে ডাকলেন! তপন সিন্‌হা ছিলেন। সকলে একসঙ্গে মদ্যপান এবং আড্ডা। যথারীতি পূর্ণেন্দুদা বক্তার ভূমিকায়। নানা কথায় জমিয়ে রেখেছিলেন। তপন সিনহার 'এক যে ছিল দেশ' সিনেমার poster পূর্ণেন্দুদা করেছিলেন বেশ কিছুটা পান করার পর পূর্ণেন্দুদা তপন সিন্‌হাকে বললেন, "আপনার এক যে ছিল দেশ-এর posterটা কিন্তু সিনেমার থেকে অনেক ভাল হয়েছিল"। আমরা তো সবাই চুপ। তপনদার মত ওইরকম একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে ওইভাবে বলা। হঠাৎই পূর্ণেন্দুদা গান ধরলেন 'তোমরা যা বল তাই বল'। সেদিন রাতে ফেরার সময় জানুয়ারী মাসের দিল্লীর শীতের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গলা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছিলেন। পুলিশ আমাদের রাস্তায় আটকেছিল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আরও দুলাইন গান গেয়ে বলেছিলেন, "আমি পূর্ণেন্দু পত্রী"।

সিনেমার কাজ চলছে জোর কদমে। 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'আকালের সন্ধানে' তো ওঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। 'আলবার্ট পিণ্টো'র কিছু কাজ এবং Letteringটা ওঁর করা।

তার বেশ কিছু দিন পর একদিন 'প্রতিক্ষণ'-এর লেটারিং এবং প্রতিক্ষণ এর বিখ্যাত Logo 'একটি কলম তার মধ্যে একটি চোখ' দিয়ে finish করে দিতে বললেন। সেটা হয়ে গেলে প্রতিক্ষণ অফিসে নিয়ে গিয়ে স্বপ্নাদি প্রিয়ব্রতদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ও চাকরির ব্যবস্থা করলেন। একই সময় কিন্নর রায়, অতনু বসুও প্রতিক্ষণ-এ যোগ দিয়েছিল ওঁর সহযোগিতায়। তখনও উনি আনন্দবাজারে। রোজ সন্ধ্যার আসতেন প্রতিক্ষণ অফিসে। পরের দিনের কাজ বুঝিয়ে দিতেন। পরের দিকে উনি আনন্দবাজার ছেড়ে প্রতিক্ষণ-এ পুরো

সময়ের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। তখন প্রতিক্ষণ-এ কিন্নর, অতনু, সুব্রত চৌধুরী, পুণ্যব্রত, মিলন সবাই মিলে ওঁর কথায় কখনও 'জমজমাট Team' কখনও 'চ্যাঙড়ার দল।' সবসময় কিছু একটা করার চেষ্টা ছিল তাঁর। নানারকম কাজ করতে ভালবাসতেন। কলকাতা শহর খুব প্রিয় ছিল। এই শহরের সব'কিছু সম্পর্কে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। অনেক লেখা তিনি লিখেছেন কলকাতা নিয়ে। তাঁর সংগ্রহে কতরকমের বই ছবি তথ্য ছিল যে তার শেষ নেই।

কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে একটা মেলা হয়েছিল। সেখানে প্রদর্শনীর থীম প্যাভিলিয়নের দায়িত্বে প্রভাস সেন ও বিজন চৌধুরীর সঙ্গে তিনিও ছিলেন। তাঁর সংগ্রহের প্রায় সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন।

পুরান কলকাতার নানারকম ছবি, তথ্য টমাস ড্যানিয়েল ভাইদের ছবি, টমাস হিকি, ল্যামবার্ট ভাইদের ছবির প্রিণ্ট যেমন ছিল আবার পুরান ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, গরাণহাটার ছাপান কাঠ খোদাই, বটতলা প্রকাশনীর বই-এর ছবি ছাড়াও নানারকম তথ্য। এই মেলায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় একটি প্যাভিলিয়ান তৈরি হয়েছিল। বিষয় 'বাবু কালচার'। পূর্ণেন্দুদার খুব প্রিয় বিষয়। তাঁর অনেক লেখায় এই বাবু কালচার বহুভাবে এসেছে। তাঁর সঙ্গে আড্ডায় বসলে বাবু কালচারের প্রসঙ্গ প্রায় সবসময়ই ঘুরেফিরে আসত। সেই প্যাভিলিয়ান সম্পূর্ণ তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত। বাবু কালচারের ইতিহাস, তার ছবি পূর্ণেন্দুদার হাতে এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। প্রতিদিন কতশত লোক ঐ প্যাভিলিয়ানে ঢুকে আর বেরতে চাইত না। সেই লেখা পড়ে আর ছবি দেখে যেন শেষ হয় না। যাঁরা দেখেছেন তারা জানবেন সেই উৎসাহী কৌতূহলী জনতার ভীড় সেই বাবুকালচার প্যাভিলিয়ানে। কত রাত পর্যন্ত বেশ কয়েকদিন পরিশ্রম করেছিলেন। আমরা বারণ করলে বলতেন "ওরে এ আমার মেয়ের বিয়ে। আমাকেই সব দেখতে হবে। সাজাতে হবে। কলকাতার বাবু কালচার-এর তোরা কি বুঝিস? মূর্খ, অশিক্ষিত।"

ওঁর বকার ধরনই ছিল এরকম। কলকাতার সব কিছুকেই ভীষণ ভালবাসতেন। ওঁর কাছে শুনেছি সেনেট হল ভাঙার সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। ভাঙার প্রতিটি পর্বের প্রচুর ছবি তুলেছিলেন। এবং আমার দৃঢ় ধারণা কোন পেশাদার আলোকচিত্রী অত ছবি তোলেননি। বেশিরভাগ আলোকচিত্রী শুধুমাত্র order-এ ছবি তোলেন। বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন কজন? সেনেট হলের সমস্ত Negetive আমাকে দিয়ে পরিষ্কার করে নতুন খামে গুছিয়ে দিতে বলেছিলেন। সেই সুবাদে আমারও সব দেখা হয়েছিল। উনি কখনই সেই অর্থে photographer ছিলেন না। কিন্তু ওঁর সেনেট হলের ছবি শুধু মাত্র বাড়ি ভাঙার ছবি ছিলনা। তাঁর ছবিতে পরিবেশ প্রকৃতি, জমি ও আকাশ ব্যবহারের পরিমাপ সবই খুব

নিখুঁত। কতটা মমত্ববোধ, হৃদয়ের আবেগ ভালবাসা সব মিলেমিশে ঐ ছবি উঠেছিল। শুধুমাত্র ক্যামেরা লেন্স বা ফিল্ম নয়। আয়ত্ত সব শিল্প কর্মের মত মস্তিষ্ক ও বোধকেও কাজে লাগাতে হয় ছবি তুলতে গেলে, যা এখন প্রায় দেখাই যায় না। প্রতিক্ষণে থাকাকালীন দেখেছি খুব ভালবাসতেন নিজের ছবি তোলাতে। মজা করে বলতেন, "আমার ছবি তুলে রাখ। আখেরে লাভ তোরই। সবাই তোর কাছে পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি চাইতে আসবে। যদিও পয়সা পাবিনা।" সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আড্ডা মারতেন খুব। একদিন বলছিলেন "আপনি তো দুটো সেনেট হলের থাম কিনে নিয়ে গেছেন জনাইতে। আমায় একটা দিয়ে দিন, সল্টলেকের বাড়ির সামনে লাগাব"। জবাবে সদারসিক সুভো ঠাকুর বললেন "আপনি তো মশাই সবগুলো থাম তুলে নিয়ে গেছেন বিনি পয়সায়।"

'তুলে' অর্থাৎ photo তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা উনি বললেন।

কলকাতায় একবার hotel Hiudusthan-এ calligraphy exhibition হয়েছিল। উদ্যোক্তা সম্ভবতঃ বম্বের Chimanlal Co. চিমনলালের পক্ষ থেকে ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার আর. কে. যোশী আর কলকাতা থেকে সত্যজিৎ রায় এবং পূর্ণেন্দু পত্রী। ক্যালিগ্রাফ এবং ক্যালিগ্রাফির আধিক্য আছে এমন সব কাজ দিয়ে সাজান হয়েছিল সে প্রদর্শনী। চিমনলালের stationery ও বিক্রি হচ্ছিল কিছু। কিন্তু মূল আকর্ষণ ছিলেন ঐ ক্যালিগ্রাফার ত্রয়ী। রোজই সবসময় R. K. Joshi কাজ করছিলেন। সত্যজিৎ রায় এলে সবসময়ই R. K. Joshi ওঁর হাতে নানান ধরনের সরু মোটা চ্যাপ্টা নিবের কলম এবং তুলি এগিয়ে দিতেন। মাটিতে বড় কাগজ, বোর্ড পাতা থাকত। পাশে বড় কালির দোয়াত। মুহূর্তে সাদা কাগজে ফুটে উঠত নানা ধরনের হরফ। কি তার বাহার! ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। প্রদর্শনী হলে ঢুকেই ডানদিকে টাঙান ছিল বিশাল আকারের 'দেবী' সিনেমার নামাঙ্কন। যা বাংলা ক্যালিগ্রাফির সর্বকালের সেরা কাজের একটি। পূর্ণেন্দুদার ক্যালিগ্রাফি অসম্ভব উঁচু মানের ছিল। ওটা নিয়ে সবসময় ভাবতেন। ক্যালিগ্রাফি ওঁর সহজাত প্রতিভা। একদিন কাজ করতে করতে বললেন, জানিস ক্যালিগ্রাফিতে বো-পেনের ব্যবহারটা আমার সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে শেখা। বাঞ্ছারামের বাগান সিনেমার লেটারিং-এ া-কে গাছের মত করে আঁকা এত সুন্দর হয়েছিল যে তার কিছুদিন পরে কোন একটি রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখনে যেখানেই 'া' আছে সেখানেই ওই ভাবে গাছ আঁকা হয়েছিল। যা খুবই অর্থহীন ছিল। 'বাঞ্ছারামের বাগান' বলে যেমন গাছের ব্যবহার উনি করেছিলেন। তেমনই আবার 'আকালের সন্ধানে'র lettering করতে গিয়ে প্রায় দুদিন সময় লেগেছিল। উনি ভেবেছিলেন হরফগুলোর চেহারা হাড়গোড় দিয়ে করলে যেমন হয় তেমন একটা রূপ দিতে। তা করতে গিয়ে tracing paper এর উপর ওই চেহারার

একটা লিখে উল্টোদিকে কালি মাখিয়ে News print-এর ওপর ছাপ তুলছিলেন তাতে একেক সময় একেক চেহারা দাঁড়াচ্ছিল। একটা ে-কার একটা া-কার কেটে আমায় দিচ্ছিলেন। আবার 'ন' এর ছাপ তোলার জন্য গাদা গাদা কাগজে ছাপ তুলছিলেন। শুধুমাত্র 'র' এর ফুটকির জন্য কত ছাপ তুলেছিলেন তার শেষ নেই। এইভাবে পাঁচ ছটা News print-এর pad শেষ হয়ে গেছিল। বহু বই এর প্রচ্ছদ ক্যালিগ্রাফিতে উনি করেছেন। 'উলঙ্গরাজা'তো বাংলা ক্যালিগ্রাফির একটি সেরা বিস্ময়। ওইসময় উনি অনেকগুলো 'উলঙ্গরাজা' লিখেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য অকাদেমি থেকে যখন ইংরেজিতে ওই বইটা বেরিয়েছে তখন অন্য রকম একটা লেটারিং উনি দিয়েছিলেন। খুবই ভালবাসতেন বলে আমাকে অনেকসময়ই ডাকতেন lettering করার সময়। কাজ করতে করতে বলতেন "এই জন্য এই হরফটা এরকম করলাম। এটার সঙ্গে এরকম এ-কার যায় না" ইত্যাদি। অনেককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, বলতেন, সোমনাথকে দিয়ে তোমাদের প্রচ্ছদ করিয়ে নাও। সামনে সবসময় ব্যানার painter, সাইনবোর্ড painter বললেও অন্যের কাছে প্রশংসা করতেন আমার কাজের।

একবার আনন্দবাজারে বসে ওঁর একটা কবিতার বই এর proof দেখছেন। বাঁদিকে পাণ্ডুলিপি ডানদিকে কম্পোজ করা কাগজ। কম্পোজের ওপর লাল কালি দিয়ে কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ বললেন এরকম যদি ছাপা যেত। বাঁদিকের পাতায় পাণ্ডুলিপি ডানদিকের পাতায় একই রকম কাটাকুটি সহ কম্পোজ করা। তাব বেশ কিছু দিন পর এজরা পাউণ্ড সম্পাদিত টি. এস. এলিয়ট ফ্যাক্সিমিলি এডিশন তিনি কিনেছিলেন। সেটা দেখে ওঁর খুব আনন্দ। বললেন, "দেখ সাহেবদের আগে আমরা ভেবেছি"। প্রতিক্ষণ-এ 'রূপসী বাংলা' তে তাঁর ওই ভাবনাকে আরও সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একবার তপনের কাছ থেকে 'Evergreen lives'-এর খুব সুন্দর size-এর বেশ কিছু বই কিনেছিলাম। 'বিটোভেন', 'ভ্যানগখ', 'কার্লমার্ক্স', 'মোৎজার্ট' ইত্যাদি। সেই বইগুলো ওঁরও চাই। তপনের কাছ থেকে এনে দিলাম। আবার মাথার মধ্যে পরিকল্পনা। প্রতিক্ষণ থেকে বেবোল ঐরকম পকেট বুক size-এর শোভন সুন্দর 'গোলাপ যে নামে ডাকো', 'রবীন্দ্রনাথ না রবীন্দ্রনাথ', 'মোনালিসা', 'সাহিত্যের তাজমহল', 'রে ।ত্মা' আরও কত। এখনও ওই সিরিজের বই প্রতিক্ষণ থেকে বেরয়। এবং খুবই জনপ্রিয় ওই বইগুলো।

সুব্রত চৌধুরীর কাজ খুব পছন্দ করতেন। সবাইকে বলতেন, "ছেলেটা কত ধরনের illustration করতে পারে।" কৃষ্ণেন্দু চাকীর কাজ সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বলতেন "কৃষ্ণেন্দু খুব Major শিল্পী। সহজাত প্রতিভা। কলেজে ঘষে, মিউজিয়ামে বসে এসব হয় না। শিল্প ভেতর থেকে আসে। order দিয়ে সাইন-বোর্ড, ব্যানার ওইসব হয়।" সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের খুব প্রশংসা করতেন।

প্রতিক্ষণ ছেড়ে দেবার পর মাঝে মাঝে দেখা হত। ফোনে কথা হত। চিঠি লিখতেন খুব। অসুস্থ হয়ে পি জি হাসপাতালে থাকার সময় ওঁর ছেলে প্রথম খবর দেয়। আমি আমার স্ত্রী হাসপাতালে যেতেই সেই পরিচিত হাসি। ছেলেরা কেমন আছে। সব কুশল খবর নেওয়া। শরীরে তখন তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা। জানতেন না কি হয়েছে তাঁর। MRI Test করার পর বললেন, "আমি একটা দুমাইল লম্বা pipe এর মত মেশিন বানাব, যার মধ্যে অসুস্থ লোককে একপ্রান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে তার সমস্ত Test হয়ে Treatment হয়ে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে যাবে। তার নাম দেব সা-রে-গা-রে-গা-মা"।

উডবার্ন ওয়ার্ডের ২৩ নং কেবিনে বসে শেষের দিনগুলোয় কত লেখা লিখে যাচ্ছিলেন। ছবিও আঁকছিলেন। প্রথমদিন হাসপাতালে দেখেই বলেছিলেন, "সোমনাথ, অনেক ফাঁকি দিয়েছিস। এবার থেকে যখন আসবি ক্যামেরা নিয়ে আসবি। ছবি তুলে রাখ। আমি বিখ্যাত হ'লে তোরও নাম হবে। বিখ্যাত লোকের ব্যক্তিগত ফোটোগ্রাফার হিসেবে।" ছবি তুলেছিলাম কয়েকদিন। কিন্তু আগের মত ছবি তোলার সেই উৎসাহ ছিল না আমার। একদিন বললেন "জানিস কৃষ্ণেন্দু, সুব্রত এসেছিল আমাকে দেখতে। ভালবাসে আমাকে তাই না?" মানুষজন ভাল বাসতেন। তাই বলতেন—"ভাগ্যিস অসুস্থ হয়েছিলাম, তাই কত লোক আমাকে দেখতে আসে।"

ভোর বেলাকার পাখির ডাক তাঁকে খুব মুগ্ধ করত। বলতেন পাখিরাই নাকি রোগীদের আসল বন্ধু। বইমেলায় আগুন লেগেছিল বলে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বইমেলায় গেলেই বলতেন "বই হয়ে, প্রচ্ছদ হয়ে বাঁচতে চাই।" হাসপাতালে বলেছিলেন—"বারে বারে ওরা বইকে আক্রমণ করেছে, যুগে যুগে, কালে কালে। মানুষকে কিছুতেই শিক্ষিত হতে দেবে না। ওরা মানুষের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে, শিক্ষার বিরুদ্ধে।"

হাসপাতালে সবসময় Tape Recorder-এ সরোদ, সেতার বাজত। সঙ্গীত ওঁর ভেতরে ছিল। সবকিছুকেই একটা symphony-তে রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। কতদিন আগে তাই 'বুকের মধ্যে বড়ে গোলাম' লিখতে পেরেছিলেন। এই ভাবেই ১৯ মার্চ, ১৯৯৭ পূর্ণেন্দুদা চলে গেলেন। ১৬ মার্চ অমিতাভ দাশগুপ্তর একটা লেখা পড়ে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিলেন তাঁর অসুখ সম্বন্ধে। ২০ মার্চ সকালে কাগজে জানতে পারি দুঃসংবাদ। ২১ মার্চ কত লোক রবীন্দ্রসদনে। বরফের ওপর শুয়ে পূর্ণেন্দুদা। কত মানুষ। যারা তাঁকে ভালবাসে। কত লোক তাঁর দ্বারা উপকৃত! অনেক মানুষকে দেখলাম কৃতজ্ঞচিত্তে এসেছে। আবার অনেক একসময়ের কাছের লোককে না হাসপাতালে না রবীন্দ্রসদনে কোথাও দেখলাম না। সবাই যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে তা তো নয়। নিজেকে সেদিন পিতৃহারা ভ্রাতৃহারা বন্ধুহারা নিঃসঙ্গ লাগছিল। শবযাত্রায় অসহায় পদযাত্রা। কেওড়াতলা শ্মশান। মনে মনে অনেক কথা, ক্ষমা চাওয়া, শেষ প্রণাম।

অসাধারণ চিত্র পরিচালক

নিমু ভৌমিক

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় তিরিশ বছরেরও আগে। আমরা তখন 'মুক্তাঙ্গন' নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছি। ১৯৫৭-তে 'শৌভনিকে'র জন্ম হয়। সেই থেকেই আমি শৌভনিকের সঙ্গে জড়িত। তার আগে আই. পি. টি-র সাউথ ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ-এ ছিলাম। ১৯৬০-এ মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠার পব আমাদের কাজ বেড়ে গেল। আমরা তখন পেপারে পেপারে যেতাম। সংশ্লিষ্ট কাগজ তো বটেই খবরের কাগজেও যেতাম। আনন্দবাজাবে গিয়ে আলাপ হল সেবাব্রত গুপ্তর সঙ্গে। উনি তখন 'দেশ' পত্রিকার রঙ্গজগতে লিখতেন। সিনেমাও রিভিউ করতেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন 'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগত'-এর গিরিন সিংহ মশায়। সেবাদা আমাদের অভিনয় জগৎ অর্থাৎ নাটক নিয়ে সিনেমা নিয়ে প্রচুব পডাশোনা করেছেন এবং প্রচুর কাগজে লিখেছেন। তাঁর সমালোচনা সুধীজনের কাছে খুব প্রিয় ছিল। পরে উনি 'আনন্দলোক' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। তা সেই উনিশশ' ষাটে যখন ওঁর কাছে যাওয়া আসা শুরু করি তখনই ওঁর সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মে যায়, পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে যায়। আমাকে খুব ভালবাসতেন। আরো ছিলেন জ্যোতির্ময় বসুরায় ফিল্মের দায়িত্বে। মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে দায়িত্বে ছিলেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী। তো এরই মধ্যে একদিন, কোন্ সালে ঠিক মনে নেই পূর্ণেন্দুদা ওখানে এলেন আর্ট ডাইরেক্টার হয়ে।

তখন আনন্দবাজার পত্রিকার রিসাফ্‌ল হচ্ছে। নতুন করে অফিস সাজান হচ্ছে, অফিস বাড়ছে, তখনই পূর্ণেন্দুদা এলেন। সেবাদা আমাকে নিয়ে গেলেন ওঁব সঙ্গে আলাপ করাতে। সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। তারপর দেখেছি আনন্দবাজার পত্রিকার এডিটর অশোক সরকার মশায়কে, তাঁর ছেলে অভীক সরকার অরূপ সরকারকে—এঁরাও পূর্ণেন্দুদার একেবারে কাছের লোক হয়ে গিয়েছিলেন, কি ঘনিষ্ঠতা ছিল! এত বড় আর্টিস্ট—তিনি তো বড় শিল্পী ছিলেন। কবিতাও লিখতে পারতেন। ফিল্মও করেছেন। তো ওঁর সঙ্গে এমন আলাপ হয়ে গেল যে আমি সেই থেকে অফিস ফেরত ওঁর ঘরেই বসে থাকতাম। বসে থাকতে থাকতে, ভালবাসা বাড়তে বাড়তে আমরা তুই তোকারি করে কথা বলা আরম্ভ করলাম। তখন উনি সম্ভবতঃ বাজুরে থাকতেন। আমি ওঁর বাজুরের বাড়িতে অনেকবার গেছি। তখন আমাদের মধ্যে প্রায় ছোটভাই বড়ভাই সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল।

নানান বিষয়ে আলোচনা হত। সিনেমা তো ছিলই, আমার থিয়েটার, আমি কি করছি, কি ভাবছি, আমাকে নিয়ে ওঁর ছিল গভীর ইনটারেস্ট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান প্রশ্নও করতেন।

হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন উনি 'স্ত্রীর পত্র' ছবি করবেন। আনন্দবাজারে যাঁরা ছিলেন অর্থাৎ সেবাদা, জ্যোতির্ময় বসুরায়, মনুজেন্দ্রবাবু—এঁদের সকলের সঙ্গে উনি শলাপরামর্শ করলেন। উনি ঠিক করলেন মাধবী মুখার্জীকে নিয়েই 'স্ত্রীর পত্র' করবেন। এর আগে তো মাধবীকে নিয়ে 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবি উনি করেছেন। তো আমাকে একদিন বললেন, নিমু তোকে এই রোলটা করতে হবে। এই পাগলা স্বামীর রোল। সেই হল ওঁর সঙ্গে আমার সিনেমা করার সূত্রপাত। বলা যায় বন্ধুত্বের জন্যেই।

একদিন বললেন, বাগনানে আমার বাড়ি, ওখানে গিয়ে আমি টীম খুলব। আর তোর চরিত্রতে একটা গান আছে, ঐ গানটা তোকে নিজেকেই গাইতে হবে। আমি বললাম, সে কি! আমি তো গান জানি না। ও গান-টান তো আমি পারব না। উনি বললেন, তা বললে চলবে না। গান তোকে নিজেকেই গাইতে হবে। গাইতে পারিস না তো কি হয়েছে, তুই রামদার বাড়িতে গিয়ে একটা গান তুলবি।

ঐ ছবির সুরকার ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি বাধ্য হয়ে সেই রামদার বাড়িতে গেছি। গিয়ে গান তুলব। টপ্পা গান।

কিন্তু আমি তো গানের 'গ' জানি না। রামদা টেলিফোনে পূর্ণেন্দুদাকে বললেন, এ তুমি কাকে পাঠিয়েছ?

তো পূর্ণেন্দুদা বললেন, ওকে দিয়ে চরিত্রটা করাব। গানটা ওকে একটু করিয়ে দাও। কিন্তু সুর কখনো হয়?

যাইহোক 'স্ত্রীর পত্র' ছবির শ্যুটিং করতে আমরা চললাম পূর্ণেন্দু পত্রীর দেশের বাড়িতে। স্টেশন থেকে প্রায় ছ-সাত মাইল দূরের গ্রাম। ক্যামেরাম্যান ছিল শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং যাঁরা মহিলা ছিলেন, যেমন সীতাদেবী ছিলেন, মাধবীদি ছিলেন, এঁরা সবাই পূর্ণেন্দুদার বাড়িতে ছিলেন। আর আমরা কোথায় থাকব? আমাদের জন্যে ছিল একটা স্কুলের চালা। সেই স্কুলের চালার নিচে বেঞ্চ পাতা। একদম ঘেরা নেই উপরে শুধু চালা। সেই চালার নিচে বেঞ্চে আমরা শুতাম, ইট মাথায় দিয়ে। বালিশ অত পাবে কোথায়? অত তো পয়সা নেই। বাড়ির উঠানে রান্না হত, আলু চচ্চড়ি, ভাত। পুকুর ছিল। পুকুরে স্নান করতাম। আর মনে পড়ছে, একটা ছোট্ট খড়ের ঘর ছিল। লেভেল থেকে অনেক নিচে। উপরে উঠে নিচে নামতে হয়। সেখানে খড় পেতে, তার উপর চাদর পেতে বিছানা করে আমরা কয়েকদিন শুয়েছি। আমরা মনে করিনি যে আমরা সিনেমা করতে এসেছি। 'আমি সিনেমা আর্টিস্ট' এসব আমরা ভাবতেই পাইনি। চরিত্রগুলোকে উনি এমন ঘরোয়া

করেছিলেন যে সেটা একটা শিখবার মত ব্যাপার। আমরা যেন এসেছি আছি নিজেদের মতই। পরস্পরের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলছি না অভিনয় করছি তা নিজেরাই জানতে পারছি না। যেন অভিনয় ব্যাপারটা কিছুই নয়।

রাত্রিবেলা শ্যুটিং হত। হ্যাজাক লাইট জেলে। এখন কেউ বিশ্বাসই করবে না। হ্যাজাক লাইট ছিল, কাল কাল গোল গোল ডে-লাইট ছিল—ঐ লাইটে রাত্রে শ্যুটিং করেছি স্ত্রীর পত্র ছবির। তখন জেনারেটর ছিল না, সেখানে ইলেট্রিক সাপ্লাই লাইন তো ছিলই না। তখন মানে ঐ একাত্তর-বাহাত্তর সালের কথা বলছি। তখন আমার সন্ত বিয়ে হয়েছে। মালদায়।

পূর্ণেন্দুদা আমার বিয়েতে মালদা গিয়েছিলেন। বরযাত্রী। আমার বিয়ে, মানে সত্তর সালের কথা। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অনেকেই গিয়েছিলেন। সেবাব্রত গুপ্ত, রবীন বোস অর্থাৎ রবি বসু, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় গায়ক, হেমন্তদার মত গলা ছিল, হেমন্তদার গান বেশি গাইত, এঁরা তো ছিলেনই, এঁদের সঙ্গে ছিলেন ফটোগ্রাফাব তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার, উনিও বহু পুরান বন্ধু। একটা ফটো তারাপদরই তোলা পুরান এ্যালবাম থেকে খুঁজে পেয়েছি, যাতে পূর্ণেন্দুদা এক কোণে বসে আছেন অন্যদের সঙ্গে।

ওখানে অর্থাৎ মালদাতেই একটা ছোট মত মেয়েকে পূর্ণেন্দুদার পছন্দ হয়ে যায় স্ত্রীর পত্রে ঐ মেয়েটার চরিত্রে, আমি যার স্বামীর ভূমিকায় ছিলাম। তো ওরা বলল, আমরা সিনেমা করব না। অর্থাৎ বলতে চাইছি সত্তরেই পূর্ণেন্দুদা স্ত্রীর পত্রের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ঐ চরিত্রটায় রাজেশ্বরী অভিনয় করেছিল। আমি তখন বিশ্বরূপায় 'বেগম মেরি বিশ্বাস' নাটকে অভিনয় করছি। আমার তখন ইচ্ছে হয়েছিল প্রফেশনাল স্টেজে অভিনয় করার। তখন তো প্রফেশনাল স্টেজ রমরম করে চলছে। প্রফেশনাল স্টেজ কেমন হয় একবার দেখি, এই ভেবে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'-এ আমি জয়েন করেছিলাম। পূর্ণেন্দুদা দেখতে গিয়েছিলেন। আমি ওয়াটসের ভূমিকায় অভিনয় করতাম। তখন রাসবিহারী সরকার বলেছিলেন, গ্রুপ থিয়েটারের সব ভাল ভাল অভিনেতাকে ধরে আনতে। যেমন আমাকে নিল, সৌমিত্রকে নিয়ে গেল, রঙমহল থেকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নিল, তারপর সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চ্যাটার্জীকে নিল, অনুপকুমারকে নিল, তরুণকুমারও ছিল, বইটা খুব ভালই হয়েছিল। কিন্তু তখন নকশাল মুভমেণ্ট শুরু হওয়ায় নাটকের শো মার খেল। তো এসব কথা এখন থাক। যা বলছিলাম, সেই পূর্ণেন্দুদার ফিল্ম শ্যুটিংয়ের কথা। সেই হ্যাজাক লাইট ডে-লাইট-এ শ্যুটিংয়ের কথা। মনে হয়নি যে আমরা সিনেমা করছি। অভিনয়ের ব্যাপারেও কোন গাইড করতেন না, আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তুই এই চরিত্রটি কর—ব্যাস। খুব কম পরিচালক আছেন এভাবে অভিনেতাকে ছেড়ে দেন। উনি আমাকে প্রথম দেখলাম ছেড়ে দিলেন। তুমি তোমার মত করে কর। তাতে আমি যে অভিনয়টা করেছি, একদম

'লার্নেড' হয়েছে।

আমার সেই গানের দৃশ্যটার শ্যুটিং হয়েছিল রাম চাটার্জীর বাড়িতেই। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বৌকে আমি প্রথম বিয়ের রাতে গান শোনাচ্ছি, যে রাতে আমার বৌ পালিয়ে গেল। গানটা ছিল, 'কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ' —এই গানটা উনি কিছুতেই আমাকে দিয়ে তোলাতে পারছিলেন না। কারণ আমার গলায় সুর নেই, উনি তোলাবেন কি ভাবে? তাহলেও শ্যুটিং হচ্ছে। জানালার শিক ধরে আমি গাইছি। উনি ক্যামেরার পিছনে, ওখানে রামদা বসে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন, আর আমি গান গাইছি। ওভাবে উনি লাস্ট চেষ্টা করেছেন আমাকে সুরে আনতে। তাই হয়ত কিছুটা সুর হয়েছে।

এছাড়া হাঁড়ি ভাঙার গান আছে। পাগলার বৌ চলে গেছে, আমি হাঁড়ি ভাঙছি। এটাও রামদার বাড়িতে হয়েছে। এক জায়গায় আছে বৌ চলে গেছে, আমি গাছ থেকে একটা পাতা তুলে নিলাম, কিংবা গাছে উঠে গেলাম, এই সব। উনি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি তোমার মত করে যাও ক্যামেরা follow করবে, not you will follow the camera. বলেছিলেন, এর বেশি আলো যাবে না, এরপর ক্যামেরা যাবে না, এর মধ্যে তুই যা খুশি কর। তাই বলতে পারি normal acting কি করে করতে হয় সেটা আমি ওঁর কাছে শিখেছি। আমার জীবনে এটা গেঁথে আছে। আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

বইটা হয়ে গেল: প্রেসিডেন্টের অ্যাওয়ার্ড পেলেন। তখন তো চারদিকে এত পুরস্কার ছিল না। এখানে একটাই ছিল, BFJ. এখন তো কত পুরস্কার বেরিয়েছে। তখন পাড়ায় পাড়ায় ওঁকে সম্বর্ধনা দিত। আমরা যেতাম, এবং তিনি সম্বর্ধনার উত্তরটা কবিতায় দিতেন। কত সুন্দর কবিতা লিখতেন। কবিতার বই বেরিয়েছে। প্রচুর বই লিখেছেন। আমাকে কত বই উপহার দিয়েছেন। নানা সময় নানান বিশেষণ দিতেন আমার নামের আগে। যেমন 'দুষ্টু নিমু'—এইরকম। আমার কাছে পূর্ণেন্দুদার অনেক বই ছিল। সেসব বই অনেকেই চুরি করে নিয়ে গেছে, মানে নিয়ে চলে গেছে। আমাকে বলে নেয়নি। ফলে পূর্ণেন্দুদা আমাকে যেসব বিশেষণ দিয়েছিলেন সেগুলোও গেছে। তা আমি তখন ভাবতাম যে, এই লোকটা শুধু শিল্পী নয়, মানুষ। মানে মনের কথা উনি আগে থেকে জেনে নিতেন। আমার মনের মধ্যে কি ছিল উনি আগেই ধরে নিতেন। ওঁর গল্পের মধ্যে এত witty ছিল যে, মানুষকে মুগ্ধ করে দিতেন। এবং কোন সময় ওঁর মুখে কোন slang use হত না, কোন সময় কারো খারাপ কিছু করতেন না, কোন রকম খারাপ ব্যবহারও করতেন না।

যাইহোক এবার তিনি আরম্ভ করলেন 'ছেঁড়া তমসুক'। বললেন নিমুকে হিরোর পার্ট দেব না। আমি নিমুকে তৈরি করব। একদিন বললেন, তোকে opposite roll দেব, তোকে দিয়ে ভিলেন করাব। আমি তো অবাক, বললাম, আমি ভিলেন

পারব ? উনি বললেন, কেন পারবি না ? দেখ পারিস কি না। তখন উনি আমার format তৈরি করলেন। আমার চুল কতখানি হবে, আমার গোঁফ কতখানি হবে, আমার জুলফি কতখানি হবে, এই সব বলে বলে তিনি তৈরি করলেন। মেক-আপ ম্যান গোপাল হালদার নামে ছিলেন, বর্তমানে মারা গেছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমার format চূড়ান্ত হল। এই ঘাড় পর্যন্ত চুল, এই জুলফি, এই গোঁফ— এই সব আমাকে রাখতে হল। চার-পাঁচ মাস ধরে রেখেছি। তখন তো আমাকে অনেক জায়গায় শ্যুটিং করতে হত। এ বলছে ও বলছে শ্যুটিং করার জন্য, কিন্তু তাদেরকে বলতে হচ্ছে, না না, করতে পারব না। পূর্ণেন্দুদা বলছেন, করতে পারবে না। আমার তৈরি পোর্ট্রেট অন্য জায়গায় allow করব না। আমি যে চরিত্রটা অর্থাৎ ক্যারেকটারটা তৈরি করছি তোমার চেহারার মধ্যে, সে চরিত্র অন্য কাউকে দেব না। তুমি এখন কোন ছবি করতে পারবে না। এই ছবি হলে দেখো তুমি কোথায় চলে যাবে। যাইহোক উনি আমাকে অন্য জায়গায় allow করলেন না।

এবার। 'ছেঁড়া তমসুক'-এর শ্যুটিং হচ্ছে। তখন বিপ্লব কাজ করেছিল। রঞ্জিত মল্লিক, শ্যামল সেন—এরা সব কাজ করেছিল। হিরোয়িন ছিল আমাদের সুমিত্রা। ওকে আমরা হাসি বলেই ডাকি। আমাদের শ্যুটিং হচ্ছিল বীরভূমে, সেখানে বোলপুরের টুরিস্ট লজে আমরা আছি। পাঁচ-ছটা গাড়ির কনভয় যেত আমাদের। আমরা বোলপুর থেকে সিউড়ি যেতাম, সিউড়িতে থেকে কাজ করতাম। রেল লাইনের ব্যাপার ছিল। রোজ ভোর পাঁচটায় কনভয় স্টার্ট করত। ফিরতাম রাত্রিবেলা। রাত এগারটা-বারটা বেজে যেত। আবার ভোর পাঁচটায় বেরতে হত। প্রায় সকলেই একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে ড্রেস করে শ্যুটিংয়ে চলে যেতাম। আমি আর হাসি একটা গাড়িতে যেতাম, কোন কোন দিন রঞ্জিতের গাড়িতেও যেতাম। তবে আমি পূর্ণেন্দুদার বহুদিনের পরিচিত বলে, কিংবা আমাকে খুব ভালবাসতেন বলে আমাকে বলতেন, হাসির সঙ্গে থাকবি। হাসি আমাদের খুব স্নেহের পাত্রী ছিল। সেবাদা ওকে ঠিক করে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার হল। ভোরবেলা, প্রায় পাঁচটা, যে সময় আমরা যাই সেই সময় প্রথমে পূর্ণেন্দুদার ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে সব আর্টিস্টরা বসে আছে। হাসি আছে, বিপ্লব আছে, শ্যামল আছে, রঞ্জিত আছে। হঠাৎ আমাকে কি ভাষায় গালাগালি করল, ভাবতে পারবেন না। আমাকে বলছেন, আমি তোমার জন্য কতক্ষণ wait করছি। প্রচণ্ড ভাষায় গালাগালি। Get out! তুমি আমার বাড়িতে থাকবে না। যাও! আমি তোমাকে চাই না। আমি কখন থেকে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তুমি আসনি। আমি বললাম, কখন আপনি ডাকলেন ? আপনি বললেন, এই সময় আসবে। আমি এই সময় উঠে আসলাম।

উনি বললেন, ওরা অনেকক্ষণ এসেছে। আবার প্রচণ্ড গালাগালি।

তারপর, চল সব, বলে সবাইকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। আমি অন্যান্য দিন যেমন হাসির গাড়িতে যাই তেমন উঠতে যাচ্ছি, কিন্তু পূর্ণেন্দুদা আমাকে ধমকালেন, ব্যঙ্গ করলেন, আর্টিস্ট হয়েছে, হিরোয়িনের গাড়িতে উঠবে! তুমি কি হিরো, যে হিরোয়িনের গাড়িতে উঠছ? না না, অন্য গাড়িতে যাও, যাও last গাড়িতে গিয়ে বস। অপমানে লজ্জায় আমার তো চোখ-কান-মুখ জ্বলে যাচ্ছে। পূর্ণেন্দুদার হল কি! আমি ভেবে পাচ্ছি না, যে আমার অপরাধটাই বা কি হল? তবে নিজের অজান্তে অন্যায়, ভীষণ অন্যায় কিছু আমি হয়ত করে ফেলেছি এটা ততক্ষণে বুঝতে পারছি। কারণ শুধু যে পূর্ণেন্দুদা আমাকে গালাগালি করছেন তাই নয়, অন্য আর্টিস্টরাও আমার সঙ্গে কেউ কোন কথা বলছে না। কি ব্যাপারটা হল কিছু বুঝতে পারছি না। অগত্যা চললাম, পিছনের গাড়িতে। আমার গাড়িতে কেউ নেই, কথা বলার কোন লোক নেই।

স্পটে গিয়ে শ্যুটিং শুরু হল। একটা রেল লাইনের ধারে। একটা বিরাট বটগাছ আছে। সিউড়ি থেকে কিছু দূরে। রেল লাইনের পাথর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। আমাকে ঐরকম পাথর ছড়ান জায়গায়, এলোমেলো একটা বাগানমত জায়গায় বসতে দিলেন। আমাকে বললেন, তোমার এখন শ্যুটিং হবে না। এখানে বসে থাক। মানসিক যন্ত্রণায় আমি তখন কাতর। যে পূর্ণেন্দুদা আমাকে অত ভালবাসেন তিনি কেন আমার সঙ্গে এমন, শুধু তিনিই নন, গোটা ইউনিটটাই আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে, কেন? যে পূর্ণেন্দুদা আমার পেছনে লাগেন, আমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেন সেই পূর্ণেন্দুদা আমাকে বলছেন, এখানে চুপ করে বসে থাক। আমার অপরাধটা কি? সেদিন তখন আমার মনের অবস্থা কি যে হয়েছিল কেউ বুঝবে না। ওদিকে শ্যুটিং হচ্ছে। আমার অংশ বাদ দিয়ে দিয়ে হচ্ছে, আমাকে বসিয়ে রেখে সব কাজ হচ্ছে। লাঞ্চ ব্রেক হল। যার আমাকে না নিলে চলেই না, প্রত্যেকটা কাজে আমি যাকে সাহায্য করি সেই পূর্ণেন্দুদা আমার কাছে আসছেনই না। দূরে চলে গেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ একজন একটা খাবারের প্যাকেট দিয়ে গেল। বললাম, কে দিল। সে বলল, পূর্ণেন্দুদা দিয়েছেন। বলেছেন, এটা খেয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে।

সূর্য ডোবেডোবে। দিন শেষ হতে চলল। সেদিনের মত শ্যুটিংও প্রায় শেষ। নিজের মধ্যে নিজের অপরাধ কোথায় খুঁজতে খুঁজতে, পূর্ণেন্দুদার ঐ চরম অপমানজনক ব্যবহারের কারণ খুঁজতে খুঁজতে, গোটা ইউনিটের বন্ধুবান্ধবের ব্যবহারের কারণ খুঁজতে খুঁজতে মনের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হতে হতে আমিও তখন শেষ হয়ে গেছি। আমার শরীরে তখন আর কোন শক্তি নেই। ভাবছি এখানে আর বোধহয় কোন সম্পর্ক থাকবে না। এমন সময় পূর্ণেন্দুদা এলেন। তখনও তেমনি ব্যবহার। বললেন, তোকে যখন এনেছি, তখন আর তোর শ্যুটিংটা করে নিই। আমার একদম শক্তি নেই, ইচ্ছে নেই, আমার কান্না পাচ্ছে। তবুও

বললাম, কোথায় যাব। বললেন, রেল লাইনের ওপর যাও! আমার তখন, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার অপেক্ষা। জল পড়ছেনা, কিন্তু চোখ মুখ কান্নায় জ্বালা করছে। আমি দাঁড়ালাম বটে কিন্তু চলার শক্তি নেই শরীরে। সারাদিনের ঐ মানসিক যন্ত্রণায় আমার শরীর হালকা হয়ে গেছে। আমি যেন টলে টলে পড়ে যাচ্ছি। আবার বললেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? জামা প্যান্টটা পর।

শক্তিবাবু এসে বলছিলেন, কিভাবে জামা প্যান্ট পরব, অমুক তমুক এইসব। আমার তো কানে কিছুই ঢুকছে না। তবে ওরই মধ্যে কিছুটা তৈরি হয়ে নিলাম। আমাকে রেল লাইনের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে বলা হল।

'ছেঁড়া তমসুক' ছবিতে আমার চরিত্রটা ছিল চার বন্ধুর এক বন্ধু, যে হিরোয়িনকে রেপ করেছিল। রেপ করেছিলাম বলে মেয়েটি সুইসায়েড করেছে। অন্য তিন বন্ধু কিন্তু জানেনা যে, কে রেপ করেছে। সবাই পরস্পরকে সন্দেহ করছে। ওরা চিন্তা করল চল যেখানে মেয়েটা কাটা পড়েছিল, সেই রেল লাইনের কাছে যাই। আমি বড়লোকের ছেলে ছিলাম, মেয়েটির দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাকে ঘনিষ্ঠ করে একসময় তাকে রেপ করি। যাইহোক শেষমেশ ঐ বন্ধুদের কাছে আমি ঐ রেললাইনের ধারেই ধরা পড়ি। ওরা আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করছে, আমি এখানে কেন? নিশ্চয় তাহলে এই-ই করেছে। এই সেই বদমায়েশ। একে ধর। আমার অভিনয়ে কোন কথা নেই। শুধুই সেই রেপিস্ট, সেই খুনি অপরাধীর মুখভাব। পূর্ণেন্দুদা আমাকে শুধু বলছেন, তুমি এইভাবে যাও ঐভাবে এগোও— এই পর্যন্ত। তা আমার সেসবও কিছুই কানে ঢুকছে না। কারণ সকাল থেকে আমার মনের অবস্থা ওই। তার পর অভিনয় অসম্ভব! গোটা ব্যাপারটার উপরই আমার তখন বিতৃষ্ণা জেগে রয়েছে। তো ওরই মধ্যে অন্য চরিত্ররা আমাকে ধরেছে।

রঞ্জিত মল্লিক তো আমাকে মানে আমার সঙ্গে তখন এমন ভাব করছে যে আমার ভয় লেগে গেল যে আজ সারাদিন ওরা সবাই আমাকে, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার পিছনে ওদের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। ওরা নিশ্চয় এখন তার একটা কিছু বদলা নেবে। হয়ত শ্যুটিংটা উপলক্ষ মাত্র। হায় ভগবান! তারপর সত্যি সত্যি ক্যামেরা টেবিল দৌড়ে এল। আমি সত্যিই চারিদিকে তাকাচ্ছি যেন আজ আমার সব গেল, সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে। দুঃখে হতাশায় ক্ষোভে আমার চোখ জলে টসটস করছে। তখন আমার মনটা হাহাকারে ভরে গেছে। পূর্ণেন্দুদা আমায় এ কী করল! তারই মধ্যে উনি বললেন, ওরা তোমাকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে ঐ গাছতলায় নিয়ে যাবে। ওরা তোমাকে ধরেছে। তো রঞ্জিতরা আমার সঙ্গে এমনই করছিল যেন আমি সত্যিই দোষী অপরাধী। অথচ আমি তো কোন দোষ করিনি, অপরাধী নই। জানি না কি ব্যাপার! তুমিই হচ্ছ পাণ্ডা, এই বলে আমাকে ওরা সেই পাথর ছড়ান মাটিতে

ফেলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল। ওরা এমন ভাবে, এমন হিংস্রভাবে আমাকে নিয়ে এল যে, আমার পিঠটিঠ ছিঁড়ে গেল। পূর্ণেন্দুদার যত ছবি করেছি, আমার কিছু না কিছু কাটা-ছেঁড়া হবেই। রক্তক্ষয় হবেই। ইচ্ছে করে হত। বলতেন এটাই কর। আমাকে এত ভালবাসতেন যে, এভাবে আমার রক্তও নিয়ে নিতেন।

তারপর, যাইহোক সেদিন তো ঐভাবে শ্যুটিং শেষ হল। শেষ হওয়ার পর পূর্ণেন্দুদা হাততালি দিয়ে উঠলেন। ডাকলেন, এই, এদিকে আয়।

তখন তাঁর মুখচোখ দেখে আমি তো হতভম্ব! ব্যাপারটা কি? তো উনি হাসতে হাসতে বললেন, এই চরিত্রটা করবার জন্যে তোকে সকালবেলা ঐরকম করেছি। অর্থাৎ পূর্ণেন্দুদা আমাকে ঐ চরিত্রটা করবার জন্যে সকাল থেকে তৈরি করছিলেন। বুঝুন ব্যাপারটা। ঐভাবে রেখে আমাকে, আমার মনোবৃত্তি, আমার মানসিক অবস্থাটা তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং হয়ত তা না হলে আমি অমন original 'Look' দিতে পারতাম না। অসাধারণ ভেবেছিলেন! যে ওকে এইভাবে treatment করে যাই, তবে ও এইরকম দিতে পারবে।

আমাকে তিন প্যাকেট five fifty five সিগারেট খাওয়ালেন। আমি যে কিভাবে ওঁর কাছে শিখেছি তা বলে বোঝাতে পারব না।

তোর কি যে কসম খাই, চোখের কোণে পানি আসছে ভাই

মাধবী মুখার্জী

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন 'বাইশে শ্রাবণ' ছবি করছিলাম সেই সময়। দূর থেকে দেখেছিলাম। একটু কবি-কবি চেহারা। তখনকার দিনের কবিদের যে কনসেপ্শন ছিল, সেরকমই চেহারার মানুষ। ঝাঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কোথায় একটা অসম্ভব গাম্ভীর্যও ছিল। মাঝে মাঝে স্টুডিওতে আসতেন। পরে শুনলাম উনি পাবলিসিটিতে কাজ করছেন। এটুকুই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

পরবর্তীকালে পূর্ণেন্দুবাবু একটা ছবি করলেন, যার নাম 'স্বপ্ন নিয়ে'। সেই সময় উনি আমার কাছে এলেন, এবং বললেন, "মাধবী, এই চরিত্রটা আপনিই করবেন।" স্ক্রিপ্টের কিছু শোনালেন। বললেন, "বাকিটা পরে আপনাকে শোনাব।"

শ্যুটিং করতে যাওয়ার কিছুদিন আগে হঠাৎ পূর্ণেন্দুবাবু আমার কাছে এলেন। এসে বললেন, "আমি ভীষণ সমস্যায় পড়েছি, আপনি কি করবেন বলুন।" আমি বললাম, "আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কি করব মানে?" উনি বললেন, "আমি যাকে ক্যামেরাম্যান নিয়েছিলাম (যদ্দুর মনে হচ্ছে সৌমেন্দু রায়) তিনি এবং আরো কয়েকজন,—তারা কেউ আমার কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, আপনিও করবেন না?" আমি বললাম, "সেটার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা কেন করবেন না, তা আমি তো জানি না। আমার তো না করার কোন কারণ নেই।" তখন উনি বললেন, "থ্যাঙ্ক য়ু, মাধবী। আমি আজ উঠি।" এই বলেই চলে গেলেন। উনি চা-ও খেলেন না।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে আমাদের শ্যুটিং শুরু হল। অনেকটা শ্যুটিং করলাম। কিন্তু কিছুদিন পর ছবিটা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে একটা কথা বলব, যেটা আমার অদ্ভুত মনে হয়েছে, যে, উনি যেসব দৃশ্য ভাবতেন, যে দৃশ্যে আমি নেই তেমন দৃশ্যেরও কথা আমাকে এসে বলতেন। বলতেন, "মাধবী, আমি এই রকম ভেবেছি। স্বপ্নের একটা দৃশ্য। দৃশ্যটা আমি এভাবে করব ভেবেছি, কিরকম লাগবে বলুন তো।" এসব যে উনি কেন আমাকে বলতেন জানি না। আমার যেটুকু মনে হত, বোধ হত, আমি সেই বোধবুদ্ধিমত পূর্ণেন্দুবাবুকে বলতাম, যে, "এটা খুব ভাল লাগবে।" কখনো "এটা কি ঠিক ভাল লাগবে?" আমার যা মনে হত, তাই বলতাম। হয়ত আমি একটা সহজ-সরল মেয়ে ভেবেই আমাকে তিনি এসব বলতেন।

হঠাৎ আবার একদিন এলেন, এসে বললেন, "মাধবী, ছবিটা করতে পারছি না। আর টাকাপয়সা নেই, শেষ হয়ে গেছে।" আমি কি আর বলি, বললাম,

"টাকা পয়সা তো আমারও নেই যে বলব, আমি পয়সা দিচ্ছি ছবি করুন—এরকম ক্ষমতাও আমার নেই। আমি দুঃখিত যে, কিছু করার নেই।"

আবার কিছুদিন গেল। আমাকে তো কাজ করতেই হয়। তো কাজ করছি, করছি, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন পূর্ণেন্দুবাবু এসে হাজির। খুবই গম্ভীরভাবে, বললেন, "দেখুন মাধবী, আমি ছবিটা করতে পারি। তবে যদি ছবি করি তাহলে আপনাকে পয়সা দিতে পারব না, আর যদি আপনি পয়সা নেন, তাহলে ছবি করতে পারব না। আমি কি করব আপনি স্থির করুন।" তখন আমি বললাম, "আপনি ছবিই করুন। আমাকে পয়সা দিতে হবে না।" এবারে পূর্ণেন্দুবাবুর ভুরু কোঁচকান বন্ধ হল। একবার আমার স্টিল দেখে উনি বলেছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন, "মেয়েটার ঐ ভুরু কোঁচকানটা আমার একদম ভাল লাগত না।" সেদিন বললাম, "কোন চরিত্রে, কোন সিচুয়েশনে কোঁচকাচ্ছি সেটাও তো ভাবতে হবে। আপনিও আজকে কতটা ভুরু কোঁচকালেন বলুন তো।"

যাইহোক শ্যুটিং শুরু হল। পূর্ণেন্দুবাবু ডেট দিতে বললেন। কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। সবাই ডেট নিয়ে নিয়েছে। আর কোন ডেট নেই। কথাটা ওঁকে বলতে উনি বললেন, "আমাকে তো সাহায্য করতেই হবে মাধবী। সবাই আমাকে সাহায্য করছেন, আপনিও করছেন।"

এখানে একটা কথা বলতেই হবে যে, 'অরোরা'র অজিতবাবুর কথা। অজিতবাবু ভীষণ ভাল মানুষ ছিলেন। উনি বুঝতে পারতেন কার মধ্যে কতটা ক্ষমতা। এইসব মানুষগুলো চলে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে। উনি তখন পূর্ণেন্দুবাবুকে বলেছেন যে, "ঠিক আছে, তুমি অরোরাতে শ্যুটিং কর, আমি তোমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করব।" তো আমি পূর্ণেন্দুবাবুকে বললাম, "কি হবে, ডেট তো একটাও নেই।" উনি বললেন, "তা তো আমি জানি না আপনাকে ডেট বার করতেই হবে।" আমি তখন বললাম, "আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আমার তো সকাল থেকে শ্যুটিং আছে, (তখন 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' হচ্ছিল। পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ চ্যাটার্জী কিন্তু জগন্নাথবাবুর কাজ ভাল না হওয়াতে বিশ্বজিৎ গিয়ে হৃষিকেশ মুখার্জীকে নিয়ে এলেন। ভোর চারটের সময় চলে যেতাম দক্ষিণেশ্বরে। ওখানে শ্যুটিং হত। কখনো বালী ব্রিজের উপরে, কখনো দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে। ফিরতে প্রায় দুটো বেজে যেত।) আপনি ছটা থেকে বারটা পর্যন্ত শ্যুটিং করুন।" শুনে উনি তাতে রাজী হলেন। কিন্তু শ্যুটিং করার সময় যা হয়, অবশ্য সবারই এটা হয়, পূর্ণেন্দুবাবুরও তাই হয়েছিল। কাজ হচ্ছে তো হচ্ছে, ওঁর কোন খেয়ালই নেই যে, বেশী দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাত হয়ে যাচ্ছে, মাধবী কি করে বাড়ি ফিরবে। মাধবী যে ডবল শিফ্‌ট করছে। এবং রাত বারটা তো বাজলই, একটা বাজল, দুটো বাজল ওঁর খেয়ালই নেই। আমিও ওঁকে ডিসটার্ব করতাম না। যখন কাজ হয়ে যেত আমি বলতাম, "পূর্ণেন্দুবাবু

সকালে উঠে আমি আর কাজে যেতে পারি না। আমার চোখটা খোলে না।" পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, "সত্যিই তো চোখটারও একটু বিশ্রাম দরকার। সত্যিই এটা খুব অন্যায় হয়েছে। ঠিক আছে কাল থেকে আমি ঠিক বারটায় প্যাকআপ করে দেব।"

কিন্তু পরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। প্রায় পৌনে তিনটে বাজল। তখন আমার মেকআপম্যান বলল, "দিদি, আপনি মুখে ক্রীম মেখে বেরন, তাহলে আর বলবে না।" আমি তখন বললাম, "না, এটা কি ঠিক হবে, আমি একজন ডিরেকটারকে অপমান করতে পারি না।" উনি তখন বললেন, "তাহলে আপনি এক কাজ করুন, ক্রীমটা হাতে করে নিয়ে যান।" আমি তখন ক্রীমটা নিয়ে গিয়ে পূর্ণেন্দুবাবুকে বললাম, "পূর্ণেন্দুবাবু এই দেখুন ক্রীম।" কিন্তু উনি সেই সময় কাজের মধ্যে এতটাই বিভোর যে বুঝতেই পারছেন না, ওটা ক্রীম। আমি তখন আবার বললাম, "এই দেখুন ক্রীম, দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিন্তু এটা মুখে মাখতে পারি। আমি কি এটা মুখে মাখব?" তখন ওঁর সেন্সটা হল। তখন উনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি এটা মুখে মাখুন।" তখন প্রায় রাত তিনটে বাজে।

ওদিকে 'স্বপ্ন নিয়ে'-র ক্যামেরাম্যান যখন কাজটা রিফ্যুজ করলেন, তখন এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন কেষ্টদা, অর্থাৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, আমি ওকেই নেব, এবং নিলেন। এটাও পূর্ণেন্দুবাবুর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এবং কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে দিয়েই কাজটা করালেন।

'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটা সেই সময় হয়ত কিছু সম্মান পায়নি। কিন্তু ছবিটা তৈরির মধ্যে একটা অসাধারণ ভালবাসা ছিল, একনিষ্ঠতা ছিল, যার মর্যাদা অনেক বেশি। ছবিটা যখন রিলিজ করল এবং ছবিটা আশানুরূপ চলছে না, তখন একদিন পূর্ণেন্দুবাবু আমার কাছে ছুটে এলেন। বললেন, "ছবিটা চলছে না। কিন্তু চালাতে হবে"। আমি বললাম কিভাবে চালাবেন? যে ছবি চলছে না, তা কি করে চালান যাবে?" তো উনি বললেন, "আপনি লিখে দিন যে, এই ছবি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি।" আমি বললাম, "তাহলে আপনার ছবিটা চলবে কি?" আসলে আর্টিস্টদের মধ্যে একটা পাগলামি থাকে, একটা ছেলেমানুষি থাকে, আর ভালবাসাটা এত তীব্র হয় ঐ কাজের প্রতি, যে, সেখানে সব কিছুই অন্ধ। সমস্ত ভালবাসাই অন্ধ। তো আমি লিখে দিলাম, "আমার শ্রেষ্ঠ ছবি।" অবশ্য সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দিলাম। কেন? তা দর্শকরা বলবেন। তাহলেই যদি দর্শকরা আসেন। এতে ফলাফল খুব একটা বিরাট কিছু হয়নি। হয়ত কিছু দর্শক টেনেছিল।

তবে ছবিটা নিয়ে পূর্ণেন্দুবাবুর নিজের মধ্যেও একটা অতৃপ্তি ছিল। যেটা সব বড় শিল্পীর মধ্যেই থাকে। একদিন আমার বাড়িতে এলেন। বললেন, "মাধবী, 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটা না, ঠিকমত হয়নি। ঠিকমত করতে পারিনি। আমাকে যদি আরেকবার সুযোগ দিত, তাহলে আমি আরেকবার করে দেখাতাম ছবিটা"।

তার পর বেশ কিছুদিন পূর্ণেন্দুবাবুর কোন দেখা নেই। ভ্যানিস! হঠাৎ একদিন এলেন। 'স্ত্রীর পত্র' করবেন। আমিও উৎসাহ দিলাম, "করুন"। তো তখন আমার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা হবার পর পূর্ণেন্দুবাবু এলেছেন। এসে বললেন, "মাধবী, আপনি কবে থেকে শ্যুটিং করতে পারবেন?" আমি বললাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার তো এক্সপেরিয়েন্স আছে। মানে আপনার তো অনেকগুলো বাচ্চা, আর আমার এই প্রথম। তাহলে, আমি কবে থেকে শ্যুটিং করতে পারব সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।" তখন পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, "আপনি তাহলে কোনদিনই শ্যুটিং করতে পারবেন না।" আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "তার মানে।" উনি বললেন, "হ্যাঁ। এখন বাচ্চা ঘুমুচ্ছে, বাচ্চা খাচ্ছে না—এইটা হবে। এর পরে বাচ্চা ছুটবে, দৌড়বে, হামাগুড়ি দেবে—আপনিও ব্যস্ত থাকবেন, কোথায় গেল কোথায় গেল করে। এর পরে বাচ্চা স্কুলে যাবে তার জন্য চিন্তা, এর পরে বাচ্চার বিয়ে হবে তার জন্য চিন্তা, তার পরে বাচ্চার শ্বশুর বাড়িতে কি হল তার জন্য চিন্তা, তারপরে তার বাচ্চা হবে তার জন্য চিন্তা—সুতরাং আপনার আর ছবি করা হবে না।" তখন আমি বললাম, "দূর্, আপনি এমন সব আজে-বাজে কথা বলেন। আমার ডাক্তারবাবু বলেছেন, তিন মাস পর আমি কাজকর্ম করতে পারব।" তখন পূর্ণেন্দুবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার কিন্তু ঘোড়ায় চড়া আছে। সিকোয়েন্সটা আমি রাখব ঠিক করেছি।" আমি তো অবাক! বললাম, "স্ত্রীর পত্রে ঘোড়ায় চড়া আপনি কোত্থেকে বার করলেন?" পূর্ণেন্দুবাবু অসম্ভব গম্ভীরভাব করে বললেন, "সেটা তো আপনার জানার কথা নয়। আর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন লিখেছেন। সেখানে পূর্ণেন্দু পত্রীরও কিছু ভাববার জায়গা থাকবে। আমি সেটা ভেবেছি এবং আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে।" আমি তখন খুব মুশকিলে পড়লাম। তিন মাস পরেই ঘোড়ায় চডাটা ঠিক হবে কিনা ভেবে।

যাইহোক, আমি তো খুব টেনশনে আছি। ঘোড়ায় চড়তে হবে বলে। তো কিছুদিন পরে পূর্ণেন্দুবাবু একটা এসরাজ নিয়ে এলেন। এবং সঙ্গে টিচার। বললেন, "ইনি এসরাজের টিচার। আপাততঃ এই এসরাজটাই শিখুন।" আমি এসরাজ শিখতে শুরু করলাম। ছবিও শুরু হল। আমি মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করতাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, ঘোড়ায় চড়াটা কোথায় আছে?" উনি বলতেন, "আছে, পরে হবে।" একদিন বললাম, "আপনার স্ক্রিপ্টে তো এটা নেই।" উনি বললেন, "ওটা স্ক্রিপ্টের বাইরে আছে।"

মানে এটা কিন্তু একেবারেই রসিকতা। এই গুণগুলো পূর্ণেন্দুবাবুর ছিল।

যাইহোক, 'স্ত্রীর পত্র' করলাম। সে সময় আমরা অনেক তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া, যাই বলুন না কেন, করেছি। যেমন, আমি বললাম, "এই যে অর্ধেক কথা বললেন, অর্ধেক বললেন না, এটা মানুষ কি করে বুঝবে?" উনি বললেন, "হ্যাঁ, বুঝে নেবে। আপনি ও নিয়ে ভাববেন না।" কিন্তু পরবর্তীকালে যখন প্রোজেকশন দেখলাম,

সেখানে দেখি আমি যেটা বলেছি, পূর্ণেন্দুবাবু সেটা শুনেছেন। দর্শকের বয়স এবং চাহিদার কথা মনে রেখে যেসব খামতি সম্পর্কে আমি পূর্ণেন্দুবাবুকে বলেছিলাম তা তিনি মেনে নিয়েছেন।

এর মধ্যে একদিন অসিত চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা এবং আমি অসিতবাবুকে পূর্ণেন্দুবাবুর ছবিটা সম্পর্কে বললাম। অসিতবাবু ছবিটা নিলেন। দেখা গেল সত্যিসত্যিই ছবিটা ভাল হয়েছে। সকলের ভাল লেগেছে এবং আমিও তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার পেয়েছিলাম, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে।

এর পর আবার দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক কারণেই আমি হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলাম যে, আমি আর ছবি করব না। তো পূর্ণেন্দুবাবুও এসে হাজির আমার বাড়িতে, জানতে চাইলেন, আমার এই অভিনয় না করার কথাটা কতখানি সত্যি? আমি বললাম, যে, যা তিনি শুনেছেন তা সত্যি। আমি আর অভিনয় করব না। উনি বললেন, "সে কি! আমি তো আপনাকে দিয়ে চতুরঙ্গ করাব ভেবেছি। আপনি এটা withdraw করুন।" এবং এটা সত্যি যে, আমি যে আজ আবার অভিনয় করছি তার পিছনে পূর্ণেন্দুবাবুর বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ উনি আমাকে দিয়ে আমার কথা withdraw করিয়েছিলেন। অবশ্য তখনো 'চতুরঙ্গ'র কাজ শুরু হয়নি।

এর পর যেদিন উনি আবার আমার কাছে এলেন, সেদিন ওঁকে দেখেই মনে হচ্ছিল একটা দুঃখ বেদনাবোধ নিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় উনি এসেছেন। উনি বললেন "প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী 'চতুরঙ্গ' করবেন এবং সেটা সুচিত্রা সেনকে দিয়ে। ডিরেক্টর হিসেবে আমাকেই অফার দিয়েছেন, কিন্তু সুচিত্রা সেনকে নায়িকা রাখতে হবে। আমি কি করব বলুন তো!" বললাম, "আপনি সুচিত্রা সেনকে নিয়েই করবেন। মিসেস সেনকে নিয়ে ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন আপনি, যা কেউ পায় না। আর, একথা কেউ বলতে আসে? আপনি কি পাগল!" উনি বললেন, "না, আমি যে আপনাকে নিয়ে ভেবেছি। আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।"

যাইহোক, চতুরঙ্গ-র কিছুটা শ্যুটিং হবার পর ছবিটা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণেন্দুবাবুর এটা দুর্ভাগ্য।

বইমেলাতে যাবারও একটা দুর্বলতা ছিল পূর্ণেন্দুবাবুর। বইমেলাতে একদিন দেখি বসে ছবি আঁকছেন। সেল করছেন। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, এটা করতে ভালোই লাগে। কিন্তু আমার কথা হল, সত্যি সত্যিই কি তাঁর ভাল লাগত? না কি প্রয়োজনেরও একটা দিক ছিল তাতে! এই জায়গাটা পূর্ণেন্দুবাবু হয়ত লুকিয়েছেন। আসলে তিনি যে মাপের শিল্পী ছিলেন, তাতে বিত্তবান মানুষদের তাঁকে বলা উচিত ছিল যে, আপনি আপনার কাজ করে যান, টাকা বা আপনার সংসারের দিকটা আমরা দেখব। সেটা হয়নি। এটা বড় দুঃখ, বড় যন্ত্রণাদায়ক।

তারপর আবার এল মালঞ্চ প্রসঙ্গ। আমাকেও রাজী করালেন। আমি বললাম

"আপনি কিভাবে ছবিটা করবেন ?" উনি বললেন, "ভিক্ষে করে করব।"

পরে শুনেছি সত্যিই অনেকে সাহায্য করেছেন। পি. সি. সরকার যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন এটাও আমি জানি। এবং আমরা যারা শিল্পী ছিলাম, তারা কর্ম ভিক্ষা দিয়েছি, অর্থাৎ আমরা একটা পয়সাও না নিয়ে ছবিটা করেছিলাম।

আমরা শ্যুটিং করতে গেলাম চন্দননগর। সেখানে আমার কথাতেই পয়সা না নিয়ে গ্লোব নার্শারী বাগান সাজিয়ে দিয়েছিল। এবং শ্যুটিং শুরু হল। কিন্তু প্রোডাকশনের লোকজনদের খাওয়ানর মত পয়সা পূর্ণেন্দুবাবুর নেই। কি করা যায় ? আমার বা রবি ঘোষের মত লোকজনদের কয়েকজনের খাওয়া দাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। বেশ যত্ন করেই একটা বাড়িতে আমাদের আপ্যায়ণ করা হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো লোক না খেয়ে থাকবে, সঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবু—এটা হতে পারে না ! তখন ওখানকারই শান্তিদেবী নামে একজন আমাদের পুরো ইউনিটের খাওয়ার দায়িত্ব নিলেন।

সারাদিন শ্যুটিং করে আমি চলে যেতাম আমার মাসতুত ভায়ের বাড়ি। পরের দিন সকালে এসে দেখতাম পূর্ণেন্দুবাবুর বিধ্বস্ত চেহারা। অর্থাৎ রাতে ভাল করে ঘুমুতেন না। হাঁপানির কষ্ট। কিন্তু যখন তিনি কাজ করেন, তখন কোথায় যেন এই কষ্ট উড়ে যেত। কাজের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা ছিল। সেই হিসেবে তাঁকে কেউ সাহায্য করল না, এটাই আমার দুঃখ।

আরেকবার পূর্ণেন্দুবাবু এলেন। বললেন, "মাধবী, ভীষণ জরুরী কথা আছে।" কথা হল যে, উনি 'ক্ষীরের পুতুল' করবেন। আমি বললাম, "সে তো অনেক টাকার ব্যাপার !" এখন হলে না হয় চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি ছিল, ওখানে বলে দেওয়া যেত। কিন্তু···। শেষ পর্যন্ত বললাম, "ঠিক আছে, ভাবতে থাকুন, আমিও ভাবতে থাকি।" এটাই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা। অবশ্য উনি হয়ত দূরদর্শনের জন্য 'ক্ষীরের পুতুল' করেওছিলেন। কিন্তু তেমন সাকসেসফুল হয়ত হয় নি।

দূরদর্শনে আমার ক্লোজ আপ ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে পূর্ণেন্দুবাবুই দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গে কিছু বলব। অনেকেরই ধারণা যে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে বোধহয় আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, রোমান্টিক সম্পর্ক একটা ছিল আমাদের মধ্যে। তবে সে সম্পর্ক হল, একটা শিল্পীর রোমান্টিকতা এবং সাধারণ মানুষের রোমান্টিকতা যেমন আলাদা। শিল্পীর রোমান্টিকতা হল, এক শিল্পী আরেক শিল্পীকে ভালবাসে অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পকে, শিল্প-কর্মকে ভালবাসা। এখানে আমিও পূর্ণেন্দুবাবুর শিল্পকর্মকে ভালবাসতাম এবং পূর্ণেন্দুবাবুও আমার শিল্পকর্মকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। মানব-মানবী হিসেবে আমাদের মধ্যে কোন স্থূল ভালবাসা ছিল না।

অনেকে বলে থাকেন, পূর্ণেন্দুবাবুর প্রেরণা হলাম আমি। এটা নিতান্তই রটনা। তবে একটা প্রসঙ্গ বলি। যখন স্ত্রীর পত্র ছবির জন্য শ্যুটিং করতে যাই পুরীতে তখন ঘটনাটি ঘটে। পূর্ণেন্দুবাবুকে বললাম, "চলুন মন্দিরে, পুজো দেব।" উনি তো এসব বিশ্বাস করেন না, তাই বলে উঠলেন, "না না, আমি যাব না।"

আমি বললাম, "যাবেন। এই জন্যই যাবেন, যে আপনি একজন শিল্পী বলে। ওখানে যেসব ভাস্কর্য আর স্থাপত্য আছে, সেগুলো আপনার দেখা প্রয়োজন। জগন্নাথ দেবের যে মূর্তিটা আছে, সে মূর্তিটা কেমন, কেন এমন মূর্তি, এসব তো আপনার জানা দরকার। আমার পুজো দিতে ভাল লাগে আমি পুজো দেব।" পুজো দিলাম। তারপর বললাম, "চলুন একটু গম্ভীরাতে যাব।" গম্ভীরাতে গিয়ে আমি একটা জিনিস খুঁজছি। জিনিসটা হল, চৈতন্যদেবের ঘরে আমার দাদুর আঁকা একটা ছবি। দাদুর নাম, শীতল ব্যানার্জী। শীতল ব্যানার্জী যে আমার দাদু হন, সেটা শুনে উনি একেবারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। বললেন, "জানেন, আমি জীবনে প্রথম যে ছবি আঁকি, মানে যে ছবি দেখে আঁকা-র প্রেরণা অনুভব করি তা ঐ ওঁর অদ্ভুত ধরণের আঁকা কৃষ্ণ দেখেই। ঐ ছবি দেখেই আমি প্রথম স্কেচ শুরু করি।" তাই মনে হয় বলতে পারি যে, পূর্ণেন্দুবাবুর প্রেরণাটা তাহলে আমি নই, আমার দাদু।

শেষেরও শেষ থাকে। তাই আবার মনে পড়ছে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে টেলিফোনে। আমার 'আত্মজা' ছবি শেষ করার পর এবং বোধহয় ওঁর মেয়ের বিয়ের সময়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার ছবি করতে ইচ্ছে করে না?" উনি বলেছিলেন, "না। কারণ প্রোডাকশনের লোকজনদের আমার খুব ভয় করে।"

আমি বলেছিলাম, "প্রোডাকশনের দিকটা যদি আমি দেখি?"

উনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি থাকেন, তাহলে আমি আবার ছবি করব।"

এটাই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা।

আমার মতে পূর্ণেন্দুবাবু একজন সাধক ছিলেন। সাধনাতেই তাঁর প্রাপ্তি, সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ।

দাঁড়িয়ে থাকো

(প্রয়াত কবি পূর্ণেন্দু পত্রীকে)

পার্থ বসু

নামিয়ে দিলেন
মা কোল থেকে—
সেই শুরু, আর হাঁটতে হাঁটতে
আশৈশবের নাকোল থেকে
এ কলকাতায়।
আস্তে আস্তে
এই শহরের আদ্যোপান্ত
তুমুল ভালবাসতে বাসতে
কলম, তুলি—
এবং তুলে
নিয়েছিলে চলচ্চিত্রে
যে চালচিত্র
তা ভুলব না।
ক্রমান্বয়ে
মানুষ গাছের বাকল থেকে
যুগোত্তীর্ণ, কিন্তু বুকে,
তোমার ভাষায়,
—ফুলের গন্ধে ফোটার জন্য
নারীর স্পর্শ পাওয়ার জন্য
কাঁদতে কাঁদতে
পদ্মপুকুর—
পদ্মপাতায়
পা রাখতে চায়
সে যতদিন
অবিচ্ছেদ্য স্মৃতির সাঁকোয়
দেখতে চাইবে
দাঁড়িয়ে থাকো।

কবি পূর্ণেন্দু

অলকেন্দুশেখর পত্রী

এখন মৃতদেহে শুয়ে আছ যেন রাত্রির
পূর্ণিমায়
বরফের বিছানার উপব
শয়ানে,
মরবেই জেনে একেবারে ধোপদুরস্ত বাঙালী পোশাকে
চন্দনের ফাগে।
কবে একদিন লিখেছিলাম শংখকে, 'পূর্ণিমায়' আমার বইয়ে—
পূর্ণিমায় এখন সকাল।
আজ আর একমুঠো ক্যানসারের যন্ত্রণা আর তোমাকে
কুরে কুরে কামড়াবে না মৃত্যুকে স্থির জেনেও।
এখন তুমি নিশ্চিন্ত, স্থির,
আর তুমি আন্দোলিত নও।
আবার আন্দোলিত হওয়া মানেই তো
পিকাসোর কিউবিককে আরও তীব্রভাবে ভাঙা।
আবার আন্দোলিত হওয়া মানেই তো
আঙুর চাই চুল্লীর ভেতর থেকে কাল থোক থোক কবিতা লেখার জন্যে।
এখন তোমার শিয়রে মৃণাল, মাধবী, সুমিত্রা, অসীম
বুদ্ধদেব শব্দের বিছানায় অজস্র, অজস্র, কান্না নেই!
আবার আন্দোলিত হওয়া মানেই তো
চলচ্চিত্রের জন্য কী নাট্যে আবার কাটাকুটি হওয়া।
আমিও বুঝতে পেরেছি—
সময়ের অসুখ থেকেই তোমার গদ্যের জন্ম।
আমিও সে সব বুঝেছি জীবনানন্দের মত আমাকে নিভৃতে রেখে।

অতুলপ্রসাদের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এক কবিতা লিখেছিলেন।
নাও, এখন তোমায় আমারই সাজিয়ে দেওয়া
শেষ গন্ধরাজের গন্ধে,
ক্যাথিড্রাল চার্চের বাগান থেকে তুলেছি।
তোমাকে সাজাবার জন্যে কখন রবীন্দ্রসদনে এসেছিলুম
তখন কলকাতার ভোর।
আমি জানি, কলকাতায় কখন ভোর হয়।

একদিন বুকের মধ্যে বড়ে গোলামে কী লেখেছিলে না!
ফুলের গন্ধে, নারীর গন্ধে,
কোন্ ললিতে কোন্ বিভাসে…।
তখনও সানাই বাজছিল
যেন রাতকাটা
আমার আমীর খাঁর।
তুমি তো আর দেখতে পেলে না
তোমাকে জড়িয়ে ধরে কেমন করে ছোট্ট শিশুটির মত কাঁদছি জোড়ে—
বন্ধুর মত কাঁদছি,
ক্রমশ ক্রমশ অশ্রু ফোটান মুক্তোর মত যেন হয়ে ওঠা
তর্পণে অগ্রজ ভ্রাতৃপ্রতিম পিতার জন্য যেন কাঁদছি—
অথচ, তুমি আমার জীবনে এক ঘাতক, প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে—
তবু, তোমাকে আঁকড়ে নিয়ে গেছি রবীন্দ্রসদন থেকে কেওড়াতলার চুল্লীর
দুয়ার ঘর পর্যন্ত
তোমার তবু অভিভাবক ছিল।
আমার জন্য কেউ আছে কিনা জানা নেই
আমারও অনিবার্যে মৃত্যু হবে একদিন
এ প্রাণে, এ দেশের এক বিচিত্র ডোমিনিয়ন স্টেটের মানচিত্র থেকে।
তবু, দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ!
ওরা গান গাইছিল।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ'…মায়ের মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে
গেয়েছিলুম
ওরা কবিতা পড়ছিল। আমি দেশ-মাকে নিয়ে সাদা স্থলপদ্ম
রচনা করেছি।
যেন আমারই কণ্ঠের গান, আমার কণ্ঠের কবিতা পাঠ!
শুধু রবীন্দ্রনাথের মতো কাঁদছি ঘর ও বাহির জুড়ে, বুকব্রত জানে।
আমার সঙ্গে তোমার দশ বছরের ছোটবড় সম্পর্কের
ক্ষতবিক্ষত রাগরক্ত স্মৃতিগ্রস্ত
ফুলের মালার
গন্ধ নিয়েছি—
ঠিক যেমন করে একদিন মায়ের গন্ধ একদিন এমন করে নিয়েছিলাম
মা প্রতিমার শরীর থেকে।
সেদিন তারও শরীর ছিল মৃত—
শয়নে বিবেকানন্দের ভাষায় যেন, এক জ্যান্ত দুর্গা

না, ক্লান্ত। নিঃশ্বাস আর নিতে পারছিল না।
মুখ দিয়ে শেষ রক্ত গড়িয়ে গেল।
তোমারও সঙ্গে আমার আত্মার
কথাবার্তা হবে
আরও দূর পৃথিবীর পর,
আজ গীতাঞ্জলির প্রথম লেখাটির মত
তোমাকেও প্রণামের সঙ্গে চুমু খেলুম অগ্নিতে দেবার আগে, শেষবার।

কলকাতার আকাশে পূর্ণেন্দু এখন

শ্যামল মায়া

যে ছেলেটা গ্রামের আকাশ দেখত একসময়
ছবির রঙের খোঁজে দৌড়ে বেড়াত সারা মাঠ
সেই ছেলেটা ঘাস ফড়িং এর সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে
কলকাতার দেউড়িতে পৌঁছে যায় ছবির কেরামতি শিখতে।

সে বইয়ের মলাট আঁকত
মলাটের ভিতর অক্ষর সাজাত কবিতায় সাহিত্যে।
ক্যামেরার চোখে চলচ্চিত্রের কবিতা
ধরে এনে দিয়েছে দর্শকের সামনে বেশ কয়েকবার।

সমস্ত সময় জুড়ে কলকাতার আকাশে ঘুড়ির মত
পাক খেতে খেতে রামধনুর সাত রঙ হয়ে গেল সে।
তবুও তার কালি কলম সেলুলয়েডের ছবিতে
সবুজ গ্রামের স্মৃতির উৎসব ছিল সর্বদা

কলকাতাকে ভালবেসে
কলকাতার আকাশে ভোকাট্টা হয়ে গেল
পূর্ণেন্দু নামে রঙিন ঘুড়িটা।

কবি গো ফিরে যেতেই হবে

সন্দীপ কপাট

সময়কে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ
সংগ্রামের দরজায় ঝুলে যায়
প্রকাণ্ড এক তালা
বেলা নয়, অবেলায় এমন বারুদ-দাহ বুক

পুড়িয়ে নিয়ে যায় তোমাকে
অচেনা অন্য কেউ অন্য লোকে।
এমনই চৈত্রের ঝড়-বৃষ্টির রৌদ্র-ঘর
ঘার ভেঙে, 'কেউ ভাল না বাসলে'
অভিমানে, ফিরে যেতেই হবে
অন্য কোথাও অন্য লোকে।
তবু, গহন রাতের শেষে পূব-গগনে
'মহারাণী'র জঠর ঠেলে
আসা-যাওয়ার বেবাক বেলায়
'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়!'

পত্রী কবি

নিশীথ চৌধুরী

কলম খুলে হৃদয় ছুঁলে
তুলির টানে সুর,
পত্রী কবি আঁকলে ছবি
অবাক অচিনপুর।

সৃষ্টিসুখে সব্যসাচী
দৃষ্টি-পিছল পথ
বৃষ্টি শেষে নিরুদ্দেশে
কৃষ্টি-কুসুম রথ

অনীক তোমার গল্প কথার
ময়না দাঁড়ে কই?
এক মুঠো রোদ-আশায় ভাসায়
দীঘির পাড়ে ওই।

উর্মিমুখর উর্বী ডাকে
কোথায় বল যাও?
কল্পলোকে বাইছ কি গো
সপ্ত ডিঙায় নাও।

পরিশিষ্ট :

অমল গাঙ্গুলী প্রসঙ্গে

'অমল গাঙ্গুলী প্রসঙ্গে' পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা একটি ছোট বই বা পুস্তিকা। একজন মানুষের জীবদ্দশায় তাঁর কর্মধারায় মূল্যায়ণ করে লেখা বই। অমল গাঙ্গুলী মানুষটিও ছিলেন এক বিশেষ রকম স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সম্প্রতি গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ তাঁর প্রয়াণ ঘটল। কিন্তু সেই ১৯৬৭-তেই পূর্ণেন্দু পত্রী এই দুরূহ মানুষটি সম্পর্কে কলম ধরেছিলেন শুধু নিজের প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই নয়, যেন অনেকটা নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কনের অভিপ্রায় থেকে—হয়ত বা অচেতনেই। অনেক পরে,—আটের দশকে এসেও তাঁর কবিতায় এমন পংক্তি জেগে ওঠে : 'পরাধীনতার চেয়ে বেশি বেদনার ভার হয়ে উঠেছে এখন / নানাবিধ স্বাধীন শিকল' এ যেন পূর্ণেন্দু পত্রীর কলমে অমল গাঙ্গুলীর কথা। ছয়ানি গ্রামে থাকাকালীন সেই শৈশবেই আমি এই বইটি একবার পড়েছিলাম। ঘিয়ে রঙের মলাটে খয়েরী রঙে নাম ছাপা বইটি বহুদিন আমাদের মাটির ঘরের তাকে পড়েছিল। সম্প্রতি জানতে পারলাম প্রচ্ছদ লিপিটি নিতাই দাসের করা। আমি তখন বইটির মূল্য বুঝিনি। পরবর্তী কালে পূর্ণেন্দু পত্রীকে জানার পরে বইটি আর খুঁজে পাইনি। আমার সহযোগী সম্পাদক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ নিকেতনের গ্রন্থাগার থেকে একটি জেরক্স কপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। সেখান থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম, যা থেকে স্বয়ং পূর্ণেন্দু পত্রী প্রসঙ্গেও আমরা আলোকিত হব। বইটির প্রকাশক ছিলেন বাগনানের সুকুমার মিত্র মহাশয়।—সম্পাদক

একটা নদীকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করলে তার এক একটা ভাগ দেখতে হবে এক একটা পুষ্করিণীর মত। কিন্তু নদী অনেকগুলো পুষ্করিণীর সমন্বয় নয়। নদী একটা স্বতন্ত্র সত্তা। পুষ্করিণী স্থির। নিজের শক্তিতে উদ্বেলিত হবার ক্ষমতা তার নেই। নদী আপন বেগে আলোড়িত। জীর্ণ তীরভূমিকে একদিকে সে ধ্বংস করে চলেছে নির্মম স্রোতে। অন্যদিকে নতুন তীরভূমি রচনা করছে আপন পলিমাটির নির্মল স্নেহে। প্রয়োজনে জোয়ারে অস্থির। প্রয়োজনে ভাটার টানে স্তব্ধ। একবার সে সংগ্রামী। একবার সে ধ্যানী। কিন্তু লক্ষ্য তার এক। সাগরের দিকে এগিয়ে চলা। মহৎ সত্যের নিকটবর্তী হওয়া।

এই কথাগুলো আমাদের মনে পড়ল অকারণে নয়। মনে পড়ল একটি ব্যক্তির প্রসঙ্গে। তাঁর নাম আমাদের এলাকার কারো অজানা নয়। নিজের নিষ্ঠায়, ত্যাগে, পরহিতব্রতে, বিভিন্ন সংগঠনমূলক প্রয়াসে ও নির্ভীক রাজনৈতিক উত্তম-উদ্যোগেই অমল গাঙ্গুলী দীর্ঘকাল নিজেকে সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আত্মীয়ের মত ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন আমাদের কাছে। তবুও আজ তাঁর সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। প্রয়োজন শুধুমাত্র এই জন্যে নয় যে, আসন্ন নির্বাচনে তিনি একজন সম্মানীয় প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রয়োজন এইজন্যে যে, প্রার্থীরূপে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণত নিরঙ্কুশ ভাল অথবা নিরতিশয় মন্দ এই জাতীয় এমন একমুখী ভাবনা কাজ করে যে, তার ফলে তাঁর অনুরাগী অথবা বীতরাগী, শত্রু অথবা মিত্র এই উভয়পক্ষের আমরা কেউই তাঁর যথার্থ ব্যক্তিত্বের, যথার্থ রাজনৈতিক দর্শনের এবং চিন্তাশীলতারও পরিচয় পাওয়া থেকে বঞ্চিত হই। ফলে অনেক বৃহৎ প্রশ্ন ও মহৎ উত্তর আমাদের অজানা থেকে যায়। নির্বাচনে কোন একজন প্রার্থীকে ভোটদানই দেশবাসীর একমাত্র কর্তব্য নয়। নির্বাচন সেইখানেই সার্থক, যেখানে আমরা নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের নিজেদের অন্তরের রাজনৈতিক চেতনা ও বোধকে দেশের সামনে জিজ্ঞাসার মত তুলে ধরতে পারি, এবং দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক চেতনা ও বোধকে নিজেদের অন্তরে বিচার বুদ্ধি সহযোগে গ্রহণ করতে পারি।

বৃহত্তর প্রশ্ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ

বিধান সভার সদস্য ও স্থানীয় নেতা হিসেবে যখন তিনি জনজীবনে সমাদৃত, যখন ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা তাঁকে অনায়াসে আচ্ছন্ন করতে পারতো, পদমর্যাদার দাপট দেখিয়ে যখন তাঁর পক্ষে আত্মসন্তুষ্ট ও আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়া সাধারণভাবে খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, ঠিক সেই সময়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার জগতে এক নতুন রূপান্তর ঘটতে শুরু করল ধীরে ধীরে। আঞ্চলিক সমস্যা, রাজনৈতিক দলের ধরাবাঁধা কর্মসূচীর বাইরে দেশের বৃহত্তর সংকটের উপলব্ধিতে একদিকে যেমন তাঁকে দেখা গেল উন্মুখ, অন্যদিকে সমাধানের পথ-সন্ধানে উদ্‌গ্রীব।

বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন মামুলী শ্লোগানমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছিল একটা প্রবল বিক্ষোভ। ১৯৫২ সাল থেকে এর সূচনা। কমিউনিস্ট পার্টিতে সংশোধনবাদের অবসানের সংগে সংগেই পার্টির অভ্যন্তরে শিরিষ্ঠ সর্বভারতীয় নেতাদের সংগে শুরু হয় তাঁর মত-বিনিময় ও মতবিরোধ। একদিন সেই মতবিরোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

সেবার নামে, সাহায্যের নামে, রিলিফের নামে, কৃষি-ঋণের নামে, পল্লী উন্নয়নের নামে যা কিছু ঘটতে যায়, তাতেই দেখা যায় সকলের আগে বিবেচ্য বিষয় হল তাতে কংগ্রেসী স্বার্থের কতটা সুবিধা ঘটছে, এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ধন-কুবেরদের কতটা সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে। এই ভিত্তিতেই দীর্ঘকাল ধরে চলেছে সরকারী আমলাতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা। দীর্ঘকাল বাইনান ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার সংগে ঘটেছে তাঁর গভীর পরিচয়। কিন্তু অব্যবস্থা যখন একটা বেপরোয়া বিচারহীন প্রতি-কারহীন কর্তব্যহীনতার চরম শিখরে পৌছল, অমল গাঙ্গুলীকে আমরা দেখলাম, বাদ-প্রতিবাদের চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করে তিনি নেমেছেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে। উলুবেড়িয়া মহকুমা কোর্টের প্রাঙ্গনে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর আমরণ অনশন সত্যাগ্রহ। দেখতে দেখতে অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল তীব্রভাবে। খবর পৌছল সরকারী দপ্তরে, খবর পৌছল তাঁর নিজের পার্টিতে, খবর পৌছল দেশের জনসাধারণের প্রাণে। হাজার হাজার মানুষ এসে সমবেত হল তাঁদের প্রিয় নেতার চারপাশে। একদিকে তাদের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি। অন্যদিকে হৃদয়ে উদ্‌বেগ। ছুটে এলেন পার্টির নেতারা। তাঁদের কণ্ঠে নিষেধ। সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে ও দায়িত্বে তাঁর অনশন গ্রহণের কর্মসূচী কমিউনিস্ট নেতারা সমর্থন করলেন না। তাঁদের বক্তব্যে এ হল ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতা, সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতি। জনগণের আন্দোলনে ব্যক্তি কেউ নয়, পার্টিই সব। প্রতি বৎসরান্তে গৃহীত নতুন নতুন পার্টি নীতির কাছে ব্যক্তিত্বহীন, প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণই যথার্থ কর্মীর একান্ত কর্তব্য। পার্টির নেতারা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন তাঁর উপর অনশন ভাঙার জন্যে। কিন্তু যার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অবহেলিত, উৎপীড়িত মানুষ, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি পার্টির অনুরোধে সায় দিতে পারলেন না।

এই অনশনের যে সুদূর প্রসারী ও ভয়ানক পরিণামকে লক্ষ্য করে আতংকে কেঁপে উঠেছিল জেলার শাসকগোষ্ঠী, অবধারিত প্রতিকারের স্বপ্নে ও আশায় দুলে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের হৃদয়, পুঁথি-কপচান নীতিকথার মিথ্যা দোহাই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারল না। জনতার স্বার্থে, জনপ্রতিনিধির আত্মোৎসর্গের এই স্মরণীয় অভিযান আকৃষ্ট করল সারা দেশের দৃষ্টি, সৃষ্টি করল দেশসেবার এক বিরল-দৃষ্টান্ত ইতিহাস।

লাগল লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়। পার্টি থেকে এল শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ। তা সত্বেও তিনি ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে পার্টির নির্দেশকে মাথা পেতে নিতে পারলেন না। পরিণামে তাঁকে একদিন

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে করতে হল পদত্যাগ। সেদিন বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্রেই নিষ্ঠাবান এই দেশকর্মীর দলত্যাগের সংবাদ পেয়েছিল যথেষ্ট প্রাধান্য। চারিদিকে জেগে উঠেছিল কৌতূহল ও প্রশ্ন। কোন্ পথে বাঁক নেবে অমল গাঙ্গুলীর পরবর্তী জীবন? পুনরায় পার্টি নীতির কাছে আত্ম-সমর্পণ? না কি রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস? নতুন দৃশ্যপট উত্তোলিত হলে কি দেখা যাবে? নায়কের নবজন্ম? না অপমৃত্যু?

নীতিজ্ঞানহীনের জবানবন্দী

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এই অনশন একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নতুন রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সম্ভাবনা প্রকাশ্যে সেই প্রথম তাঁকে দেখা গেল তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কোন সংগঠনের ধ্বজাবাহী প্রচারকমাত্র নন, প্রয়োজনে নির্মম সমালোচকও। এই প্রথম একান্তভাবে একটি গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক ব্যক্তি-মানুষ, তাঁর সুকঠিন রাজনৈতিক খোলসের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা ও মানবিক উপলব্ধিব প্রচণ্ড অস্থির তাড়নায়।

এর জন্যে তাঁর পার্টি তাঁকে আখ্যা দিল 'নীতিজ্ঞানহীন'; এবং সেই সঙ্গে নির্দেশ এল নীতিজ্ঞান থাকলে তিনি অবিলম্বে ত্যাগ করবেন তাঁর বিধান সভাব সদস্যপদ। পার্টির টিকিটেই তিনি বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং পার্টির মতে আর তাঁর ঐ সভ্যপদ আঁকড়ে থাকার অধিকার নেই। বলা বাহুল্য, তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ত্যাগ করলেন বিধান সভার সদস্যপদ।

সদস্যপদ ত্যাগের অল্পকাল পরেই অনুষ্ঠিত হল বাগনানে নতুন উপ-নির্বাচন। এই উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগনানে বয়ে চলল পঙ্কিল রাজনৈতিক অপপ্রচার, একের বিরুদ্ধে অপরের বিষোদ্গার, কুৎসার কদর্য অভিযান। এই সময়ে অমল গাঙ্গুলী ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। হঠাৎ একদিন তাঁকে দেখা গেল নির্বাচনী সভায় বক্তারূপে। তিনি কমিউনিস্ট প্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর এই বিসদৃশ আচরণে অনেকেই বিস্মিত হল। লোকনিন্দা তাঁকে নতুন আখ্যায় ভূষিত করল 'নীতিজ্ঞানহীন'।

শেষ হল নির্বাচনী কোলাহল। জয়ী হল কংগ্রেস প্রার্থী। চারিদিকে স্তব্ধতা। কিন্তু এই স্তব্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আসামে শুরু হল বাঙালী নির্যাতন। যে ঘটনায় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষ তখন বিমূঢ় ও বিচলিত, সে ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের চরম নিষ্ক্রিয়তা ও দেশের

রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাক দর্শকের ভূমিকা লক্ষ্য করে অমল গাঙ্গুলীকে আবার দেখা গেল সংগ্রামী মূর্তিতে। বাগনান থানা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিম বাংলার অগণিত নরনারীর মূহ্যমান হৃদয়ের আশাকে রূপ দিতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম বাংলার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা যদি একটি যুক্ত আলোচনায় না বসেন, এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দেশের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুচিন্তিত কর্মসূচী উপস্থিত না করেন, তাহলে দেশের এই পঙ্গু, দুর্বল নেতৃত্বের প্রতিবাদে তিনি ১লা সেপ্টেম্বর থেকে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করবেন। এই সময়ে সংবাদপত্রে তাঁর কতকগুলি সুচিন্তিত চিঠি 'পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পার্টিগুলির প্রতি', 'মানুষ বড না পার্টি বড' ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হয়।

নায়কের নবজন্ম

মৌন মাত্রেই মূক নয়। মৌনতা কখনো কখনো ধ্যানের নামান্তর, চৈতন্যের গভীর মগ্ন আত্মসন্ধান। অন্ধকার পটক্ষেপ মাত্রেই নাটকের যতি নয়, কখনো কখনো নতুন জ্যোতি বিচ্ছুরণের পটভূমি।

লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়ার ফলে যাঁরা ভেবেছিলেন এই স্তব্ধতাই তাঁর মৃত্যু, তাদের চমকে দিয়ে অকস্মাৎ একদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হল একটি স্তম্ভিত হওয়ার মত সংবাদ।

"সমাজের সর্বস্তরে যখন আদর্শের অপমৃত্যু ঘটছে, তখন কোন নেতা বা কর্মীকে কোন মহৎ আদর্শ রূপায়ণে উদ্যোগী হতে দেখলে কার না আনন্দ হয়। তেমনি আনন্দই নিয়ে এসেছে 'আনন্দ-নিকেতনের' সংবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য ও রাজনৈতিক কর্মী শ্রীঅমল গাঙ্গুলী তাঁর আদর্শের জন্য দলত্যাগ করেছেন এবং সেই সঙ্গে সমাজসেবার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লিপ্ত থেকে একথা তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের বর্তমান সমাজের আমূল রূপান্তর ভিন্ন এ-সমাজের কোন উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। এখন আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি, এতে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁদের নিজ নিজ ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগে সক্ষম নয়। এর ফলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের আশা সুদূরেই রয়ে যাচ্ছে। শ্রীগাঙ্গুলী এই দিকটি নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করছেন তা হল আদর্শ পল্লীর মাধ্যমে দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ উন্মোচন করা।"

সাধারণ ভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা যে কতটা

ভ্রান্ত, ভুয়ো ও অসামাজিক তার প্রমাণ—পল্লী-উন্নয়নের কাজে মনযোগী হবার খবর পেয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মন্তব্য করলেন—ওঃ, তাহলে অমল গাঙ্গুলী রাজনীতি ছেড়েই দিলেন। হায় গান্ধী! হায় রবীন্দ্রনাথ। অথচ গান্ধী রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই আমাদের গলার স্বর ভাব ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটাও আমরা ভাল করে পড়ে দেখিনি। ১৯০৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে কেন্দ্র করে যে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন প্রমত্ত গর্জনে জেগে উঠেছিল, সেদিনই বাংলাদেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল, পল্লী-উন্নয়ন, কুটীর-শিল্পের বিকাশ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম, স্বাবলম্বী মানুষ গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যতিরেকে দেশের চরম মুক্তিলাভ কোনদিনই সম্ভব হবে না। একটা দেশ বা দেশের মানুষকে কোন শাসক বা রাজা বা দেশ স্বাধীন করে দিতে পারেন না, দেশের মানুষকে স্বাধীন হতে হয়, স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই গোড়ার যুগে রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিন পাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ কথা বার বার আমাদের কানের কাছে ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করে শুনিয়েছেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীকেও শোনা গেল এই মন্ত্রোচ্চারণে। তাঁর প্রবর্তিত চরকা হয়ে উঠল দেশ সেবা ও স্বাবলম্বনের প্রতীক। আমরা এই সব মহামানবদের নাম-গুলোকেই মনে রেখেছি, নীতি গেছি ভুলে। রাজপথে মিছিল বের করা, মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে গালভরা বুলি শোনানই যে দেশে রাজনীতির প্রধানতম কর্মসূচী, সেদেশে পল্লী-উন্নয়ন যে রাজনীতির বাইরের ব্যাপার বলে চিহ্নিত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফাঁকি দিয়ে, বুকে কোনমতে যে কোন একটা দলের টিকিট ঝুলিয়ে, মুখে তোতাপাখির মত নেতাদের শেখান বুলি কপচিয়ে এখন কত সহজেই রাজনৈতিক কর্মী হওয়া যায়।

কিন্তু অমল গাঙ্গুলী নিজেকে এবং দেশকে ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাননি। নিজের ত্রুটিকে সেই সঙ্গে সত্যকে তিনি কখনো গোপন করতে শেখেননি। অকপটে তা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করেছেন।

'আনন্দ-নিকেতন' রাতারাতি কোন আলাদীনের ম্যাজিকে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিন ধরেই মনের মধ্যে ছিল সুপ্ত হয়ে, সুযোগের অপেক্ষায়।

'নবাসন'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তাঁর এই পল্লী-উন্নয়নের প্রচেষ্টা। কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল প্রথম পর্যায়ে শিশু-বালকের জন্যে বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, আর্ত-পীড়িতের জন্যে চিকিৎসাকেন্দ্র ও ছুটি শিল্পকেন্দ্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার ও কর্মের ব্যবস্থা, গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি-সংস্কারের ব্যবস্থা। তৃতীয় পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বুনিয়াদী কৃষি-বিদ্যালয়, সুরাকার হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন। চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষার

অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা (Museum), ফল ও ফুলের বাগান, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র ও পশুপালন কেন্দ্র।

প্রথম পদক্ষেপেই দানস্বরূপ সংগৃহীত হল ৫ বিঘে জমি। পরে সেটাই হয়ে উঠল ১০ বিঘে। তাতেই শুরু হল নিজস্ব ভবন, পুকুর, বাগান। পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন। কিন্তু প্রথম দিকে সব কিছুই এক পা এগোনর সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে খুবই ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে একটা রূপ নিতে শুরু করল। মূল কারণ একটাই অর্থাভাব। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী এর সঙ্গে সংযুক্ত তাঁদের কারুরই অর্থ সঙ্গতি নেই। যাঁদের অর্থসঙ্গতি আছে সেইসব অর্থবানরা এই জাতীয় উদ্যোগের প্রতি উপহাস ছাড়া অন্য কিছু করতে অনিচ্ছুক। সরকারী সাহায্য সেও সুদূর মরীচিকা। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাহায্য, সাহচর্য, সহযোগিতা তাও দুর্লভ, কারণ তাঁদের কাছে এটা একটা পাল্টা কার্যকলাপ হিসেবে বর্জনীয়। তবুও উদ্যম থেমে রইল না। এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলেছে আজও। বহু বিপর্যয় বহু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত, চূড়ান্ত আর্থিক-সংকট, সরকারী ঔদাসীন্য, সব কিছুকে অতিক্রম করে আজ 'আনন্দ-নিকেতন' যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে স্থায়ী একটি বৃহৎ সংগঠনে, এমন কি সরকারী দাক্ষিণ্যও আজ কিছু কিছু বর্ষণ হতে শুরু করেছে, তার মূলে ছিল কিছু সংখ্যক কর্মীর অক্লান্ত সাহচর্য আর তাদের নেতা ও সংগঠক অমল গাঙ্গুলীর একরোখা জেদ, অপরাজেয় মনোবল, এবং নিজের সংকল্পের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। রাজনীতির কলকোলাহল থেকে দূরে নিভৃত পল্লীর নির্জন জগতে তিনি যে শুধু তাঁর পরিকল্পনারই জন্ম দিলেন তা নয়, নিজেরও নবজন্ম ঘটালেন। এই সময়েই জীবনে প্রথম এল অবসরের স্বাদ, অবকাশের সুযোগ। সুযোগ অপব্যবহৃত হল না। গভীর মনযোগ পড়ল পড়াশোনার দিকে—ভারতীয় মনীষিদের মৌলিক চিন্তা-ভাবনা ও দর্শনের দিকে, আরও মোহমুক্ত মন নিয়ে রাজনীতিকে বোঝার দিকে।

নতুন মত নতুন পথ

ভুবনেশ্বর কংগ্রেস থেকে এই সময় ঘোষিত হল প্রায় পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব। তার অর্থ এই নয় যে, কংগ্রেস-সংগঠন হিসেবে রাতারাতি বদলে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রাধান্য বা বিরোধিতা। তা নয়। তবুও এই ঘোষণা তাৎপর্যময়। দেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্বহীন, অথচ রাজনীতি সম্পর্কে অমল গাঙ্গুলীর চিন্তার জগতে পার্টি ত্যাগ করার পূর্ব থেকে [illegible]।

১। কংগ্রেসের পরিবর্তে একটি বিকল্প কংগ্রেসী সরকার গড়ে তোলাই কি ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার একটাই পথ?

২। সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কাদের সংগঠন, কোন্ শ্রেণীর সংগঠন?

৩। কমিউনিস্ট লেবেল-মার্কা অথবা রক্ত-পতাকাবাহী একদল বিশেষ দলভুক্ত কমিউনিস্টই কি দেশে সমাজতন্ত্রের একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা হতে পারে?

৪। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ করে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব কি অপরিহার্য?

৫। বিকল্প সরকার যদি গঠন করতেই হয়—কাদের নিয়ে গড়া হবে?

এই সমস্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অকস্মাৎ এক নতুন আলোকপাত করল তাঁর মনে। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের প্রস্তাবকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তিনি কতকগুলি নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। যা পরে তাঁর 'ভুবনেশ্বর সম্মেলন ও সমাজতন্ত্র' নামক পুস্তিকাব অন্তর্ভুক্ত হযে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ—

১। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এখনিই কোন বলিষ্ঠ প্রকাশ না ঘটলেও কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর সম্মেলনের প্রস্তাব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংগ্রামে পুঁজিবাদী চিন্তাধারাকে এক পা পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

২। উগ্র বামপন্থীদের কাছে 'গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদ' সোনার-পাথর বাটি বলে উপহাসিত হলেও—গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ যুগের প্রধান সংগ্রাম এবং সেইদিকে অগ্রগতিই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী গণতন্ত্র প্রিয় বিরোধীদলের ভূমিকার সার্থকতা নির্ধারিত হবে সমাজতন্ত্রের আগ্রহ নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাকে শক্তিশালী করার চেষ্টার মাধ্যমে, যে সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রতিক্রিয়ার জোট সৃষ্টি হচ্ছে তাকে সার্থকভাবে প্রতিহত করার সংগ্রামে।

৪। কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে থেকে কোন বামপন্থী দল যদি তার এই গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কর্তব্য পালন করে তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। যদি কোন গণতন্ত্র প্রিয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তি কংগ্রেসের মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে সার্থক করে তোলার সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করে—তাও অভিনন্দনযোগ্য।

বেশী দিন গেল না, অমল গাঙ্গুলী জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করলেন। হয়ত সাধারণ দৃষ্টিতে এটা খুব অভূতপূর্ব ব্যাপার বলে মনে হল না। কেননা দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে

যেটুকু বুঝেছে তাতে তারা জানে যে কংগ্রেসে যোগদানের অর্থ একটিই। রাজনীতির নামে একটি নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় করা, যেখানে একবার জাঁকিয়ে বসতে পারলে গাঁয়ে না মানলেও মোড়ল হওয়া যায়, যোগ্যতা না থাকলেও নেতা বা কর্তা সাজা যায়, সরস্বতীর সঙ্গে সারাজীবনের বিবাদ থাকলেও লক্ষ্মীকে সোনার থালায় বরণ করে বাড়ীতে বসান যায় অল্প চেষ্টাতেই। অমল গাঙ্গুলী কি তার ব্যতিক্রম? সম্ভবত বামপন্থী দলে পাত্তা না পেয়েই বা স্থান হারিয়েই তিনি এখন আবার নেতা সাজার লোভে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। এবং এ-কথা কে না জানে যে অমল গাঙ্গুলীর মত একজন লোককে পেলে কংগ্রেস মাথায় তুলে নাচবে। বিশেষ করে বাগনান অঞ্চলে, যেখানে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন নেতার চরম দুর্ভিক্ষ।

কিন্তু তাঁর গভীর দেশপ্রেমের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকলেও একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা যে, নিতান্ত নেতৃত্ব অথবা নিরাপদ রাজনৈতিক আশ্রয়ের লোভে তিনি যোগদান করলেন কংগ্রেসে। তাহলে সে সুযোগের জন্যে এত দীর্ঘ অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল না। অমল গাঙ্গুলীর মত একজন স্বনামখ্যাত কর্মীর জন্য কংগ্রেসের দরজা চিরদিনই খোলা ছিল। মনে রাখা দরকার ফাঁকির বদলে, মহত্ব বা নেতৃত্ব অর্জনের চেয়ে সত্যনিষ্ঠা ও আত্মনিষ্ঠার বদলে আপাত-দুর্নাম ও অখ্যাতিকে দিয়েই বেশী প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন সারাজীবন।

রাজনৈতিক অভিমন্যু নন

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন "অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ খুলিবার বিদ্যাটা নয়।"

নিজের স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা, জাতিগত সমস্যা ও সংকট, নীতিগত ভেদ-বিভেদকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে কিংবা সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন না হয়ে নিছক যে কোন একটি দলের ধ্বজা বয়ে বেড়ানই যেখানে সাধারণভাবে রাজনীতিজ্ঞ সাজার প্রথা, সেখানে অমল গাঙ্গুলীর এই জাতীয় এক দলের গাঁঠ খুলে অন্য দলে যোগদান যদি অপযশ ও অপপ্রচারের বিষয় হয়ে ওঠে—সেটা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সান্ত্বনার কথা এই যে, আমাদের দেশে হৃদয়বান ও বিবেকবান মানুষ আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সুতরাং তাঁরা যে এই ঘটনাকে কি চোখে দেখবেন তা আমরা জানি। কারণ তাঁরা জানেন যে একমাত্র নীতিগত বিভেদ এবং দেশগত উন্নতির প্রবল ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অমল গাঙ্গুলীর এই দল ত্যাগের পিছনে অন্য কোন

কারণ নেই, থাকতে পারে না। তাঁরা জানেন অমল গাঙ্গুলীর ব্যক্তিগত কোন জীবন নেই। অবিবাহিত, সুতরাং সংসার নেই। সাজসজ্জার বালাই নেই। যখন যেখানে যা জোটে তাই খান। সন্ন্যাসীতুল্য জীবন। এমন কি নিজের জীবনের প্রতিও মমতা নেই।

গত বছরের কথা। দেশ অন্নহীন। রেশন চালু হয়েছে বটে, কিন্তু তার কোন নিয়মিত বণ্টন ব্যবস্থা নেই। অনাহার, উপবাসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সারা দেশ। তার কয়েকমাস মাত্র আগে টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে সামান্য সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন নবাসনে, যেখানে তাঁর নিজের গড়া 'আনন্দ-নিকেতন'। দেহ তখনও অক্ষম। ডাক্তারের নির্দেশ ছিল চেঞ্জে গিয়ে অবসর গ্রহণ। অর্থাভাবে তা হয়ে ওঠেনি। এই সময়ে বাগনান কলেজের একটি ছাত্রকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করল। শ্যামপুরে বাড়ী; নিজের বাড়ীর চাল। বাগনানে তখন রেশন বন্ধ; বাজারে চাল মিলছে না—কেনা-বেচা নিষিদ্ধ। ২ কেজির বেশী চাল বহন আইনের চোখে বেআইনী। তার অপরাধ তার কাছে ৩ কেজি চাল পাওয়া গেছে। ছাত্রটির প্রতি এই সামান্য অপরাধে নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে অমল গাঙ্গুলী দুর্বল শরীরেও ছুটে এলেন থানায়। তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করলেন এই জাতীয় লঘু পাপে গুরু দণ্ডের অবিচারকে। থানা কর্তৃপক্ষের সংগে প্রবল তর্ক-বিতর্ক ও উত্তেজিত প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত ছাত্রটিকে তিনি মুক্ত করলেন। কিন্তু তারপরেই নিজের আবাসে ফিরে গেলেন না। গভীর রাতে, কাউকে না জানিয়ে, কোনরকম প্রচার বা ঘোষণা না করেই প্রচণ্ড শীতের রাতে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে জরাজীর্ণ শরীরে শুয়ে পড়লেন থানা প্রাঙ্গনের পাশে। ঘটনাটার জানাজানি শুরু হল পরের দিন সকাল থেকে। রেশনে মাথা পিছু ১ কেজি চাল ও থানা কর্ডন প্রত্যাহারের দাবীতে তিনি অনশন গ্রহণ করেছেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা তল্লাটে। বিকেলের দিকে থানা-প্রাঙ্গন ভরে গেল জন-সমুদ্রে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে এসেছে তাদের নিজের মানুষের সংগ্রামে অংশীদার হয়ে সংগ্রামকে অভ্যর্থনা জানাতে। সংগ্রামকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাগনানে অনুষ্ঠিত হল সর্বাত্মক হরতাল, দোকান-পাট, ট্যাকসি-বাস, স্কুল-কলেজ বন্ধ হল সব।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অবস্থা একসময়ে যখন এমন সঙ্গিন ও সংকটজনক হয়ে উঠল—ডাক্তাররা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠল তাঁর জীবনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে, তখনও তাঁকে হাজার হাজার মানুষের কাতর অনুরোধেও নিবৃত্ত করা গেল না। এই ভাবে কাটল একটা পুরো দিন। পরের দিন সন্ধ্যায় তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন, জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষ এসে তাঁকে

মৃত্যুর পূর্বে কদিন উডবার্ন ওয়ার্ডে বসে লেখা :

অসুখের কবিতা

এক

মর্গের অনতিদূরে শুয়ে আছে সবুজ স্ট্রেচার।
গাছে গাছে জুড়ে যাওয়া ছায়ার কিনারে
স্ট্রেচারে যে শুয়ে আছে তার শরীরের সবটুকু খালি।
তবু সে আকাশে দেখে রাতের চাঁদের সরু ফালি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

দুই

কমপিউটারে আঁটা এক মেশিনের বোতাম টিপতেই
অন্য এক মেশিনের গর্ভে ঢুকে গেল সে তক্ষুনি,
অন্ধ হিম গুহা-গর্ভে বন্য শব্দে যত আক্রমণ
তত তার সর্বাঙ্গে সর্বনাশ থেকে আলো ফোটে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

তিন

এই হাসপাতাল তাকে আরোগ্যের আশ্বাস দিয়েছে,
অতিথিশালার সব দরজা জানালা খুলে দিয়ে
আলো ধোওয়া বারান্দায় আভিজাত্য বিছিয়ে দিয়েছে।
ক্ষৌরকর্মে ক্ষৌরকর্মে সে কিন্তু এখনও প্রবাসেই।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

চার

কেউ এক্স-রে নিতে বললে পাঁজরে বিদ্যুৎ ঝাপটা মারে।
ওখানেই গুপ্তধন, রক্ত শতদলের আড়ালে
সহস্র গোপন চিঠি, অবৈধ সাক্ষাৎ, স্বপ্নমালা।
মেঘবতী চুল সহ এক্স-রে-তে ধরা পড়বে না তো?

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পাঁচ

সারা রাত পাখি ডাকে এইখানে স্বতঃস্ফূর্ততায়।
রুগিদের বেডে বেডে যেন লম্বা ঘুমের চাদরে
নকসা এঁকে দিতে চায় মমতা মাখান শব্দ বোলে।
পাখিরা যখন চুপ, রুগি জাগে, মৃত্যু শব্দ জাগে

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন—এ ব্যাপারে তারা অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

অমল গাঙ্গুলীর সেই প্রচণ্ড প্রতিবাদ আন্দোলন সেদিন বাগনানের অন্নক্লিষ্ট মানুষের জীবন আংশিকভাবে হলেও সংকটমুক্ত করেছিল।

লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কলেজী বিদ্যার মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বড চাকুরী ও বিপুল অর্থাগমের যে সম্ভাবনা যৌবনে দেখা দিয়েছিল, তাকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি কোনদিন। নীচুতলার মানুষের মধ্যেই কেটেছে তাঁর রাজনৈতিক ও সমাজ সেবার জীবন। তাদের মধ্যে আজও রয়েছেন। কোনদিন ভয় মানেন নি; দুঃখ, দারিদ্র, অনাহার, অপমান, নির্যাতনে। ভ্রুক্ষেপ করেন নি লোকনিন্দা ও অপপ্রচারকে। কিছু মানুষের কাছে তিনি আতংক ও বিষময়। কিন্তু বহু মানুষের কাছে তিনি ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত। কর্তব্যে তিনি অটল। আপন শক্তিতে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। নিজের বুদ্ধি ও বিবেকের প্রতি তিনি আস্থাশীল। পার্টির চেয়ে দেশ তাঁর কাছে অনেক বড়। আপাতঃ সুবিধার কিংবা লোকপ্রিয় হবার মোহে নিজের সত্যকে তিনি কোনদিন বিসর্জন দিতে শেখেন নি। এই হচ্ছে অমল গাঙ্গুলী। শীর্ণকায় এই মানুষটিকে আমরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি। কখনো শান্ত, কখনো অস্থির, কখনো নীরব সাধক। কখনো প্রচণ্ড সংগ্রামী। সব সময় মনে থাকেনা ইনি কোন্ দলের বা কোন্ মতের লোক। এমন কি সেই মত বা সেই দলের সংগে আমাদের সম্পর্ক না থাকলেও, আমরা অমল গাঙ্গুলীকে ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। সমালোচনা করেছি, বিরূপ হয়েছি; কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার বাধ্য হয়েছি তাঁকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে।

এর কারণ একটাই।

দেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যেই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর সমগ্র জীবন।

ছয়

সূর্য প্রণামের জন্যে মহা সমারোহে যে জাগে
পাখির আকাশ, অমনি রোগ শয্যা ঠেলে উঠে বসি।
মানুষের শৃঙ্খলিত ভাষা বুঝতে পারবে না বলেই
পাখিদের বলি শুধু, তাঁকে বোলো প্রণত হয়েছি।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সাত

কার্টিনাইজারে মজা মাঠে আজ আর পাখিরা চরে না
প্রভূত ফলন চেয়ে সাহিত্যের সৃজনের মাঠও
প্রতিদিন মজে যাচ্ছে। মূলত ভাষার অত্যাচারে
বইমেলা পুড়ছে, ভাসছে সংযোগের সড়ক ও বাঁধ।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

আট

দ্যুতির মুকুটে সাজছ। দেখছি কিন্তু দেখতে দিল না
সন্ধ্যের হিমেল হাওয়া মুড়ে দিল রোগের খাঁচায়।
তুমি সাজো, তুমি সাজো, আকাশ গোলাপ হয়ে যাক
আমার গহ্বর ঠিকই ভরে নেব কুসুম চয়নে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

নয়

স্ট্রেচার বাহিত আমি হাসপাতালের বাঁকা পথে
এই নিদারুণ যাত্রা সেও এত নিরাময় পাবে
ভাবিনি, রঙিন ছাতা খুলে দিচ্ছে সহযাত্রী গাছ
আকাশের থেকে নেমে আকাশ মায়ের মত কাছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

দশ

রক্তের পাতকোর মধ্যে নেমে যাচ্ছে স্ক্যানার চালিত
ডুবুরি নিভৃল। বলি, শোন তুই কোথায় যাচ্ছিস।
অনুপমা ত্রিবেদীর মত কোন রাজরাজেশ্বরী
অতলে ঘুমিয়ে আছে দেখলে কিন্তু চেঁচিয়ে জাগাবিনা।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

এগার

একটি রক্তের বিন্দু ক্রমশ ব্লো-আপ করে গেলে
হিন্দুকুশ পর্বতেরও এপার ওপার দেখা যাবে
খোঁড়া তৈমুরের ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে, আলেকজাণ্ডার
আসছেন, সে ধুলো সবলে মৃত্যু স্তব্ধ করে তুলবে হিরোসিমা
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭.

বার

চওড়া সাদা খামখানা কাল হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন
এক্স-রে প্লেটে, এই মাত্র ব্লাড রিপোর্ট ঢুকলো সেখানে।
রক্তে কি যে পাওয়া গেছে না-বলে ডাক্তার চলে গেল
রক্তে বড় ভয় এলে রক্তকরবীর ছবি আঁকি
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

তের

এহ মাত্র শুরু হল লক্ষ কণ্ঠে উৎসবের গান
অবাক সিমফনি এসে ভরে যাচ্ছে উর্মিমালায়
বহু ছাপাখানাতেই সুশিক্ষিত বর্ণমালা নেই।
এই সব পাখিরাই বইয়ের হরফ হত যদি
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

চৌদ্দ

পূর্ণতা কেমন দেখতে? গোল নাকি ডিমের ওভাল
নাকি চৌকো? অথবা ত্রিভুজের খেয়ালি বিন্যাস?
রক্তিম চণ্ডাল হেসে শ্মশানে ফোটায় লাল আলো।
কেউ কেউ ভাঙে, বলে পূর্ণতার এক নিয়ত নির্মাণ
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পনের

সামগ্রিক খাম দিয়ে মানুষ গড়েছে পৃথিবীকে।
যতটা রূপালী হলে ভাল হত ততটা সে নয়,
তবু তার নিঃশ্বাসের স্পন্দন এমনই সংক্রামক
প্রত্যেক মানুষ গড়ছে নিজেরও পৃথিবী একখানা।
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

ষোল

কুয়াশা রয়েছে ঘিরে এখনও পি. জি-র পিঠ পেট,
অপরিকল্পিত ছন্দে গাছ থেকে নাচে কাক,
কৃপণ হাতের ছোঁড়া আলো পাচ্ছে এখান ওখান।
যে জাগার পথ এইবার খুঁজেপেতে নেবে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সতের

জেগে আছি, তবু যেন ঘুমেরই ভিতরে হাঁটাহাঁটি
ঘুমানোকে চিরে চিরে পুরোপুরি জেগে উঠবার
প্রেরণারও কাছাকাছি চলে আসি কখনও কখনও।
অতর্কিত-অনুভব গুচ্ছে গুচ্ছে ফলে আর ঝরে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

আঠার

এই রোদ তুলে নাও, একে যেন বর্ম মনে হয়
ধাতুর ক্ষমতা দিয়ে এ যেন আমার সুস্থ শ্বাসে
প্রতারণা মেশানর মেফিস্টোফেলিস। কিছুদিন
নিভৃত নির্মাণ ছায়া এরকমই জড়িয়ে থাকুক

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

উনিশ

ঘুমের একটাই দোষ, নিয়ে যায় ফিরিয়ে আনেনা
কতবার নীল নদে, মহেঞ্জোদারোয়, হরপ্পায়,
এমন কি-পার্থেননে, সোফেক্লিস মন্দ্রিত সন্ধ্যায়
হয়ত বা আরো দূরে নিয়ে গেছে। হারিয়ে গিয়েছি।

১ মার্চ্চ ১৯৯৭

কুড়ি

বারান্দায় পড়ে থাকা হাসপাতালের ফাঁকা বেডে
চড়ুই দম্পতিরা দুবেলাই লুকোচুরি খেলে।
ভালবাসাবাসি করিবার নিরাপদ ঠাঁই
পেয়ে গেছে ওইখানে। ভেস্ত বস্তি সরানর পর।

১ মার্চ্চ ১৯৯৭

একুশ

কখন শিয়রে এসে হাত দিয়ে ছুঁয়েছ কপাল।
বুঝিতে পারিনি। পেলে তৎক্ষণাৎ জেগে উঠতাম,
বছর কুড়ির মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরা সরে গেল।
সাত সূর্য জ্বলে উঠত। পুনরায় সেই স্পর্শ আলো।

১ মার্চ্চ ১৯৯৭

বাইশ

এও তত দূর নয় আরো দূর গানের শিখরে
দোলাচ্ছ পল্লব ছায়া। পৌঁছাতেই হবে ওইখানে।
কী করে পৌঁছব? এই ঢালু পথে রক্তক্ষরণের
কোটি কোটি কাঁটা। তুমি রক্ত ফল এত ভালবাস!

১ মার্চ ১৯৯৭

তেইশ

বাহিরে রয়েছে পড়ে শতাব্দীর সমস্ত সকাল।
বাহিরে এখনও জ্বলছে নিখিলের সব মোমবাতি।
আমি শুধু এইখানে ছোট্ট একটা কৌটার ভিতরে,
আমার ভিতরে শুধু ভাসমান ছলাৎ ছলাৎ।

২ মার্চ ১৯৯৭

চব্বিশ

গোধুলি-রেখার পথে পড়ে আছে প্রয়াত সূর্যের
কয়েকটি হাড়ের টুকরো, আর নদী জলে কিছু লাল।
দূরের আকাশ দ্রুত মুছে নেয় বাকি রক্ত দাগ।
মহা বিনাশের পটে সন্ধ্যা নামে এয়োতির সাজে।

৩ মার্চ ১৯৯৭

পঁচিশ

জড় ভরতের মত এই থাকা। স্বেচ্ছা উপার্জন
তোমাদের দোষ নেই, তোমরা শুধু রুটি সেঁকবার
যখন যেটুকু তাপ প্রয়োজন সেঁকে নিয়ে গেছ,
নড়বড়ে উনোনে যে জ্বালতে হবে কাঠ-খড়ের আঁচ।

৯ মার্চ ১৯৯৭

ছাব্বিশ

আমার ঘুমের থেকে তাকে যদি কেউ না জাগায়
কোঁচকান কাল চুল সিঁড়ির অতল ধাপে ধাপে
নেমে যেতে যেতে যদি অকস্মাৎ হাতে পেয়ে যায়
অমরাবতীর রাত, সম্ভবত সে আর ফিরবে না।

৯ মার্চ ১৯৯৭

সাতাশ

বাইরে যে পৃথিবীকে রেখে আমি এখানে এসেছি
সেই পৃথিবীর শ্বাস, সেই পৃথিবীর ত্রাস, প্রাণ
নিমেষবিহীন তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জাগিয়ে
আমার ঘুমেও জ্বলে পৃথিবীর শহর পাশেই।

১০ মার্চ ১৯৯৭

আঠাশ

মাদল বাজিযে চলে গেল পথিকেব ঝাঁক
অনুকরণের লোভে অধিক কর্কশ হল কাক
শূন্যতা আকাশময়, শিবের চোখের ছায়া নীল,
ঘুমোতে ঘুমোতে খুঁজি—কৌটা যাতে সূর্যের আবির।

১০ মার্চ ১৯৯৭

ঊনত্রিশ

কি দেখছ আমার মুখেব জ্বর নাকি অতিরিক্ত জরা ?
তুমি যদি খুশী হও এ কাঠাম আরো চূর্ণ করে
উপহার দিতে পারি। কিন্তু তার বিনিময়ে চাই
রক্ত স্রোত অবিচ্ছিন্ন ও উদ্দীপ্তির বিদ্যুৎ-প্লাবন।

১০ মার্চ ১৯৯৭

ত্রিশ

ব্যাঙ্কেটের লাল রঙে প্রতারিত হয়েই হবে বা
একটি সমুদ্র কাঁকড়া সপ্তসমুদ্র পেরিয়ে এখন
আমার এ অসুখের বিছানাকে দখল করেছে
আদিম মাতার মত রূপ তার, স্নেহে ভাবময়।

১০ মার্চ ১৯৯৭

একত্রিশ

আজ বেশ ঘুম হল, স্বপ্ন কোন দরজা ভাঙল না।
বিস্তৃত মাঠের স্বচ্ছ সবুজ আলোর মত ঘুম
কে যেন শিয়রে ছিল, সারারাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছিল।
মা তোমার করস্পর্শ এতদিন পরেও পেলাম।

১০ মার্চ ১৯৯৭

বত্রিশ

শ্রমের উল্লাস থেকে তুমি যদি সরাও আমাকে
গলার এসব মালা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলে দেব
ডেকে যাচ্ছে রেল গাড়ি ডেকে যাচ্ছে পথ ও পাতাল
দ্রাঘিমা রেখার দিকে অগ্নিবর্ণ অন্ন কিছু পেতে।

১১ মার্চ ১৯৯৭

তেত্রিশ

কেবল ঘুমেরই জন্ম এইখানে সব পেতে রাখা
সে ঘুমও সহজ নয়, খোঁচা খোঁচা কাঙ্গারুর লাফ।
তবু যখনই বসেছি ছিপ নিয়ে
রুই-মৃগেলের মত রূপবান আলো লাফিয়েছে।

১১ মার্চ ১৯৯৭

চৌত্রিশ

প্রহর শেষের আলো, দেবে নাকি উপঢৌকন
শুকনো জলে নবীনতা কালের মঞ্জরী-মাখা-হাওয়ার
সব সরুতারে মানুষের ভীষণ রোদন
ভাস্কর্যের মত স্থির, একটু বাজিয়ে দিয়ে যাই।

১১ মার্চ ১৯৯৭

পঁয়ত্রিশ

বিন্ধ্যাচল কবে থেকে মাথা নিচু করেই রয়েছে।
দুর্দান্ত লেটার মার্কস বশিষ্ঠের কাছে পেতে চেয়ে
যত বলি স্বাধীনতা, যত উড়ি মরিয়া মরাল
মাথার ভিতরে এক মরিয়া বক্তৃতা বুনে চলে।

১১ মার্চ ১৯৯৭

ছত্রিশ

ছোট পাতা কচিপাতা হলুদে সবুজে যে কটি পাতা
শিশু শ্রমিকের মত রোদ্দুরে কুড়োচ্ছে মুঠো মুঠো
এই উপার্জন নিয়ে পিতা ও মাতাকে খাওয়াবে।
ওদের উল্লাস দেখে রক্তে নাচে ঘোড়ার কেশর

১২ মার্চ ১৯৯৭

সাঁইত্রিশ

এখনো ধূসর ছাপ রাজ মুকুট পরেনি আকাশ
গানের টুকরো দিয়েও মিহিদানা সুর-বোল দিয়ে
পাখিরা কুলকুচি করছে, দাঁত মাজছে, ধুচ্ছে পালক
দু-একটা পাখিই শুধু পুরবীতে গলা সেধে যায়।

১২ মার্চ ১৯৯৭

আটত্রিশ

অরুণ মিত্রর কাছে যেতে কোন ঠিকানা লাগেনা।
যে কোন গাছের কাছে গেলেই তা জানা হয়ে যায়।
যে কোন বাতাস বলবে, ওই তো সূর্যের পাশে বসে
জলুনি-পুড়ুনি নিংড়ে হো হো হাসি হেসে চলেছেন।

১২ মার্চ ১৯৯৭

উনচল্লিশ

আয়রণ কার্টেন থেকে গ্লাসনস্ত, এই প্রেক্ষিতেই কি
রক্ত করবীকে দেখলে অন্য কোন মানে মনে আসে?
কেবল স্থাপত্য ভাঙছে, জাল ছিঁড়ছে, খসছে মুখোশ
পরাক্রান্ত রাজা শেষ দৃশ্যে দেখে পরাজয়ে ঘেরা।

১২ মার্চ ১৯৯৭

চল্লিশ

মরতে এসেও মরতে পারল না এ অসুখী বেড়াল
রোঁয়ায় ফুলছে পুনরায় শাদা-কাল ডালিমের ডুরে
নখ দিয়ে খুঁটে চলছে পৃথিবীর প্রকৃত পরাগ
আকাশ আঁকছে চোখে অঙ্ক কষছে মহালুণ্ঠণের।

১২ মার্চ ১৯৯৭

একচল্লিশ

এ এক মজার যাত্রা। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে পড়ে থাকা
মাটির উপর স্বয় গৃহযুদ্ধে কাঁপুক জলুক
তুমি সে সংবাদ পাবে, কিন্তু গায়ে আঁচটি লাগবেনা
আমার স্টেনগান নেই, কিন্তু আমি আক্রমণ জানি।

১৩ মার্চ ১৯৯৭

বিয়াল্লিশ

মাঝ রাতে মনে হল কোথাও বাজছে ভীষ্মদেব।
আলোকলগনে জাগো। মন্ত্র ধ্বনির মত ঘোরে
তলিয়ে ছিলাম গাঢ় হিমের জঠরে দিকহারা
আলোকলগনে জাগো। আমি তারও আগে জেগে উঠি।

১৩ মাচ ১৯৯৭

তেতাল্লিশ

রূপনারাণের কুলে প্রান্ত কালে তাঁর জেগে ওঠা
এমনই উদ্ধার যেন কোনদিন সাপের কামড়ে
অথবা বাঘের নখে চিরে যায়নি চেতনা প্রদেশ।
কোথাও উত্তর নেই। উন্মোচনে তিনি স্থির।

১৩ মার্চ ১৯৯৭

চুয়াল্লিশ

জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে ঘরে ফিরে আসার মতন
মনে হয় দিনগুলো। বিষ গেছে আতঙ্ক মরেনি।
ক্ষমার স্বর্গীয় মূর্তি ডাকঘরের রাজার পোশাকে
পাশে এসে বসতেই গায়ে অন্য ভুবনের আলো।

১৩ মার্চ ১৯৯৭

পঁয়তাল্লিশ

সময়ের আভা আছে ধুপের গন্ধের সঙ্গে মিশে
সময়ের স্রোত কিন্তু লিয়রের মত উন্মাদ
সময়ের বাটি থেকে খুঁটে খাচ্ছি মুড়ি মুড়কি রোদ
সময়ের গর্তে কিন্তু আক্রোশের কোটি কোটি পাক।

১৩ মার্চ ১৯৯৭

ছেচল্লিশ

পরজন্মে পৃথিবীতে আসি যদি আসব এমন
ব্ল্যাক হোলের পথ ধরে। রমণীর গর্ভও ব্ল্যাক হোল
কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফি সমস্ত রহস্য বলে দেয়।
মহাকাশ পৃথিবীর রহস্যের শ্রেষ্ঠ পাঠাগার।

১৩ মার্চ ১৯৯৭

সাতচল্লিশ

স্ফটিক দীপ্তির নারী শেষ কবে হত্যা করেছিলে?
ভস্মশেষ থেকে জেগে দেখি তুমি ঠিকানা বদলেছ।
ফিরে যাই সেইখানে, সেই লাল হ্রদের কিনারে
যেখানে সূর্যাস্ত মেঘে প্রথম ছোবল মেরেছিল।

১৪ মার্চ ১৯৯৭

আটচল্লিশ

চিতোর দুর্গের মত দুর্ভেদ্য ঘুমের অন্ধকার।
নিরেট দেওয়াল একটা, সামান্য পেরেকও পোঁতা নেই
টাঙাব মনের ছবি। তুলি কালি নিয়ে তবু জেগে
অবিকল গগনেন্দ্রনাথ ঘুমের গহন তলে।

১৪ মার্চ ১৯৯৭

উনপঞ্চাশ

এখন কাঠাম থেকে বেরিয়ে পড়েছে দড়ি খড়
অতএব তাঁবু তোল, সামিয়ানা গুটিয়ে পালাও—
সন্ধ্যারতি থেমে গেল। শেষ পাখি সুদূরে উধাও।
এ রকম সময়েই মানুষ নিঃসঙ্গ হতে শেখে।
এ রকম সময়েই মানুষ একাকী হয়ে গিয়ে
শ্বাস সুদ্ধ পৃথিবীর মাটিকে গোপনে আঁকড়ায়।

১৪ মার্চ ১৯৯৭

পঞ্চাশ

ইনজেকশনে ইনজেকশনে শরীরে হাজারখানা ফুটো।
তবু ভাল, ইনজেকশনই ভাঙা নৌকা জোড়েজাড়ে দিয়ে

বলছে ভাসিয়ে দেবে রূপনারাণের স্রোতে ফের।
এবার ভাসলে আগে সেরে আসব সমুদ্র-প্রণাম।
১৪ মার্চ ১৯৯৭

একান্ন

ছুটে ছুটে ভয়াবহ যে অরণ্যে থামল শিউরে উঠি।
এখানেই বুঝি দান্তের নরক যাত্রা শুরু হয়েছিল এইখানে
১৪ মার্চ ১৯৯৭

বাহান্ন

উডবার্নে জলছি আমি ঠিক উডবার্নেরই মতন।
হয়ত শুকিয়েছে বলে হাড়ে হাড়ে জলছে দাবানল
ডাক্তার। কোথায় ছিল এই সব আগুনের কণা;
আমারই হাপরে? এরা আমারই নিজস্ব উৎপাদন?
১৫ মার্চ ১৯৯৭

তিপান্ন

যন্ত্রণার আদি পর্বে ঘুম ছিল রঘুপতি-ঘুম
রুদ্রাক্ষে রুদ্রাক্ষে জলে রক্তপায়ী খড়্গের ঝলক
উপশম হতে হতে ঘুম ক্রমে জয়সিংহ-ঘুম
শান্তিজল ছিটিয়েছে। আর রক্তে ক্রন্দন বাজে না।
১৫ মার্চ ১৯৯৭

চুয়ান্ন

যা কিছু জমায় বাড়ে চাদরেই রয়েছে তৃণমূল
তৃণমূলে রয়ে গেছে উত্থানের স্বপ্ন ও সুখ।
যে কোন একটা ছবি, রেখাচিত্র যা তোমার প্রিয়
ব্যাবিলন, ইজিপ্টের কিউনিফর্মে পারে তৃণমূল।
১৬ মার্চ ১৯৯৭

পঞ্চান্ন

স্বপ্নকে বিশাল করে দাও আরো, তাকে উড়তে দাও,
তাকে বল অশ্বমেধ যজ্ঞ জয় করে ফিরে এস।
যত দিন যাচ্ছে তুমি কুঁকড়ে যাচ্ছ আপন বিবরে
জান না তোমাকে খুঁজছে ময়দানের বিজয়-উৎসব?
১৬ মার্চ ১৯৯৭

ছাপান্ন

পোড়ে মন্দিরের গায়ে প্রতিমা দ্যুতির টেরাকোটা
সংকলিত হয়ে আছে, এখনও এ প্লাবন দিনেও।
জানি কেউ খুলবে না শিরস্ত্রাণ, সকলেরই ঘোড়া
টগবগ চলে যাবে। টেরাকোটা হাসবে সারারাত।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

সাতান্ন

প্রত্যহ নতুন জন্ম। প্রত্যহ নতুন এক আমি
বুঝছি নিজেকে এর আগেকার সহস্র জন্মের
শিকড়ের আলো থেকে পাওয়া সরু জরির সুতোয়
যত ছিঁড়ি নক্ষত্রকে ততই জামদানি নকশা বাড়ে।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

আঠান্ন

জানি সে শিয়রে আছে, আমি তার কোলে শুয়ে আছি
কলার মান্দাস চলছে গন্তব্যের একনিষ্ঠতায়
সাঁতালি পর্বত, বিষ, বৈধব্যকে ভাসিয়ে ভাসিযে।
বৈকুণ্ঠের দিক থেকে ওই তো আলোর শাঁখ বাজে।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

ঊনষাট

বুকের ভিতর দিয়ে খেলে যায় দু'রকম হাওয়া।
মেঘের হাওয়ায় ঝরে ভিজে ভিজে আঁধার যেমন
রোদের হাওয়ায় ডাকে মহাসমুদ্রের মগ্ন স্নানে
আমার গুহায় আজ গান ফুটছে আশাবরী রাগে।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

ষাট

জানলাটা খুলে দাও, আলোরা বসুক বিছানায়
আলোরা শুনিয়ে যাক ভুলে যাওয়া আরব্য রজনী
কত কি যে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ক্রবাতুর রীতি
ও লাল ভোরের আলো, আজ একটু আজান শোনাও।

১৬ মার্চ ১৯৯৭

একষট্টি

মহাকাশের নীচে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
বজ্র ও বিদ্যুৎ যদি কেবলি শাসন ছুঁড়ে মারে
সে ক্ষত চিহ্নকে আমি রুমালে আড়াল করব না
নদী পার হয়ে যাব উল্কাপাত কুড়াতে কুড়াতে।

১৭ মার্চ ১৯৯৭

বাষট্টি

আমার শ্রাবণ-গাথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল আজো
চৈত্র ও বৈশাখে এত জীর্ণ হয়ে এল প্রাণ-কণা ;
পালকেরা খসে খসে পিণ্ডাকার মাংস করে দিল
সোনার মন্দির। জ্বালো আর একবার পঞ্চপ্রদীপ।

১৭ মার্চ ১৯৯৭

তেষট্টি

যেত জানি দাগি বাস্তু সাপ
পুরান বাড়িটা তোমরা পুরো ভাঙবে নাকি ?
গাঁইতি আর শাবলের অদম্য উৎসাহে ভিত কাঁপে
ভিতেরই ভিতরে ক্ষয়।
সিমেন্টে কংক্রিটের হাসপাতালে পাঠালে বাঁচবেনা।

১৭ মার্চ ১৯৯৭

চৌষট্টি

একে একে সকলের নাম ডাকা শেষ হ'য়ে গেল
তোমাদের সকলের মালা থেকে প্রকাণ্ড বিভূতি
বিচ্ছুরণ পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমাকেও ডেকো
জোরে নয়, আস্তে ডেকো কখনোকি ঘুমিয়ে থেকেছি
এমন গভীর ফাঁদ—কে আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল
ভাবনা মচকে গেছে, বুকে ক্ষত—সর্বাঙ্গে ব্রণ।
অস্ত্রোপচারের ঠাণ্ডা বিছানায় শুতে যাই
আমার অন্তরতম শত্রুটি গিয়ে বুঝি
আমারই রক্তে শুয়ে।

১৭ মার্চ ১৯৯৭

লোক শিল্প বিদ্যালয়কে .

শুভেচ্ছা

বাগনানের পরেই তো কুলগাছি। যেহেতু বাগনানের ছেলে, তাই কুলগাছি আমার কাছে অপরিচিত নয়। তবে অনেকদিন আসা-যাওয়া নেই। অনুমান করে নিচ্ছি, বদলে গেছে অনেক কিছু। কুলগাছির মানুষ 'লোক শিল্প বিদ্যালয়' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে সেখানে ছবি আর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করছেন জেনে খুবই ভালো লাগলো। শারীরিক কারণে যেতে পারছি না। কিন্তু না গেলেও, আমার আন্তরিক শুভকামনা রইল এই প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্যে।

শুভেচ্ছান্তে
পূর্ণেন্দু পত্রী
২৩/৩/৯৬

পূর্ণেন্দু পত্রী :

মাধবীর জন্যে

আয়নার পাশে একটু অন্ধকার ছায়া এঁকে দাও।
ব্যথিত দৃশ্যের পট জুড়ে থাক চিত্রিত আঁধার।
দেয়ালের ছবিটাকে একটু সরাতে হবে ভাই।
ওটা নয়, এই ছবিটাকে।
জুলিয়েট জ্যোৎস্নার ভিতরে
রক্তে উচ্চকিত তৃষ্ণা রোমিওর উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।
ব্যাস, ব্যাস।
লাইটস্ বার্নিং।
মাধবী, আসুন।
একটা ক্লোজআপ নেব।
এখানে দাঁড়ান, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে প্লীজ।
মনিটার···
মাধবী বলুন—
'কিছু লাভ আছে মনে রেখে ?'

না। অত স্পষ্ট নয়।
আরেকটু নির্জন স্বরে
নিজের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন।
যেন মনে হয়
ওষ্ঠ হতে উচ্চারিত কয়েকটি শীতল বাক্য নয়।
মনে হবে সন্ধ্যাবেলা সারা ধরাতলে
অবসন্ন কুসুমেরা ঝরিতেছে বনবীথিতলে নীরব রোদনে।
মনে হবে নীরব রোদনে
যেন আপনি বলতে চান
মনে রেখো, মনে রেখো সখা,
যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই
মনে আর রাখিবে না।
জ্যোৎস্নার ভিতরে কোথাও আহ্বান নেই আর,
উষ্ণ ওষ্ঠাধর দুটি গোলাপের মহিমায় ফুটে
এখন অপেক্ষমান
কবে পাখি বলে যাবে, রাত্রি হলো অবসান বনবীথিতলে।
দৃষ্টি আরও নত হবে
সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মতো দৃশ্য নাই।
নিবন্ত ধূপের সাদা ছাই
রজনী-পোয়ানো কিছু মৃত গোলাপের দীর্ঘশ্বাস
হাঁ-করা নেকড়ের মুখে দগ্ধ সিগারেট
এইটুকু দৃশ্য শুধু পড়ে আছে কাঠের টেবিলে।
লাইটস্ বার্নিং।
মাধবী, মেক-আপ, আলো,
এবার টেকিং।
মাধবী, নিশ্চয়ই মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু
'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?'

সবুজ সংঘের প্রসঙ্গে

পূর্ণেন্দু পত্রী

সবে বছর খানেক ভর্তি হয়েছি মুগকল্যাণ হাই স্কুলে। ছাত্র হিসেবে ব্যাক-বেঞ্চার। তখন খুব বেশি রাজনীতি বুঝতাম না। যাদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের মুখ থেকে শোনা নিয়ত বিরূপ সমালোচনা শুনতে শুনতে আমার মধ্যেও গেঁথে গিয়েছিল এই বিশ্বাস যে কমিউনিস্টরা বদ্‌লোক। ফলে তেমন কিছু না-বুঝেই আমি কংগ্রেসী। আর সেই সময়ে কানাইপুরের সবুজ সংঘ আমাদের অঞ্চলে বামপন্থী রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। স্কুলের পাশ দিয়েই হেঁটে যায় তাদের প্রতিবাদের মিছিল। তাদের লেখা পোস্টার চোখে পড়ে এদিক-সেদিকে দেয়ালে। তাদের সদস্যরা বিলি করে বেড়ায় 'স্বাধীনতা' নামের দৈনিক। পরে দৈনিক 'কিশোর'ও। যারা এসব করে বেড়ায় তাদের থেকে শত যোজন দূরে থাকাই ছিল আমার তখনকার সচেতন স্বভাব।

এই রকম একটা সময়ে হঠাৎ সবুজ সংঘ আয়োজন করলে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার। বিষয়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র-সমাজের অবদান'। আমি তখন বন্ধুমহলে সবে আত্ম-প্রকাশ করতে চলেছি কবি হিসেবে। ছাপান লেখার সংখ্যা নগণ্য। হাতে লেখা পত্রিকায়ই হাত পাকাচ্ছি মোটামুটি। চাঁদভাগ লাইব্রেরী থেকে বেরয় 'শিখা'। আমার গ্রাম থেকে আমি বের করি 'জাগরণ'। অঙ্ক, ইংরেজি, সংস্কৃত, ভূগোল, বিজ্ঞানে কখনো তিরিশের বেশি নম্বর পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অঙ্কে নয় পেয়ে একবার ক্লাস এইটে আটকে যাই আরো এক বছর। সেই আমি সব শিক্ষকের কাছেই বখে-যাওয়া। কেবল ইতিহাসের স্যার নীহারবাবু ভালবাসতেন প্রায় পুত্রস্নেহে। তাঁকে একদিন ক্লাসে 'টু ড্যাফোডিল'-এর বাংলা অনুবাদ শোনানর পর থেকেই আমার বরাতে ঐ অপ্রত্যাশিত স্নেহ-লাভ। সেই নীহারবাবুই একদিন ছুটির পর আমাকে প্রায় আদেশের ভঙ্গীতে বললেন, পত্রী, তুমি অবশ্যই সবুজ সংঘের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। ভারতবর্ষের ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে আমার জ্ঞান-গম্যি তখন নিতান্তই সীমিত। সম্ভবত বন্ধু সত্যেনের মারফৎ কিছু বই বা পুস্তিকা জোগাড় করেছিলাম রাতারাতি। আবার এমন হতে পারে যে সত্যেন সেগুলো জোগাড় করেছিল সবুজ সংঘ থেকে। সেটারই বেশি সম্ভাবনা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ জমা দিই সত্যেনের মারফৎ। যখন ফলাফল ঘোষিত হল, জানা গেল আমিই প্রথম। আমি বন্ধুমহলে বলে বেড়াতে লাগলাম, কমিউনিস্টদের মিটিঙে গিয়ে কিছুতেই পুরস্কার নেব না আমি। যথাসময়ে আবার নীহারবাবুর নির্দেশ, অবশ্যই যাবে। অতএব গেলাম। পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরে প্যাকেট খুলে দেখি দুখানা বই। একটা রবীন্দ্রনাথের। অন্যটা সুকান্ত

ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'। পরের দিন স্কুলে ফিরে বন্ধুদের কাছে আমার আস্ফালন, সুকান্তর বই আমি ফেরত পাঠাব। ওগুলো কি কবিতা নাকি? আমি তখনও বিশ্বাস করি ছন্দই কবিতার একমাত্র বাহন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পড়ে পড়ে ছন্দের কানটা ছোটবেলা থেকেই ছিল পাকা। কিন্তু নিয়তির মুখে তখন মুচকি হাসি। ফলে একটু একটু করে গদ্য কবিতার রস জারিয়ে যেতে লাগল ভিতরে। সুকান্ত হয়ে উঠল প্রিয় কবিদের একজন। সবুজ সংঘে তখন বছরের নানা সময়ে, নানা বিশেষ উপলক্ষে সাহিত্য সমাবেশ ঘটত। ঐসব অনুষ্ঠানেই আমি প্রথম পরিচিত হই শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখদের সঙ্গে। কবি সাহিত্যিক নন, অথচ মানুষ হিসেবে স্মরণীয় এমন একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঐ সবুজ সংঘেই। তিনি জ্ঞানদা। অর্থাৎ জ্ঞান চক্রবর্তী। তখন ছিলেন হাওড়া জেলার যাবতীয় সাংস্কৃতিক উদ্যোগের অধিনায়ক। কথা বলতেন কম। কানে শুনতেন আরো কম। এমন একটি নরম স্বভাবের মানুষই ছিলেন বশীকরণে অদ্বিতীয়। কী এক আশ্চর্য যাদু জানতেন তিনি। তাঁর মুখের যে কোন উচ্চারণকে সৎ মনে হত বলেই অমান্য করার সাহস পাইনি কখনো। উলুবেড়িয়া কলেজে হাওড়া জেলা ছাত্র সম্মেলনে তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্র সদস্য হিসেবে।

এই ভাবেই ক্রমে আমার এক ভিন্নমুখী বিকাশ। আর তার পিছনে সবুজ সংঘের প্রেরণা ছিল অনেকখানিই।

গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ মিলিয়ে আমার যা-কিছু লেখা, তার মধ্যে যদি কোন পাঠক খুঁজে পান মানুষের প্রতি বিশ্বাস, সভ্যতার ভবিষ্যতে আস্থা, যে কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যে কোন শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা, তাহলে অকপটে স্বীকার করব, আমার চেতনার ভিতরে এইসব বৃহৎ উপলব্ধির বীজ বোনার কাজটা শুরু হয়েছিল ঐ সবুজ সংঘের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যুগে। অন্তরঙ্গতার সূত্রে।

কবে সবুজ সংঘ পা দিয়েছে পঞ্চাশে, খেয়াল ছিল না। যখন সেটা জানান হল এবং জানলাম, নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে উচ্চারণ করলাম এই কথা কটি—

তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কবি নীরদ রায়-কে লেখা পূর্ণেন্দু পত্রীর দুটি চিঠি ঃ

প্রিয় নীরদ, ১৮।৪।৯৪

তোর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তখন খুবই খারাপ মানসিকতায় ছিলাম। মায়ের মৃত্যুর পর নানাভাবেই আমি বিপর্যস্ত। তার উপরে আমার মেজ মেয়ে রূপমা-র অ্যাপেনডিসাইটিস-অপারেশন। সেটা থেকে বেশ জটিল হয়ে যাওয়াতেই বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আজ সকাল ৯টায় ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। এখন একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে। বিকাশ ভবনে। পাশেই ডাকঘর। তাই তড়িঘড়ি তোকে চিঠি লিখতে বসেছি।

অশোক দাশগুপ্তের আমন্ত্রণ তো ছিলই আমার কাছে। আমার ইচ্ছেতেই তিনি রাজী হয়েছেন গ্রাম নিয়ে আমার নিয়মিত লেখা ছাপতে। কিন্তু চাকরি ইত্যাদি নিয়ে কোন কথা হয়নি। আমিও বলিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলতে পারি—

আমি জীবনের সঙ্গে মরণের খেলায় মেতেছি এখন। এবং এই স্বাধীনতার জন্যে দামও দিয়ে যাচ্ছি কড়ায় গণ্ডায়। তবে দুর্বল হয়নি চেতনায়। কাজ করে যাচ্ছি। করে যাব। নানা জায়গায় লিখতে হচ্ছে। লেখাই এখন আমার মূল উপার্জন। যদিও সবচেয়ে ভাল লেখাগুলো যা লিটল ম্যাগ বা প্রতিক্ষণ বা নন্দন ইত্যাদির জন্যে লিখতে হয় ঘাড় গুঁজে সেগুলো কানাকড়িও জোগায় না।

সুনীলের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছিস শুনে ভাল লাগল। আমার কৌতূহল রইল এটা জানার যে, ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তোরা যে উদ্বুদ্ধ হোস্—সেটা কোন জাতের? কোন প্রেরণা অনুভব করলে, তার চরিত্র কেমন।

কেননা···। না থাক্। তোদের মনে হবে প্রফেশনাল জেলাসি। যদিও আমি এসবের অনেক উপরে তুলে রেখেছি নিজেকে।

তপনকে আলাদা চিঠি দিলুম না। বুঝতেই পারছিস এখনো মানসিক অস্থিরতার ঘোর কাটে নি।

তোরা চিঠি দিস।

তোদের সবাইকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা আর ভালবাসা জানিয়ে,

—পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রিয় নীরদ, ১৭।১১।৯৪

তোর চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এমন একটা বড় কাজে মেতে ছিলাম যে, অন্য কোন কিছু করার মত মন ছিল না। কাজটা হল, মাইকেলেঞ্জেলোর কবিতার অনুবাদ। বইমেলায় প্রতিক্ষণ থেকে

ওটা বই হয়ে বেরবে। ওর জন্যেই লিখতে হচ্ছিল দীর্ঘ ভূমিকা। দীর্ঘ জীবনপঞ্জী। প্রায় ১৭।১৮।২০ খানা বই নিয়ে পড়তে পড়তে, নোট নিতে নিতে, লিখতে লিখতে দিশেহারা অবস্থা। কারণ হতালীর ঐ সময়টাকে বিশদ জানা ছিল না কখনো। জানতে জানতে লেখার সমস্যা অনেক। টেনশন আরো বেশি। গদ্য অংশটা সদ্য কোন মতে শেষ করেছি। কবিতার অনুবাদগুলোয় এখনো হাত পড়েনি। তাছাড়াও অন্য আরো কাজ বাকী আছে। এরই মধ্যে জরুরী অন্য দুটো একটা লেখা আর প্রচ্ছদ ছিল।

তোর চিঠিতে বেশ একটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করলাম। এ ব্যাপারে আমার যা বলার তা মুখোমুখি এসে বললে ভাল হত। খানিকটা উৎসাহিত করতে পারতাম হয়ত, যুক্তি দিয়ে, সমালোচনা করে। কিন্তু চিঠিতে সেসব কথা বলা যাবে না। এ-ার সঙ্গে যখনই তোদের কথাবার্তা হয়েছে, তখনই বলেছি, বুঝিয়েছি। শুধু কবিতা লিখে, দুহাজার কবির একজন হয়ে, কোথাও পৌঁছন সম্ভব নয়। পারে দুভাবে। প্রবল প্রতিভা থাকলে। আর কোন কম প্রতিভাবানকে যদি কান পত্র-পত্রিকা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করতে থাকে। তাতে অবশ্য শ্রাখেরে লাভ হয় না কিছু। বানানো প্রতিভা ধরা পড়ে যায়। তোরা বা তুই যেভাবে সাহিত্যচর্চা করে থাকিস তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোদের ধ্বংসের বীজ। আমার বা আমার মত কারো কারো পিছনে মূলত এমন কেউ নেই, যাকে বলতে পারি পৃষ্ঠপোষক, আমি তো জানিই, আমাদের পিঠে মারার জন্যে কোন্ কোন্ শক্তি সক্রিয়। কিন্তু তবুও যে টিকে আছি। খানিকটা গর্বের সঙ্গেই হয়ত বা, তার মূলে আর কিছুই নেই, আছে ভাবনা-চিন্তার জোর। এই জোরটা আছে বলেই অগ্রাহ্য করতে পারছে না প্রতিপক্ষ। অনিচ্ছায় হলেও আমল দিতে হচ্ছে কিছুটা। তোরা তার বদলে, আত্মশক্তি অর্জনের বদলে, কোন বিশেষ পত্রিকা, কোন বিশেষ দাদার কতখানি প্রিয়পাত্র হতে পারবি, তা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছিস বেশী। যত বয়স বাড়বে, জানি, নিঃসঙ্গতা বাড়বে। এইটেই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর সময়। অগ্নিপরীক্ষার সময়। তোকেই উত্তীর্ণ হতে হবে নিজের দাপটে। আমি তোর একান্তই শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই আপাত অপ্রিয় হলেও এই কথাগুলো বলতে পারলাম অকপটে। পরে আবার লিখব। তুই ও তপন আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিস। তোদের একান্ত আপন পূর্ণেন্দু পত্রী

পুনঃ একজিবিশনের দিন হঠাৎ না বলে কয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলি। ভেবেছিলাম ছবি দেখে আমাদের গোল আড্ডায় এসে বসবি। তার পরের দিনও দেখা করলি না। খানিকটা অবাক হয়েছি, তোদের চঞ্চলতাই তোদের পয়লা নম্বরের শত্রু।

সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা :

…শ্রীমানী মার্কেটের ডেরা থেকে চলে গেছি বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ পড়ার নেশা তৈরি হয়নি তখনো। বিকেলের দিকে কোথায় যেন সকালের কাগজটা ওল্টাতে গিয়ে চমকে উঠি। প্রথম পাতাতেই চার-কলমের ছবি। সেনেট হলের সদরদরজা থেকে প্রসন্ন ঠাকুরের প্রস্তর-মূর্তিটাকে দড়ি বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। কেন? কেন? সেনেট হল ভাঙা হবে।

সেনেট হল ভাঙা হবে? ঐ বিশাল স্থাপত্য? ঐ ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্ব? গোটা কলকাতার মাথা যার কাছে নোয়ান? থাকবে না সেনেট হলের সিঁড়ি? মানুষ তাহলে আরোহণ কাকে বলে চিনবে কি করে?

ব্যথায় ঝনঝনিয়ে উঠল বুক। কিন্তু আমি সেনেট হলের কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার সুযোগ পাইনি জীবনে। কী এমন সম্পর্ক, কতটুকুই বা চেনা-পরিচয় যে এতখানি বিচলিত হতে হবে আমাকে? এ-ব্যথা নিশ্চয়ই বাজছে কলকাতার বহুজনের বুকে। নিশ্চয়ই আগামীকালের কাগজে দেখব সারা দেশের শিক্ষিত মানুষের প্রতিবাদ। বিশেষত এখান থেকে সম্মানিত হয়েছেন যাঁরা, তাঁরা তো ফেটেই পড়বেন তীব্রতর প্রতিবাদে। কিন্তু না, পরের দিনটা হয়ে উঠল না বিশেষ কোন দিন। তবে কি এমন হতে পারে যে প্রতিবাদ ঘটেছে ভিতরে ভিতরে? আর সেই প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে গেছে ভাঙাভাঙি। সেই কারণেই সংবাদ নেই সংবাদ-পত্রে। সত্যি কিনা ছুটে গিয়েছিলাম দেখতে। না, বিরতি ঘটেনি কোথাও। পুরোদমেই তোড়জোড় চলেছে ভাঙার।

তাকাতেই, ডস্টয়েভস্কির হোয়াইট নাইটের সেই হালকা গোলাপী রঙের বাড়িটার মতই সেনেট হল যেন ডুকরে উঠল বীরের কান্নায়।

—দেখ, দেখ, ওরা আমাকে হত্যা করছে।

সেইদিনই কিনে ফেলি এক আগফা আইসোলেট ক্যামেরা। আর পরের দিন সকাল থেকে সেনেট হলই হয়ে যায় আমার প্রায় সর্বক্ষণের আস্তানা। প্রথম শাবল গাঁইতির কোপ পড়ছে শিখর থেকে, ভূলুণ্ঠিত পতনে তার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, ওখানেই। ছবির সংখ্যা হাজার পেরোন। বন্ধুবান্ধব ভাঙা সেনেট হলের সঙ্গে দেখতে আসত আমাকেও। তখন সেনেট হলের ভাঙাভাঙির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছি আমি। সুনীল, শক্তি, দীপক মজুমদার, প্রণব মুখোপাধ্যায়, উৎপল রায়চৌধুরী, প্রমুখেরাও এসেছে কয়েকবার। একদিন এল পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী। ওকে বললাম, কাল তুই স্কেচ খাতাটা নিয়ে চলে আয়।

—কেন ?

—তুই স্কেচ করে রাখ কয়েকটা। তুই স্কেচ করছিস, সেটাও তুলে রাখব ক্যামেরায়। যদি কোনদিন সেনেটকে নিয়ে ডকুমেন্টারি করে উঠতে পারি কাজে লাগবে।

ডকুমেন্টারি হয়নি। জীবনের আরো অনেক না-হওয়া কাজের মধ্যে রয়ে গেল ওটাও। এই কল্পনাবিহীন দেশে ভাঙা সেনেটও যে হতে পারে জ্যান্ত শিল্পের বিষয়, সেটা সরকারী মাথা-মাতব্বরদের মাথায় না ঢোকাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়-র জন্যে নিয়মিত ফিচার লিখতে অনুরোধ জানান রমাপদ চৌধুরী। ছবিসহ বেরোত প্রত্যেক সপ্তাহে। প্রায় ছ'মাস। তখনই লেখার চাপে সেনেটের পিছনের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা।

ওটাকে নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বই লিখে দেওয়ার জন্যে অরুণা প্রকাশনীর বিকাশ বাগচী তাড়া দিয়ে চলেছেন সেই তখন থেকেই। প্রায় দু-যুগ লেগে গেল তা শেষ করতে। পুরোপুরি গবেষক হয়ে উঠতে পারিনি কখনো। পারলে হয়ত আরো বহু তথ্য-সমাবেশ ঘটতে পারত এ-বইয়ে।

তবুও, এ-বই যদি ঐতিহাসিক সেনেট হলের বিরাট মহিমার সামান্য কিছুকেও উদ্‌ঘাটিত করে থাকে, সে তিল-তর্পণই আপাতত আমার সান্ত্বনার অনেকখানি।

'সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র' বইয়ের ভূমিকা থেকে নির্বাচিত অংশ।

কুলগাছিয়ায় সমকালীন আয়োজিত পূর্ণেন্দু পত্রীর স্মরণ সভায় শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতলিপি

সমকালীনের আজকের অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দুদাকে স্মরণ করার এই আন্তরিক এবং প্রাণবন্ত এক সভায় আমি আসতে পারায় নিজেকে সত্যিই গর্বিত অনুভব করছি। এবং পূর্ণেন্দু পত্রী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যও সংগ্রহ করলাম। আমার সব থেকে ভাল লাগছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে স্মরণ করতে মনে। যাঁকে আমি কলকাতা শহরে শহুরে পরিবেশে দেখেছিলাম তিনি এই গ্রামাঞ্চলে জন্ম নিয়েছিলেন। কেন, তিনি বেঁচে থাকতে তাঁকে এখানে এই মাটিতে পাইনি, সেটাই আমাদের আফসোশ থেকে গেল।

তাঁর শিল্পী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁকে স্মরণ করে আগামী প্রজন্ম গড়ে উঠুক, আশা রেখে যাই।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
কুলগাছিয়া, ১৯ শে এপ্রিল, ১৯৯৭

পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা :

কবিতা

গ্রন্থের নাম **প্রকাশকাল** **প্রকাশক**

১ একমুঠো রোদ ১৩৫৮ চিত্রিতা
২ শব্দের বিছানা ১৯৭২ অরুণা
৩ তুমি এলে সূর্যোদয় হয় ১৯৭৬ আনন্দ
৪ আমিই কচ আমিই দেবযানী (বাং) ১৯৭৭ বিশ্ববাণী
৫ হে সময় অশ্বারোহী হও (বাং) ১৯৭৯ বিশ্ববাণী
৬ আমাদের তুমুল হৈ হল্লা ১৯৮০ দে'জ
৭ প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ১৯৮১ দে'জ
৮ গভীর রাতের ট্রাঙ্ককল ১৯৮১ নাভানা
৯ কথোপকথন (১) ১৯৮১ আনন্দ
১০ আমরা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে ১৯৮৩ আনন্দ
১১ শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৮৩ দে'জ
১২ হাইকুবানা ১৯৮৬ দে'জ
১৩ জেগে আছি বীজে বৃক্ষে ফুলে ১৯৮৬ প্রতিভাস
১৪ কথোপকথন (২) ১৯৮৭ দে'জ
১৫ বলো ১৯৮৮ প্রিয়শিল্প
১৬ কথোপকথন (৩) ১৯৮৯ দে'জ
১৭ রাধাকৃষ্ণের পদাবলী ১৯৯০ দে'জ
১৮ রক্তিম বিষয়ে আলোচনা ১৩৯৭ দে'জ
১৯ কথোপকথন (৪) ১৯৯২ দে'জ
২০ প্রেমের কবিতা ১৯৯৩ দে'জ
২১ ব্যাধ ভালো আছো ১৪০০ প্রমা
২২ কথোপকথন (৫) ১৯৯৫ দে'জ
২৩ মাইকেল্যাঞ্জেলোর কবিতা ১৯৯৫ প্রতিক্ষণ
২৪ পূর্ণেন্দু পত্রীর ২২টি হাইকুবানা প্রিয়শিল্প

উপন্যাস / গল্প সংকলন

১ দাঁড়ের ময়না ১৯৫৮ সাহিত্য
২ যৌবনকাল ১৯৬৪ লেখাপড়া
৩ মানুষের মুখ ১৯৬৪ ত্রিবেণী

গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক

৪ ভোমরাগুড়ি ১৯৭৭ অনন্যা
৫ মালতীমঙ্গল ১৯৭৭ বিশ্ববাণী
৬ পুঁই পালঙের স্বাদ ১৯৮৩ আত্মপ্রকাশ
৭ মহারাণী ১৯৮৬ দে'জ
৮ ছেলেটি এবং মেয়েটি ১৯৮৮ পুষ্প
৯ স্তলিনের রাত ১৯৯২ দে'জ
১০ পূর্ণেন্দু পত্রীর ছোটগল্প ১৯৯৫ প্রতিক্ষণ
১১ রোদে এবং ঝড়ে ১৯৯৫ করুণা
১২ সেজানের আপেল পচে যাচ্ছে ১৯৯৫ দে'জ

শিশুসাহিত্য

১ আলটুং ফালটুং ১৯৮০ পুষ্প
২ হাসতে হাসতে খুন ১৯৮০ দে'জ
৩ ম্যাকের বাবা থাঁাক ১৯৮২ আনন্দ
৪ ইল্লিবিল্লী ১৯৮৩ পুষ্প
৫ ফটিক টিং ১৩৯১ বুকট্রাস্ট
৬ আমাদের ছেলেবেলা ১৯৮১ এ. মুখার্জী
৭ রামরাবণের ছড়া ১৯৮৬ প্রতিক্ষণ
৮ বাবু সুকুমার রায় শ্রীচরণেষু ১৯৮৭ এ. মুখার্জি
৯ দুষ্টুর রামায়ণ ১৯৮৭ প্রতিক্ষণ
১০ বাবুরাম সাপুড়ে ১৯৮৮ প্রতিক্ষণ
১১ ছবি আঁকার সহজপাঠ (১) ১৯৮৮ এ. মুখার্জি
১২ ছবি আঁকার সহজপাঠ (২) ১৯৮৮ এ. মুখার্জি
১৩ কুষ্টিলতা ১৯৯০
১৪ দুষ্টুর মহাভারত ১৯৯০ আজকাল
১৫ টিনের ঝুমঝুমি ১৯৯১ আজকাল
১৬ জুনিয়ার বোমকেশ জিন্দাবাদ ১৯৯১ দে'জ
১৭ জাম্বো দি জিনিয়াস ১৩৯৯ দে'জ
১৮ যক্ষপুরীর জার্নাল ১৯৯৩ দে'জ
১৯ হীরের টুকরো ১৯৯৫ গ্রন্থরশ্মি
২০ রূপনুকে নিয়ে রূপকথা ১৯৯৬ পুস্তকবিপণি
২১ বহুবচন (সংকলন) আজকাল

প্রবন্ধ ও অন্যান্য

১ অমল গাঙ্গুলী প্রসঙ্গে ১৯৬৭ সুকুমার মিত্র
২ গত শতকের প্রেম ১৯৭৩ ভাবনা
৩ নায়িকা বিলাস ১৯৭৫ বিশ্ববাণী
৪ আসুন বসুন ১৯৭৮ আশা
৫ টপ্পা ঠুংরী ১৯৭৯ স্বরলিপি
৬ রূপসী বাংলার দুই কবি ১৯৭৯ আনন্দ
৭ সিনেমা সিনেমা ১৯৮২ ডি এম
৮ কবিতার ঘর ও বাহির ১৯৮৩ দে'জ
৯ গোলাপ যে নামে ডাকো ১৯৮৫ প্রতিক্ষণ
১০ মোনালিসা ১৯৮৬ প্রতিক্ষণ
১১ সাহিত্যের তাজমহল ১৯৮৭ প্রতিক্ষণ
১২ রেঁাস্তা ১৯৮৮ প্রতিক্ষণ
১৩ কালি কলম মন ১৯৮৯ অন্বেষা
১৪ সিনেমা সংক্রান্ত ১৯৯১ দে'জ
১৫ সাহিত্য সংক্রান্ত ১৯৯৩ দে'জ
১৬ চার্লি চ্যাপলিন ১৯৯৩ প্রতিক্ষণ
১৭ ফেড ইন ফেড আউট ১৯৯৩ আজকাল
১৮ ছবি কবি কবিতা ১৯৯০ প্রমা
১৯ দিনবদলের গ্রাম ১৯৯৪ আজকাল
২০ বঙ্গবাসীর অঙ্গবাস ১৯৯৪ প্রতিক্ষণ
২১ পদ্যপাগলের পাণ্ডুলিপি ১৯৯৫ দে'জ
২২ কিছু মানুষ কিছু বই ১৯৯৬ দে'জ
২৩ শিল্প সংক্রান্ত ১৯৯৭ দে'জ

ইতিহাস

১ শহর কলকাতার আদিপর্ব ১৯৫৫ নতুন সাহিত্য
২ বঙ্গভঙ্গ ১৯৬৯ আনন্দধারা
৩ ক্ষুদ্রপট রুদ্রপ্রাণ ১৯৭০ দে'জ
৪ কী করে কলকাতা হল ১৯৭২ আনন্দ
৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ১৯৭৩ আনন্দ
৬ পুরনো কলকাতার কথাচিত্র ১৯৭৯ দে'জ
৭ কলকাতার রাজকাহিনী ১৯৭৯ আনন্দ
৮ ওদের চোখে মোদের ভারত ১৯৭৮ সচ্চিদানন্দ

৯ কলকাতার গল্পসল্প ১৯৮৪
১০ এক যে ছিল কলকাতা ১৯৮৫ প্রতিক্ষণ
১১ কলকাতার প্রথম ১৯৮৬ দে'জ
১২ জোব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৮৬ এ. মুখার্জি
১৩ সেনেট হলের স্মৃতিচিত্র ১৯৮৭ অরুণা
১৪ কলকাতা কলকাতা ১৩৯৬ এ. মুখার্জি
১৫ পুরনো কলকাতার পড়াশোনা ১৯৯০ দে'জ
১৬ তুলি কালির কলকাতা ১৯৯২ পুনশ্চ
১৭ কলকাতা সংক্রান্ত ১৪০১ দে'জ
১৮ বঙ্কিমযুগ ১ ১৯৯৭ দে'জ

রবীন্দ্রচর্চা

১ আমার রবীন্দ্রনাথ ১৯৮২ দে'জ
২ রবীন্দ্রনাথ না রবীন্দ্রনাথ ১৯৮৫ প্রতিক্ষণ
৩ রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়ার ১৯৮৯ প্রতিক্ষণ
৪ লেখালিখি ১৯৯৩ এ. মুখার্জি
৫ রবীন্দ্রনাথের জন্মকাহিনী ১৯৯৬ কালচার

পূর্ণেন্দু পত্রীর চলচ্চিত্র তালিকা

চলচ্চিত্র নাম	নির্মাণকাল	মুক্তির বছর
১ স্বপ্ন নিয়ে	১৯৬৫	১৯৬৬
২ স্ত্রীর পত্র	১৯৭২	১৯৭৩
৩ ছেঁড়া তমসুক	১৯৭৪	১৯৭৪
৪ অবনীন্দ্রনাথ	১৯৭৬	—
৫ বাংলার পট	১৯৭৮	—
৬ মালঞ্চ	১৯৮০	১৯৮২
৭ কালীঘাট পট	১৯৮০	—
৮ গীত গোবিন্দ	১৯৮০	—
৯ ছোট বকুলছুরের যাত্রী	১৯৮১	—
১০ ক্ষীরের পুতুল	১৯৮২	—
১১ খরা (অসমাপ্ত)	—	—
১২ গুহাচিত্র (অসমাপ্ত)	—	—

পূর্ণেন্দু পত্রীর গ্রন্থ ও চলচ্চিত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছেন কবি শ্যামল মান্না ও 'বনানী' সম্পাদক অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল। এছাড়া মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও ও জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কৃত তালিকারও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকা